কলকাতার ভিক্ষুক

উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

[Kolkatar Bhikkhuk: Utpotti, Bikash O Aartho-Samajik Porjalochona (1901-2011)]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

প্রসেনজিৎ নস্কর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি. নং: A00HI1201517 of 2017-2018

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

কলকাতার ভিক্ষুক: উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

Certified that the Thesis entitled

"কলকাতার ভিক্ষুক: উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)" **[Kolkatar Bhikkhuk: Utpotti, Bikash O Aartho-Samajik Porjalochona (1901-2011)]** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Rup Kumar Barman, Professor, Department of History, Jadavpur University,** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere /elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Rup Kumar Barman 04.8.2023

Dr. Rup Kumar Barman
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700032
Dated:

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate

Prosenjit Naskar 04.08.23

Prosenjit Naskar
Dated:

প্রাক্-কথন

ইতিহাস কথাটির অর্থ হল অতীতে যা ঘটেছে তার বিবরণ। অর্থাৎ মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু, আর ইতিহাসচর্চা হল ইতিহাস-রচনার ধারাবাহিক বিবর্তন বা প্রগতির কাহিনির বিবরণ। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস কীভাবে লেখা হয়ে চলেছে তার ধারণা ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে পাওয়া যায়। ইতিহাসচর্চার গতিময়ধারায় বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্র প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়ে চলেছে। তাই সাম্প্রতিককালে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশের ইতিহাস নিয়ে সমান ভাবে গবেষণা চলেছে। কালের স্রোতে ইতিহাসচর্চার ব্যাপ্তি সংকীর্ণ গন্ডি থেকে ক্রমশই ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করেছে। ইতিহাসচর্চার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ন সংযোজন হল, - আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার আলোচনা। বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গবেষক বা তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে।

আধুনিক ইতিহাসচর্চায় ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে সমাজের একেবারে নিচু তলা থেকে (History from Below) বিশ্লেষণ করার প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছে। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি সকল স্তরের ভূমিকাকেই মুখ্য চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইতিহাস চর্চায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। বিশেষত খেলা, বিনোদন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, রুচি, সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক অবস্থান, শ্রেণিগত বিভেদ, নারী-পুরুষ সম্পর্ক এইসব সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা সমাজে কীভাবে মিশে আছে তা ইতিহাসচর্চার এক-একটি ধারায় পর্যালোচিত হয়। খেলার ইতিহাস, খাদ্যাভাসের ইতিহাস, শিল্পচর্চার ইতিহাস, দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস, পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস, যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, শহরের ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, নারী ইতিহাস ইত্যাদি বিশেষভাবে চর্চিত হচ্ছে।

সামাজিক ইতিহাস (Social History) হল ইতিহাস আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পূর্বের সামাজিক ইতিহাস শুধু রাজা-মহারাজা, অভিজাতবর্ণ ও উচ্চবর্ণের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাধারণ, নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক মানুষের আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে সামাজিক ইতিহাস 'নতুন সামাজিক ইতিহাস' রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। বিংশ শতকে নতুন সামাজিক ইতিহাস রচনায় সমাজের নিম্নবর্গ, দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

১৯৮০-র দশক থেকে অধ্যাপক রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সূচনা করেন। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক রণজিৎ গুহের পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শাহিদ আমিন, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের ইতিহাসচর্চা করে নিম্নবর্গের ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদে সাধারণের অংশগ্রহণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনে আধুনিক ইতিহাসচর্চা বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের অ্যানাল গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিক লুসিয়েন ফেবর, মার্ক ব্লখ, ব্রদেল, রয় লাদুরি প্রমুখগণ তাঁদের ইতিহাস চর্চায় প্রান্তিক মানুষের পরিসংখ্যান, দিনগত জীবনযাপনের বিশ্লেষণ, জনতার মানসিকতা, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। তবে, গবেষকরা নানা বিষয়ে আলোচনা করলেও সমাজের অনেক প্রান্তিক মানুষ সম্পর্কে গবেষণা এখনও খুব স্বল্প পরিসরে প্রাপ্তব্য। বাংলার ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কে গবেষণাও একপ্রকার ব্রাত্য বা অপাংক্তেয় বললেই চলে, কাজেই এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রয়াস।

ভিক্ষুক সমস্যা কেবলমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সমস্যা নয়, এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ করা যায়। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেরও ভিক্ষুক সমস্যার চিত্র একই। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যতা ও দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ সমাজের প্রান্তিক জীবিকা অবলম্বনের বিভিন্ন ক্ষেত্র লক্ষ করা যায়। প্রান্তিক জীবিকার মধ্য

থেকে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। ভিক্ষুক বা ভিক্ষাবৃত্তি ভারতীয় সমাজে প্রাথমিক পর্বে ধর্মীয় রীতির অংশ হলেও ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে আর্থ-সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ হলেও ভিক্ষা ঔপনিবেশিক নীতির ফলে জীবিকা বা বৃত্তিতে বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে ভারতের আদমশুমারির প্রতিবেদনে ভিক্ষাকে 'বৃত্তি' হিসাবে দেখিয়ে ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কে তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে। ভারতের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিক্ষুক শ্রেণির সংখ্যা প্রায় ০.১১৫৭ শতাংশ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮১০০০ জন ভিক্ষাকে 'বৃত্তি' হিসাবে গ্রহণ করে ভিক্ষুক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে কলকাতাতেই ভিক্ষুকের সংখ্যা সর্বাধিক। ভিক্ষুক শ্রেণি মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করে। তবে ভিক্ষুক শ্রেণির সম্পর্কে সার্বিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-গবেষক মহলে দীর্ঘকালীন নীরবতা লক্ষ করা যায়। এই নীরবতাই আমাকে এই গবেষণার কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছে। বর্তমান গবেষণায় মূলত ভিক্ষুক শ্রেণির সার্বিক ইতিহাসকে (উৎপত্তি থেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থান) পর্যালোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভে ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তি, বিকাশ, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হল। গবেষণাপত্রটির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সহায়তাদানের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যতীত গবেষণা পত্রটি রূপায়ন করা সম্ভব ছিল না। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আশিস মুখার্জী মহাশয়কে যিনি মূল্যবান মতামত দিয়ে আমার গবেষণা সমৃদ্ধ করেছেন। গবেষণাকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে সুপরামর্শ ও মতামত প্রদানের জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজয় কুমার দাস, অধ্যাপক সুবর্ণ কুমার দাস এবং ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী

মুখার্জীকে। গবেষণা সন্দর্ভটি পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, সংগ্রহশালা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, সেগুলি হল: ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগার, নিউ দিল্লি; তিনমূর্তি ভবন, নিউ দিল্লি; নেহরু মিউজিয়াম, নিউ দিল্লি; জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা; অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, কলকাতা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা; বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার, ঢাকা; রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার-এর গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতার ঢাকুরিয়া নবভবঘুরে আবাসন, হাওড়ার সাময়িক ভবঘুরে আবাস, উত্তরপাড়া মহিলা ভবঘুরে আবাস, দক্ষিণেশ্বর মন্দির লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ অফিস অফ্ দ্য কন্ট্রোলার অফ্ ভ্যাগারেন্সি, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা লাইব্রেরী এবং টাউন হল লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণা সন্দর্ভ রচনার সাহায্যে ICHR (Indian Council of Historical Research), WB SGJRF & SRF (West Bengal State Goverment Junior and Senior Fellowship) এবং RUSA (Rastriya Ucha Siskhsha Abhiyan) কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই সকল সংস্থার আর্থিক অনুদান এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা দান করেছে। এছাড়া গবেষণা সন্দর্ভের বানান বিধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান অভিধান ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণাকার্য চলাকালীন যারা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন ড. অয়ন কুমার ব্যানার্জী, ড. মৃত্যুঞ্জয় প্রামানিক, কাজী হিফাজত, বিমল চন্দ্র বর্মণ, কৃষ্ণেন্দু কুমার জানা, সার্থক লাহা, সৌম্যজিৎ মুখার্জী, তনুশ্রী সরকার, সোম্যদীপ খাণ্ডা, সৌরভ ছেত্রী, বাসুদেব নস্কর, সুরজিৎ কুন্ডু, কাবেরী মণ্ডল, বিমল রাউত, আকাশ মাইতি, ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার, আনিসুল হক, ঋত্বিক বাগচী, ইন্দিরা ব্যানার্জী, পৌলমী রায়, বানীব্রত ঘোষ, রবিন মন্ডল, শর্মিষ্ঠা দেব প্রমুখদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইল।

সর্বোপরি প্রণাম জানাই আমার পিতা ধনঞ্জয় নস্কর ও মাতা রাধারাণী নস্করকে, যাঁরা আমার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁদের কাছেও আমি চিরঋণী। অন্তরের শ্রদ্ধা ও

প্রণাম জানাই পিসিমনি বিজলি নস্কর ও দাদা বিশ্বজিৎ নস্করকে, যাঁরা নানাভাবে আমার পাশে থেকে আমার গবেষণার কাজে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও আমার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বন্ধু-বান্ধব ও আমার ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা কার্যে যদি কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে, সে দায় নিতান্তই আমার। সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকেও গবেষণা সন্দর্ভটি ভাবি গবেষকদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠলে সন্দর্ভটির সার্থক রূপায়ণ হয়েছে বলে মনে করবো।

প্রসেনজিৎ নস্কর
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

সূ চি প ত্র

প্রাক্-কথন iv-viii

সারণি ও মানচিত্র সূচি xii

আদ্যক্ষরসমষ্টি xiii-xiv

পারিভাষিক শব্দাবলি xv-xix

সংযোজনী সূচি xx-xxii

প্রথম অধ্যায়:

ভূমিকা ১-২৯

- ১.২. পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন
- ১.৩. গবেষণা সম্পর্কিত সমস্যা
- ১.৪. গবেষণার পরিসর ও তাৎপর্য
- ১.৫. গবেষণা অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান
- ১.৬. গবেষণার সময়কাল
- ১.৭. গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য
- ১.৮. গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী
- ১.৯. গবেষণার উপাদান ও পরিকল্পনা
- ১.১০. গবেষণার অধ্যায় পরিকল্পনা

দ্বিতীয় অধ্যায়:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন ৩০-৭৭

- ২.২. ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
- ২.৩. ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞা ও আক্ষরিক অর্থ
- ২.৪. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির পর্যালোচনা
- ২.৫. জাতীয় প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির পর্যালোচনা
- ২.৬. পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়:

কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির ঐতিহাসিক বিবরণ ৭৮-১১৬

- ৩.২. কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
- ৩.৩. কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির ধারা
- ৩.৪. পর্যালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়:

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব ১১৭-১৬৬

- ৪.২. ভিক্ষুক সমস্যার প্রকৃত কারণ
- ৪.৩. মানুষের অর্থনৈতিক দীনতা
- ৪.৪. সামাজিক অবনমন
- ৪.৫. জৈবিক বা শারীরিক ও মানসিক কারণ
- ৪.৬. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ভেদাভেদ, ধর্মাশ্রয়ী জীবিকা নির্বাহ
- ৪.৭. রাজনৈতিক কারণ
- ৪.৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণ
- ৪.৯. অন্যান্য কারণ
- ৪.১০. ভিক্ষা দেওয়ার কারণ
- ৪.১১. পর্যবেক্ষণ

পঞ্চম অধ্যায়:

রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণিবিভাগ ১৬৭-২১৩

- ৫.২. ইউরোপীয় ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ
- ৫.৩. ভারতীয় ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ
- ৫.৪. ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল
- ৫.৫. পর্যবেক্ষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ভিক্ষুক শ্রেণির পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতি ২১৪-২৬৪

- ৬.২. বাংলার প্রেক্ষাপটে ভবঘুরে আইন

- ৬.৩. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের বিশ্লেষণ
- ৬.৪. বঙ্গীয় ভবঘুরে দপ্তরের গঠন ও কার্যপ্রণালী
- ৬.৫. ভবঘুরে আবাসের বিবরণ ও গঠন
- ৬.৬. শিশু ও কিশোর ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ প্রকল্প
- ৬.৭. পর্যবেক্ষণ

সপ্তম অধ্যায়:

উপসংহার ২৬৫-২৬৮

সংযোজনী ২৬৯-৩১২

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ৩১৩-৩৩৫

সারণি ও মানচিত্র সূচি

সারণি

১. সারণি – ২.১: ভারতের ২২ টি রাজ্যে ও ২ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে আইন সমূহ, পৃ. ৬৭-৬৮।

২. সারণি – ৩.১: কলকাতা শহরে অভিবাসিত ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ১৯৩৪, পৃ. ৯৫।

৩. সারণি – ৪.১: কারখানা এবং শ্রমিকের পরিসংখ্যান (১৮৯২-১৯৪৩), পৃ. ১৩২।

৪. সারণি-৪.২: ভিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তির তিন প্রজন্মের পেশা ও উত্তরদাতার পূর্বতন পেশা, পৃ. ১৩৯।

৫. সারণি - ৪.৩: বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, পৃ. ১৪৯।

৬. সারণি - ৫.১: ভিক্ষুক শ্রেণির সুসংহত শ্রেণিবিন্যাস, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

৭. সারণি - ৬.১: মেন্ডিক্যান্সি ইনস্টিটিউশন-এর (Mendicancy Institutions) কর্মী সংখ্যা, পৃ. ২১৭-২১৮।

৮. সারণি - ৬.২: বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট এর বিচারক্ষেত্র ও বিচারাধীন অঞ্চল (Jurisdiction of the Special Magistrate), পৃ. ২২৪।

৯. সারণি - ৬.৩: ভবঘুরে দপ্তরের প্রশাসন ও কর্মী সংখ্যার গঠন কাঠামো, পৃ. ২৩৫।

১০. সারণি - ৬.৪: ভবঘুরে আবাস এর প্রশাসক ও কর্মী সংখ্যার গঠনমূলক কাঠামো, পৃ. ২৪২।

১১. সারণি - ৬.৫: ভবঘুরে আবাস ও আবাসিকদের সংখ্যা, পৃ. ২৪৪।

১২. সারণি - ৬.৬: ক্যাজুয়াল ভ্যাগরান্টস হোম, আন্দুল-এর প্রশিক্ষণ প্রণালী, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়, পৃ. ২৪৭।

১৩. সারণি - ৬.৭: ফিমেল ভ্যাগরান্টস হোম, উত্তরপাড়া, পৃ. ২৪৮।

১৪. সারণি - ৬.৮: নিউ ভ্যাগরান্ট হোমে প্রশিক্ষণের পরিসংখ্যান, ঢাকুরিয়া, পৃ. ২৪৯।

১৫. সারণি - ৬.৯: ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার, মেদিনীপুর, তাঁতিগেরিয়া, পৃ. ২৪৯।

মানচিত্র

১. মানচিত্র – ১.১: ভারতের মানচিত্রে গবেষণা অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান, পৃ. ১৮।

২. মানচিত্র – ১.২: কলকাতা জেলার ওয়ার্ড ভিক্ষুক শ্রেণির অবস্থানের মানচিত্র, পৃ. ১৯।

আদ্যক্ষরসমষ্টি

AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIWC	All India Women's Conference
AMG	Advancing the Ministries of the Gospel
ATM	Automated Teller Machine
BVA	Bengal Vagrancy Act
CARA	Central Adoption Resource Authority
CPC	Criminal Procedure Code
CV	Controller of Vagrancy
DWCD&SW	Department of Women & Child Development and Social Welfare
Govt.	Government
GRP	General Railway Police
HIV	Human Immuno-deficiency Virus
HRC	Human Rights Commission
IAPA	Indian Association for Promotion of Adoption
IAY	Indira Awas Yojana
ICCW	Indian Council of Child Welfare
ICDS	Integrated Child Development Service Scheme
ICPS	Integrated Child Protraction Scheme
ICSW	Indian Council of Social Welfare
ID	Identification
IPC	Indian Penal Code
JNPC	Jawaharlal Nehru Pharma City
JRY	Jawahar Rozgar Yojana
LPG	Liberalization, Privatization and Globalization

MWCD	Ministry of Women and Child Development
NFWP	National Food for Work Programme
NGO	Non-Governmental Organizations
NPC	National Planning Commission
OBC	Other Backward Class
OC	Officer-in-Charge
PMGY	Pradhan Mantri Gramodaya Yojana
PMRY	Prime Minister's Rozgar Yojana
REGP	Rural Employment Generation Programme
Rs.	Rupees
RTC	Road Transport Corporation
SARA	State Adoption Resource Agency
SC	Scheduled Caste
SAAs	Specialised Adoption Agencies
SGRY	Sampurna Grameen Rozgar Yojana
ST	Scheduled Tribe
TV	Television
UN	United Nations
USA	United States of America
USD	United States Dollar
UT	Union Territory
VAMBMY	Valmiki Ambedkar Awas Yojana

পারিভাষিক শব্দাবলি

আইন — মানুষকে সুষ্ঠ, স্বাধীন এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য যে নিয়ম-কানুন তৈরি এবং প্রয়োগ করা হয় তাকে আইন বলে।

আদমশুমারি — কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংশ্লিষ্ট দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক, যেমন - সামাজিক ও আর্থিক স্থিতি সম্পর্কিত যে সমীক্ষা করা হয়, তাকেই আদমশুমারি বলে।

উন্মাদ — কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিকৃত-মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্মাদ বলা হয়। যারা পাগল হিসেবেও চিহ্নিত হয়।

জাকাত — জাকাত একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ হল পবিত্র হওয়া, পরিশুদ্ধ হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। পারিভাষিক অর্থে ধনীদের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর নির্ধারিত হারে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করা। জাকাত ইসলামের দৃষ্টিতে অনুদান নয়, বরং গরিবের অধিকার। জাকাত একদিকে দাতার আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদকেও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়; অন্যদিকে দরিদ্রদের অভাব পূরণে সহায়তা করে এবং সম্পদে ক্রমবৃদ্ধি বয়ে আনে। তাই জাকাত হল সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তার প্রতীক।

জামাতখানা — জামাতখানা শব্দের অর্থ 'সম্প্রদায়ের ঘর' এবং এটি আরবি শব্দ 'জামা'আ', যার অর্থ দল বা সম্প্রদায় এবং ফার্সি শব্দ 'খানা', যার অর্থ ঘর নিয়ে গঠিত একটি শব্দ। এর দ্বারা এমন একটি স্থানকে বোঝায় যেখানে ইসলাম ধর্মের সুন্নি এবং শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রার্থনা এবং সাম্প্রদায়িক সমাবেশের জন্য একত্রিত হয়। তবে এটি সাধারণত সুফি সম্প্রদায়ের উপাসনার মূল জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ঠিকাদার — যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট খরচে কোনো কাজ করে দেওয়ার জন্য চুক্তি গ্রহণ করে।

তৃতীয় লিঙ্গ — 'তৃতীয় লিঙ্গ' বা 'তৃতীয় যৌনতা' হল একটি মতবাদ যাতে এমন ব্যক্তিদের

শ্রেণিভুক্ত করা হয় যারা হয় নিজে অথবা সমাজের দ্বারা পুরুষ বা নারী কোনটাই স্বীকৃত নয়। পাশাপাশি কিছু সমাজের একটি সামাজিক শ্রেণিকে বোঝায়, যে সমাজগুলো তিন বা ততোধিক লিঙ্গের শ্রেণিবিভাগ করেন। তৃতীয় পরিভাষাটি সাধারণত 'অন্য' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'সমকামী পুরুষ' এবং 'লেসবিয়ান'দের বর্ণনা করার উপায় হিসেবে যৌনতাত্ত্বিকদের মধ্যে 'তৃতীয় লিঙ্গ' শব্দটির উৎপত্তি।

দরবেশ 'দরবেশ' হল এমন একজন ইসলাম ধর্মীয় ব্যক্তি যিনি বস্তুগত দিক থেকে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছেন বা গ্রহণ করেছেন এবং পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসীর ন্যায় ভিক্ষা করে জীবনযাপন করেন। 'দরবেশ' বা 'দারভেশ' শব্দটি ফার্সি এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। এটি আরবি শব্দ 'ফকির' - এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

দরিদ্র/গরিব দরিদ্র বা গরিব কথাটির মধ্য দিয়ে মানুষের এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যে অবস্থায় মানুষ অভাবগ্রস্ত, অভাবী, দীন এবং নিঃস্ব হয়ে জীবন অতিবাহিত করে।

দাতব্য দেয় বা দানযোগ্য বা দান করা যায়, এমন বিষয়কে দাতব্য বলা হয়।

দারিদ্র্য দারিদ্র্য এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়। সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আগ্রাসন, জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ হল খাদ্য সরবরাহে ঘাটতির কারণে কোনো এলাকার মানুষের অনাহারজনিত এক চরম অবস্থা। সাধারণত কোনো এলাকায় ফসলহানি ঘটলে এবং সেখানে প্রয়োজন মেটানোর মতো খাদ্য সরবরাহ না থাকলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি ভূ-প্রাকৃতিক বৈরিতা, গবাদিপশুর মড়ক বা রোপিত ফসলের রোগ ও অন্যান্য

কীটপতঙ্গ বা ইঁদুররাও অনেক সময় দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী হতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ও দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং চালু বাণিজ্যপ্রবাহের বাইরে থাকার কারণে অনেক জনপদের দুর্ভিক্ষে পতিত হবার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

দৈন্যতা দৈন্যতার অর্থ হল দরিদ্রতা বা অভাব।

ধর্মশালা এটি হল এমন এক স্থান, যেখানে অতিথিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এমনকি অনেক সময় বিচারালয় হিসেবেও গণ্য হয়।

নোটিফায়েড আবাস উদ্বাস্তু এবং শরণার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত আবাসস্থলকে নোটিফায়েড আবাস বলা হয়।

নয়া উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় উদারনীতিবাদের পুনরুত্থানই হল নয়া-উদারনীতিবাদ। নয়া-উদারনীতিবাদ হল আর্থনীতিক উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে নয়া-উদারনীতিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। নয়া-উদারনীতিবাদ হল প্রতি-বিপ্লবী প্রকৃতির। বিংশ শতাব্দীব্যাপী সরকারের ক্রিয়াকর্ম ও কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিধি অতিমাত্রায় প্রসারিত হয়েছে। নয়া-উদারনীতিবিদ সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমসম্প্রসারণকে সঙ্কুচিত করতে চায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিষয়গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রান্তিক 'Marginal' ইংরেজি শব্দটি সমাজ বিজ্ঞানে ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়। যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ হল প্রান্তিক। 'প্রান্তিক' কথাটির অর্থ সাধারণভাবে বোঝানো হয় সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা গোষ্ঠীগুলিকে; যাদের অবস্থান সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে।

ফকির নিঃস্ব, দারিদ্র্য, সর্বহারা যারা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ফকির বলা হয়। আবার সংসারত্যাগী মুসলমান ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী বা সাধু পুরুষকেও ফকির বলা হয়।

বেলা ভিক্ষা যখন কোন প্রান্তিক কর্মচারী নিজের প্রাথমিক পেশার সঙ্গে সঙ্গে দিনের একটি নির্দিষ্ট কিছু সময়ে (বেলায়) অস্থায়ীভাবে ভিক্ষা করেন, তাকে

বেলা ভিক্ষা বলা হয়।

বেসরকারিকরণ সরকারি মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন কোনো সংস্থার শেয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করাকে বেসরকারিকরণ বলে। অর্থাৎ, যে সাধারণ পদ্ধতির দ্বারা সরকারি মালিকানা বা পরিচালনাধীন কোনো সংস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্রকে মালিকানা বা পরিচালনার শরিক করা হয় তাকে বেসরকারিকরণ বলে।

বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন (Globalization) বিংশ শতকের শেষভাগে উদ্ভূত এমন একটি আন্তর্জাতিক অবস্থা, যাতে পৃথিবীর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা দেশীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তঃদেশীয় পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। এর ফলে সারা বিশ্ব একটি পরিব্যাপ্ত সমাজে পরিণত হয়েছে এবং অভিন্ন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ যুগপৎ অংশগ্রহণ করছে।

ভবঘুরে ল্যাটিন শব্দ 'ভ্যাগারি' থেকে 'ভবঘুরে' শব্দটির উদ্ভূত, যার অর্থ 'বিচরণ করা'। ভবঘুরে বলতে মূলত বাড়ি বা কর্মসংস্থানহীন ব্যক্তিকে বোঝায়। যারা নিয়মিত কর্মসংস্থান বা আয় ছাড়াই গৃহহীনতার অবস্থাতে উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ায়। এরা সাধারণত দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে এবং ভিক্ষা, চুরি, অস্থায়ী কাজের মতো কিছু সামাজিক নিরাপত্তাহীন জীবিকায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে।

ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষার মাধ্যমে জীবনধারণের অর্থই হল ভিক্ষাবৃত্তি।

ভিক্ষু/ভিক্ষুক 'ভিক্ষুক' শব্দের অর্থ 'ভিক্ষোপজীবী' বা 'সন্ন্যাসী'। এই শব্দটি 'ভিক্ষু' শব্দ থেকে এসেছে। 'ভিক্ষু' শব্দের অর্থ 'যিনি সম্পূর্ণ ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্বাহ করেন'। অর্থাৎ, যারা নিজের অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের কথা অন্যের কাছে অকপটে ব্যক্ত করার মাধ্যমে সাহায্য নিয়ে জীবিকানির্বাহ করে- তারাই ভিক্ষুক।

ভূমিহীন কৃষক সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, ভূমিহীনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি কিছুই নেই, কিন্তু পরিবারটি

কৃষিনির্ভর, তারা ভূমিহীন।

ভূমিহীন শ্রমিক ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যার কৃষি জমি নেই এবং জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় অন্যের কৃষি জমিতে কায়িক শ্রম থেকে উদ্ভূত হয়।

মড়ক মড়ক কথাটির অর্থ হল মহামারি, অর্থাৎ কোন বিশেষ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটলে তাকে মড়ক বলা হয়।

মধুকর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় আশ্রমিক ছাত্রগণ তাদের নিজের ও শিক্ষকদের প্রতিপালনের জন্য তিনজন, পাঁচজন অথবা সাতজন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ভিক্ষা করতে পারতেন। এই পদ্ধতিকে বলা হত মধুকর।

মুন-লাইটিং এটি এমন এক পেশার ধরণ, যা কোন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বোঝায়। যেমন, - একজন মানুষ সকালে ভিক্ষা করে, আবার সন্ধ্যাতে বিভিন্ন প্রান্তিক জীবিকার যঙ্গে যুক্ত হয়।

মুসাফির খানা এটি এক ধরণের ধর্মশালা, যা ভারতবর্ষে সুলতানি যুগে বড় বড় রাস্তার ধারে পথিক বা অতিথিদের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থার জন্য নির্মাণ করা হত।

লঙ্গরখানা আপৎকালীন সময়ে আর্তদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরন করার কেন্দ্রস্থলকে লঙ্গরখানা বলা হয়।

সন্ন্যাসী মূলত সংসারত্যাগ করে যারা ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকে বা ভিক্ষুধর্ম অবলম্বন করে তাঁদের সন্ন্যাসী বলা হয়।

সাধু এর আক্ষরিক অর্থ 'সাধনা অনুশীলনকারী' বা 'আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার পথ অনুসরণকারী', যিনি হলেন একজন ধর্মীয় তপস্বী এবং ভিক্ষাজীবী মানুষ।

সংযোজনী সূচি

সংযোজনী – ১: ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলকাতার ভৌগলিক পরিসীমায় অবস্থানকারী ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান সম্পর্কিত মানচিত্র ২৬৯-২৭৫

মানচিত্র – **১.১:** ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুক শ্রেণির জনবিন্যাস।

মানচিত্র – **১.২:** ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস।

মানচিত্র – **১.৩:** ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস।

মানচিত্র – **১.৪:** ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুকের জনবিন্যাসের তুলনামূলক মানচিত্র।

মানচিত্র – **১.৫:** পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভিক্ষুক শ্রেণির জনবিন্যাস।

মানচিত্র – **১.৬:** পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুরুষ ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস।

মানচিত্র – **১.৭:** পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মহিলা ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস।

সংযোজনী - ২: ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান সম্পর্কিত সারণি ২৭৬-২৮৮

সারণি - ২.১: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুক আবাসের সংখ্যা, ধারণ ক্ষমতা ও দৈনিক গড় আবাসিক সংখ্যা।

সারণি - ২.২: ভারতের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৮১-২০১১**।

সারণি - ২.৩: ভারতের গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৮১-২০১১**।

সারণি - ২.৪: ভারতের শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৮১-২০১১**।

সারণি - ২.৫: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৮১**।

সারণি - ২.৬: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৯১**।

সারণি - ২.৭: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **২০০১**।

সারণি - ২.৮: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **২০১১**।

সারণি - ২.৯: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৮১**।

সারণি - ২.১০: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, **১৯৯১**।

সারণি - ২.১১: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০০১।
সারণি - ২.১২: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০১১।
সারণি - ২.১৩: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১।
সারণি - ২.১৪: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৯১।
সারণি - ২.১৫: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০০১।
সারণি - ২.১৬: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০১১।
সারণি - ২.১৭: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ১৯৯১।
সারণি - ২.১৮: পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষুক পরিসংখ্যান, ১৯৯১।
সারণি - ২.১৯: কলকাতার ভিক্ষুক পরিসংখ্যান, ১৯৯১।
সারণি - ২.২০: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ২০০১।
সারণি - ২.২১: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ২০০১।
সারণি - ২.২২: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ২০০১।
সারণি - ২.২৩: পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১।
সারণি - ২.২৪: পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১।
সারণি - ২.২৫: পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১।
সারণি - ২.২৬: ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহুরে প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১।

সংযোজনী - ৩: ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাসের চিত্র ২৮৮
চিত্র - ৩.১: হুগলীতে অবস্থিত ভবঘুরে আবাসনের চিত্র।

সংযোজনী - ৪: কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিক্ষারত ভিক্ষুক শ্রেণির কিছু চিত্র (গবেষকের নিজের সংগৃহীত) ২৮৯-২৯৮
চিত্র - ৪.১: দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির সংলগ্ন পথ ভিক্ষুক।
চিত্র - ৪.২: রবীন্দ্র সদন সংলগ্ন শিশু ভিক্ষুক।
চিত্র - ৪.৩: যোধপুর পার্ক সংলগ্ন পথ ভিক্ষুক।
চিত্র - ৪.৪: যাদবপুর সুকান্ত সেতুর ওপর ভিক্ষারত ভবঘুরে ভিক্ষুক।

চিত্র - ৪.৫: দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির সংলগ্ন পথ ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.৬: বালিগঞ্জ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিক্ষারত অসুস্থ ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.৭: রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের পাশে ভিক্ষারত শিশু ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.৮: বালিগঞ্জ স্টেশনের রেল ওভার ব্রিজের ওপর ভিক্ষারত বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.৯: দক্ষিণ বারাসত রেল স্টেশনে বহুরূপী ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.১০: দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির সংলগ্ন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.১১: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্বস্থ বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুক।
চিত্র - ৪.১২: বেকবাগান (বাম পাশে) এবং মানিকতলা (ডান পাশে) এলাকায় পথ ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.১৩: গড়িয়া স্টেশন (বাম পাশে) এবং লোকাল ট্রেনে (ডান পাশে) ভিক্ষারত প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুক।
চিত্র – ৪.১৪: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-১।
চিত্র – ৪.১৫: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-২।
চিত্র – ৪.১৬: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-৩।
চিত্র – ৪.১৭: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-৪।
চিত্র – ৪.১৮: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-৫।

সংযোজনী - ৫: দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভিক্ষুকদের বিষয়ে বিভিন্ন খবরের কিছু দৃষ্টান্ত ২৯৯-৩০২

চিত্র – ৫.১: ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-১।
চিত্র – ৫.২: শিশু শ্রমিক সম্পর্কিত সংবাদ।
চিত্র – ৫.৩: ২০ দফা কর্মসূচি সংক্রান্ত সংবাদ।
চিত্র – ৫.৪: শিশু ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-১।
চিত্র – ৫.৫: শিশু ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-২।
চিত্র – ৫.৬: ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ।

সংযোজনী - ৬: বাংলার ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ ৩০৩-৩১২

প্র থ ম অ ধ্যা য়

ভূমিকা

ভারতীয় সমাজ জীবনে 'ভিক্ষা' এবং 'ভিক্ষু', এই শব্দ দুটি অতি প্রাচীন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসারলাভ করেছিল, তখনই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শব্দের বহুলাংশে প্রসার ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক নারী ও পুরুষদের মূলত শ্রমণ ও শ্রমণা বলা হলেও প্রচলিত ভাষায় তাঁরা ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী নামেও পরিচিত ছিলেন।[১] ভিক্ষা শব্দটি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক হলেও বর্তমানে এই শব্দ থেকেই উদ্ভূত 'ভিক্ষুক' শব্দটিতে দীনতার ভাব প্রকাশ পায়। এই ভিক্ষুক শব্দের পাশাপাশি আরো একটি শব্দ উঠে আসে, তা হল 'কাঙাল' শব্দটি। অথচ শব্দগতভাবে ভিক্ষুক আর কাঙাল দুটি কাছাকাছি হলেও অর্থগতভাবে এক নয়। ভিক্ষুক শব্দের সঙ্গে দীন ভাব জড়িয়ে থাকলেও কাঙাল কথাটি সম্বোধনের দিক দিয়ে অনেকটা উচ্চস্তরের। মূলত সাধক, আউল, বাউল, শাহী, দরবেশ এবং ভারতের সনাতন ধর্ম ও তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের জন্য এই কাঙাল কথাটি ব্যবহার করতেন।[২]

ভিক্ষা কী? এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণদের উপনয়ণের সময় তাদের মাথা ন্যাড়া করে, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে দেওয়া হত। নবীন ব্রহ্মচারী তখন সবার কাছে 'ভবতি ভিক্ষাম দেহ' বলে ভিক্ষা চান। সকলেই তাকে ভিক্ষা দেন তার তিন দিন ঘরে একা থাকার রসদ হিসেবে। নারী হলে বলত 'ভবতি ভিক্ষাম দেহী'। এইভাবে ভিক্ষা কথাটি ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে জুড়ে যায়।[৩] এই ভিক্ষা চাওয়া এবং দেওয়ার মধ্যে প্রাচীন ভারতে কোনো অসম্মান ছিল না। সমাজে ভিক্ষুদের আশ্রয় ও খাদ্য দুই-ই ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই ভিক্ষাবৃত্তি আর্থ-সামাজিক সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। ফলে

ভিক্ষা শব্দটির আক্ষরিক অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে, - “begger” means a person who indulges in begging; “begging” means — (i) soliciting alms in a public place, including railways, bus-stops, road sides and public transport, by invoking compassion; and (ii) entering in any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms;[৪] এই বৃত্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতি সমাজের এমন এক জটিল ও বহুমুখী সমস্যা, যা প্রায়শই একাধিক ও আন্তঃসম্পর্কিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাঠামোগত বঞ্চনার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। তাই এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে চিহ্নিত করে। এ কারণে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি সমাজের অবহেলিত সমস্যা নয় এবং এটি ভারতের অন্যতম একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে ফলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপে ‘দারিদ্র্য’ (Poverty) এবং ‘দরিদ্র’ (Poor) এই ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে। ভারতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। সূচনা পর্বে দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হত জীবিকার ভিত্তিতে এবং পশ্চিমি দেশগুলিতে মানুষের এই জীবিকা ছিল মূলত ব্যবসা ও শিল্পবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৫] বিংশ শতকের শেষভাগ থেকে দারিদ্র্যকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয় মানুষের দুর্দশাগ্রস্থতার ভিত্তিতে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউনেস্কোর দারিদ্র্যের এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে থাকে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসন করা একবিংশ শতাব্দীর একটি বড় মোকাবিলার বিষয়। ইউএন হ্যাবিট্যাট ২০০৫-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিশ্ব দারিদ্র্যসীমার মান হল মাথা পিছু আয় প্রতিদিন ১.২৫ ডলার, যার নীচে এক বিলিয়ন মানুষ বাস করে।[৬] ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের অনুমান অনুসারে, মোট ভারতীয়

জনসংখ্যার প্রায় ২৬.১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।[৭] ২০১১-এর গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত ৬৭তম স্থানে অবস্থান করে।[৮]

দারিদ্র্যের এই সমস্যাটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক সমস্যাতেও এটি একটি বহুল চর্চার বিষয়; তাই দেখা যাচ্ছে বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী দারিদ্র্যের সামাজিক সমস্যার দিকটির প্রতি আলোকপাত করে আসছেন।[৯] তাঁদের পর্যবেক্ষন এবং গবেষণায় কর্মহীনতা, বাস্তুচ্যুতি, অনাহার যেমন দারিদ্র্যের এক একটি বিষয় হয়ে উঠেছে, ঠিক সেভাবেই ভিক্ষাবৃত্তি ও ভিক্ষুকও তাঁদের পর্যবেক্ষনের বাইরে থাকতে পারেনি।[১০] তাই ভিক্ষার বিষয়টি এখন আর আমাদের সমাজে অবজ্ঞার বিষয় নয়। এই ধারণাকে অনুসরণ করে বর্তমান গবেষণায় পশিমবঙ্গের বিশেষ করে কলকাতা জেলার ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় ভিক্ষাবৃত্তির কারণ, ভিক্ষুকদের সমস্যা এবং তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতে ১৯৭১-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়পর্বে ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক চিত্রকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে ভিক্ষুকদের সংখ্যা কখনও হ্রাস আবার কখনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, - ১৯৭১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ১০,১১,৬১৯ জন। যার মধ্যে ৫,৯১,৫০১, জন পুরুষ ও ৪,২০,১১৮ জন মহিলা।[১১] ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭,৫০,৩০৭ জন, এর মধ্যে ৪,৫০,৪১৯ জন পুরুষ ও ২,৯৯,৮৮৮ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১২] ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে ৩,৩২,৫৫৬ জন পুরুষ ও ২,১০,৩১৯ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১৩] ২০০১ সালে সংখ্যাটি

৬,৩০,৯৪০ জন। যার মধ্যে ৩,২১,৬৯৪ জন পুরুষ ও ৩,০৫,৯৯৪ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১৪] এবং ২০১১ সালে সংখ্যাটি ৪,১৩,৬৭০ তে নেমে আসে। এর মধ্যে ২.২ লক্ষ পুরুষ ও ১.৯১ লক্ষ নারী।[১৫] তবে ভিক্ষুকের এই সংখ্যাটি কোনো অংশে কম নয়। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৮১,২৪৪ জন এর মধ্যে ৩৩,০৮৬ (৪০.৭২ শতাংশ) জন পুরুষ ও ৪৮,১৫৮ (৫৯.২৮ শতাংশ) জন নারী।[১৬]

বর্তমান সময়ে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জোগান এবং চাহিদার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ক্রমশ প্রকটিত হচ্ছে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। এমতাবস্থায় সমাজের দরিদ্র মানুষ তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ কোনোরকম কাজ না পেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও কায়ক্লেশে বাঁচার জন্য ক্রমশ ‘ভিক্ষাবৃত্তি’কে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করছে। তবে ভিক্ষুক সমস্যা শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের সমস্যা নয়। ভিক্ষাবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ করা যায়, আদিম সভ্যতায় ভিক্ষাবৃত্তির ধারণা ছিল না। কারণ আদিম সভ্যতায় সামাজিক কাঠামো ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। যেগুলি বিভিন্ন সময়ে একে অন্যকে সাহায্য করত। মূলত সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তিরও উদ্ভব ঘটে।[১৭] প্রাচীন সভ্যতায় ভিক্ষাদানকে ‘পূণ্যার্জন’ ও ভিক্ষাবৃত্তিকে ‘সম্মানজনক কার্য’ বলে মনে করা হত। একই সঙ্গে সে সময় ভিক্ষাদান ছিল ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অর্থাৎ সে সময় ভিক্ষাবৃত্তিকে কোনোরকম সমস্যা হিসাবেই গন্য করা হত না। কিন্তু বর্তমান

সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি 'পেশা'য় পরিণত হওয়ায় ভিক্ষুক সমস্যা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

জনবসতি ও শিল্পায়নের কারণে সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলছে। জীবিকার তাগিদে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার মতো শহরগুলিতেও তৈরি হচ্ছে জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা। যা প্রকারান্তরে ঐ রাজ্যের অর্থনীতিতে কুপ্রভাব ফেলছে। সমাজের কিছু কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে দয়া ও অক্ষম মানুষের প্রতি সমবেদনা হিসাবে বিবেচনা করেন। অপরদিকে কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে আর্থ-সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক ব্যাধি হিসাবে ব্যক্ত করেন। ভিক্ষাবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়, - (ক) ভিক্ষাবৃত্তি হল অসামাজিক ও অপরাধমূলক পেশা, যা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে। (খ) ভিক্ষাবৃত্তি মানব সভ্যতার কুৎসিত রূপকে প্রভাবিত করে। (গ) ভিক্ষাবৃত্তি সকল প্রকার শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অক্ষম মানুষের সামাজিক ন্যায়বিচারকে আঘাত করে।[১৮]

ভারতীয় সমাজে দুই প্রকার ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়, যথা – (ক) কিছু মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে বাধ্য হয় ভিক্ষুকে পরিণত হতে। (খ) আবার কিছু মানুষ আছে যারা স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয়। মূলত দারিদ্র্যতা ও শারীরিক অক্ষমতার (শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়ঃবৃদ্ধ, শিশু, মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যাক্তি) কারণে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে।[১৯] অপরাংশে যেসকল মানুষ স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে এটা সম্পূর্ণ তাদের মানসিক প্রবৃত্তি। ফলে বর্তমান সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি একটি লোভনীয় পেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে সামান্য কিছু পয়সা ভিক্ষা প্রদান করা খুব একটা বড়

সমস্যা হিসাবে গণ্য না করার ফলে ক্রমশ ভিক্ষুক শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ক্রমশই ভারতের একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

১.২. পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবন-জীবিকার বিষয় সম্পর্কে গবেষণামূলক সাহিত্য ও প্রবন্ধের বিক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা হলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গবেষণাধর্মী রচনা লক্ষ করা যায় না। এমনকি কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয়নি বললেও চলে। তথাপি ভারতে ভিক্ষুকদের ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের কম-বেশী পরিচয় থাকলেও তাদের সম্পর্কে গবেষণা কিংবা গ্রন্থের অপ্রতুলতা রয়েছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করার একটা ছোট প্রয়াস হল এই সন্দর্ভটি। তবে এই বিষয়গুলিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করেননি। এক্ষেত্রে Martin Luther (১৪৮৩-১৫৪৬)-এর *'Liber Vagatorum'*[২০] (১৫২৮), Robert Copland (১৫০৮-১৫৪৭)-এর *'High Way to the Spittle House'*[২১] (১৫৩৫), John Awdeley (১৫৩২-১৫৭৫)-এর *'Fraternity of Vagabonds'*[২২] (১৫৬১), Thommas Harman (১৫৪৭-১৫৬৭)-এর *'A Caveat for common Cursetors'*[২৩] (১৫৬৬), William Shakespeare (১৫৬৪-১৬১৬)-এর *'Timon of Athens'*[২৪] (১৬০৬), John Fletcher (১৫৭৯-১৬২৫)-এর *'The Beggars of Bush'*[২৫] (১৬৪২), Richard Brome (১৫৯০-১৬৫২)-এর *'The Antipodes'*[২৫] (১৬৪০), Charles John Huffam Dickens (১৮১২-১৮৭০)-এর *'Great Expectation'*[২৭] (১৮৬১), Victor Marie Hugo (১৮০২-১৮৮৫)-এর *'Les Miserable'*[২৮] (১৮৬২), Count Lev Nikolayevich Tolstoy (১৮২৮-১৯১০)-এর *'The Poor People'*[২৯] (১৮৫৪) এবং Dominique Lapierre (১৯৩১)-এর *'City of*

Joy'[৩০] (১৯৮৫)-এর মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যকর্মে ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দরিদ্র মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সে সব চরিত্র *'Imaginative Verisimilitude'* অর্থাৎ কাল্পনিক সাদৃশ্যমূলক সত্যানুমান প্রসূত। সে চরিত্র বাস্তবের কঙ্কাল মাত্র, রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র নয়।[৩১]

ভিক্ষুকদের সম্পর্কে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন এমনটি নয়। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রাচ্যের বিশেষত বাঙালি সাহিত্যিকরাও ভিক্ষুকদের কথা তাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫৯)-এর *'অশনি সংকেত'* (১৯৪৪), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭১),-এর *'মন্বন্তর'* (১৯৪৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর *'চিন্তামনি'* (১৯৪৬), প্রভৃতি রচনায় ভিক্ষুক শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৭-১৯৭৮) *'নবান্ন'* (১৯৪৪) নাটকে মন্বন্তরজনিত কারণে সাধারণ মানুষ কীভাবে ক্রমশ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে, তার করুণ বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভিক্ষুকদের বিবরণ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকরা মূলত কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষুক চরিত্র নির্মাণ করেছেন, কিন্তু বাঙালি সাহিত্যিকদের বিবরণে ভিক্ষুক চরিত্রগুলিকে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের বিবরণের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের সাহিত্য পর্যালোচনাতে ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক, জীবন-জীবিকা ও ভিক্ষুকদের সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়গুলিকে তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। J. L. Gillin তাঁর *'Vagrancy and Begging'*[৩৩] (১৯২৯) নামক প্রবন্ধে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ভিক্ষুক, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেদের জীবন-জীবিকার বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তিনি ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক অবস্থা,

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় পরিস্থিতির মতো বিষয়গুলিকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। R. Bromley তাঁর *'Begging in Cali: Image, Reality and Policy'*[৩৪] (১৯৮৭) প্রবন্ধে ভিক্ষুক এবং দাতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির চিত্র, বাস্তবতা ও ভিক্ষাবৃত্তির রীতি-নীতিকে পর্যালোচনা করেছেন। Hartley Dean সম্পাদিত *'Begging Questions: Street Level Economic Activity and Social Policy Failure'*[৩৫] (১৯৯৯) গ্রন্থে ভিক্ষুক ও পথিকদের নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া ভিক্ষুক ও পথচারীদের সম্পর্ক এবং ভিক্ষার অশুভ দিকগুলি ও ভিক্ষুকদের অর্থনৈতিক কার্যকারিতার বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। J. Wardhaugh তাঁর 'Regulating Social Space: Begging in Two South Asian Cities'[৩৬] (২০০৭) প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি শহরের (দিল্লি ও কাঠমান্ডু) ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। L. Shelley তাঁর *'Human Trafficking: A Global Perspective'*[৩৭] (২০১০) নামক গ্রন্থে বিশ্বের মানুষ পাচারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি পাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করেছেন।

A. A. Adedibu এবং M. O. Jelili তাঁদের *'Package for Controlling Street Begging and Rehabilitating Beggars and the Physically Challenged In Nigeria'*[৩৮] (২০১১) প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। A. Barkat-এর '*Situational analysis of the street children involved in begging in Dhaka city*'[৩৯] (২০১২) প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত পথ শিশুদের সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত এই চর্চাটিতে ঢাকা শহরের পাঁচটি স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষার কারণে। প্রবন্ধটি ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর গুরুত্ব করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত পথ শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। Abdullah Al Helal এবং K. Shahdat Kabir তাঁদের

‘*Exploring cruel business of begging: The case of Bangladesh*’[৪০] (২০১৩) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে কিছু লোকের দ্বারা ভিক্ষার নিষ্ঠুর বাণিজ্য চলছে যেখানে কিছু অসাধু সরকারি কর্মকর্তার সহায়তায় ধনী ব্যক্তি ও নারীরা শিশুদের অপহরণ করে এবং তাদের ভিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। বিশেষত আঠারো বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের অপহরণ করে এবং বেতন বা কমিশনের ভিত্তিতে জনবহুল স্থানে ভিক্ষা করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে বলপ্রয়োগ করে। এছাড়া প্রবন্ধটিতে ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি কেন্দ্রিক বাণিজ্য পদ্ধতির সমীক্ষা করা এবং এই কার্যকলাপে জড়িত গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা কমানোর জন্য দরিদ্রদের পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। A. Billah এবং M. M. Alam তাঁদের ‘*Eradication of Street Begging in Bangladesh*’[৪১] (২০১৭) প্রবন্ধে বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের উন্নয়নের নীতিগুলির পর্যালোচনার পাশাপাশি এটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন যে, কীভাবে পথ ভিক্ষুকদের অধিকার রক্ষা করা এবং কীভাবে তারা দেশের বর্তমান সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারে, সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন।

পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকদের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণেও ভিক্ষুক সংক্রান্ত বিষয়গুলি উঠে এসেছে। J. M. Kumarappa সম্পাদিত *‘Our Beggar Problem: How to Tackle it’*[৪২] (১৯৪৫) গ্রন্থটি ভারতের ভিক্ষুক সমস্যা সম্পর্কে প্রথম গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ভারতের ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, শ্রেণিবিন্যাস, ঐতিহাসিক বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক কারণগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া ভিক্ষুক সমস্যার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তির নিবারণকল্পে

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় আইনগুলিকেও পর্যালোচনা করেছেন। M. S. Gore, J. S. Mathur, M. R. Laljani, এবং H. S. Takulia তাঁদের *'The Beggar Problem in Metropolitan Delhi'*[৪৩] (১৯৫৯) প্রবন্ধে দিল্লির ভিক্ষুক সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন উপায়গুলিকে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া সমাজের আর্থ-সামাজিক অবনমনকে ভিক্ষুক শ্রেণির বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তুলে ধরেন। M. V. Moorthy তাঁর *'Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study'*[৪৪] (১৯৫৯) প্রবন্ধে মুম্বাইয়ের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ ও ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের বিষয়গুলিকে উল্লেখ করেন। M. Rafiuddin তাঁর *'Beggar in Hyderabad: A Study on Understanding the Economics of Beggary in Hyderabad'*[৪৫] (২০০৮) প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ভারতে এমন কোনো শহর নেই যেখানে ভিক্ষুক শ্রেণি লক্ষ করা যায় না। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মীয় রীতি হিসাবে গণ্য করেন।

A. Goel তাঁর *'Indian Anti Beggary Laws and Their Constitutionality Through The Prism of Fundamental Rights With Special Reference to Ram Lakhan V. State'*[৪৬] (২০১০) প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত আইনের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৫ সালের উত্তরপ্রদেশের ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইনের বিষয়গুলি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। Caroline Cheng এবং Vikash Kumar তাঁদের '*Challenges and Strategies of Justice Delivery for Victims of Organised Crimes: Case Studies on Homeless Beggars in Patna District, Bihar'*[৪৭] (২০১২) প্রবন্ধে বিহারের পাটনা শহরের ভিক্ষুকদের অপরাধ প্রবনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে পাটনা শহরের ভিক্ষুকদের মধ্যে ১৩-৫৫ বছরের নারী ও পুরুষদের মধ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা দ্বারা গৃহহীন ও ভিক্ষুকদের অপরাধের মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। M. S. Gore তাঁর

'Society and the Beggar'[৪৮] (২০১৩) প্রবন্ধে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। S. Reddy তাঁর '*Begging and its mosaic dimensions: Same preliminary observations in Kadapa district of Andhra Pradesh*'[৪৯] (২০১৩) প্রবন্ধটি অন্ধ্রপ্রদেশের কাদাপা জেলার ৭০ জন পথ ভিক্ষুকের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক ও সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন ও পাশাপাশি তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে পারিবারিক সমস্যার বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। N. Sarp তাঁর '*Beggars Problem in Akola City In Maharashtra State*'[৫০] (২০১৩) প্রবন্ধে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের ভিক্ষুক শ্রেণি উদ্ভবের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কারণ হিসেবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব, অলসতা, আচার-অনুষ্ঠান এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির বিষয়গুলিকে দায়ী করেছেন। ভিক্ষাবৃত্তির কারণের বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভিক্ষুকদের কোনকোন স্থানগুলিতে লক্ষ করা যায় ও ভিক্ষুকদের দুরবস্থা, আইন, সামাজিক স্তর এবং ধর্মের চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন।

S. Menka এবং B. Falak-এর '*Rural and Urban Beggars of Aligarh District: A Comparative Analysis of Spatial Analysis*'[৫১] (২০১৩) প্রবন্ধে উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা গ্রামীণ ও শহুরে ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কর্মসংস্থান এবং তারতম্য ইত্যাদি বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া শহুরে ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের হার এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্তরের মধ্যে সম্পর্ক, ভিক্ষুকদের কিছু ধরনের উৎপাদনশীল কাজের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন, সেলাই,

রান্না, পুতুল তৈরি, বই বাঁধাই এবং কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি বিষয়, যা ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতা হ্রাস করতে পারে এবং ভিক্ষুকদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করতে কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে, - এই বিষয়গুলি আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু। R. Iqbal Ganai তাঁর '*Beggary: A Socio-Legal Study*'[৫২] (২০১৬) গ্রন্থে সামাজিক ও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ভিক্ষুক এবং ভিক্ষাবৃত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থটিতে সামাজিক ও আইনগত দিক থেকে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব, বিবর্তন, বর্তমান চিকিৎসা এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধীকরণের প্রক্রিয়ার বিষয়গুলিকে আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। Amiya Rao তাঁর '*Poverty and Power: The Anti-Begging Act*'[৫৩] (২০১৬) প্রবন্ধে দ্য বম্বে প্রিভেনশন অফ বেগিং অ্যাক্ট (The Bombay Prevention of Begging Act) - ১৯৫৯-এর একটি বিশদ বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি আইনের অনুচ্ছেদগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও প্রবন্ধটিতে ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইনের বিশ্লেষণ ও ফলস্বরূপ সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন 'দ্য বোম্বে প্রিভেনশন অফ বেগিং অ্যাক্ট, ১৯৫৯'-এর ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও গ্রেপ্তারের বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। P. Sailaja এবং V. Rao-এর '*Profile and Problems of the Beggars in Vishakhapatnam City of Andhra Pradesh: Empirical Evidence*'[৫৪] (২০১৬) প্রবন্ধে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম শহরের ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও শারীরিক অবস্থার বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি ভিক্ষুকদের সামাজিক সমস্যাগুলিকেও তুলে ধরা হয়েছে। S. Saeed তাঁর '*Begging, Street Politics and Power: The Religious and Secular Regulation of Begging in India and Pakistan*'[৫৫] (২০২৩) গ্রন্থে ভারত ও পাকিস্তানের ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে হিন্দু ও মুসলিম সমাজে দান ও দাতব্যের বিষয়টিকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি

ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ক্ষেত্র কাজ করে সেই বিষয়টিকেও তুলে ধরেছেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো কলকাতা কেন্দ্রিক ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কেও কিছু কিছু গবেষণাধর্মী চর্চা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে M. M. Chatterjee-র 'Mendicancy in Calcutta'[৫৬] (১৯১৮) প্রবন্ধটিতে কলকাতার ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টিকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। Moni Nag তাঁর *'Beggar Problem in Calcutta and Its Solution'*[৫৭] (১৯৬৫) নামক প্রবন্ধে কলকাতার ভিক্ষুক সমস্যা ও সরকার কর্তৃক ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। Sumita Choudhury তাঁর *'Beggars of Kalighat Calcutta'*[৫৮] (১৯৮৭) গ্রন্থে কলকাতার কালীঘাটের ভিক্ষুকদের অবস্থান বর্ননা করেছেন। একই সঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের বিষয়টির উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে সমাজতাত্ত্বিকদের বিবরণে বাংলার দারিদ্র্যতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *"রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর"* [৫৯] (১৯৪৩), কালীচরন ঘোষের *'Famine in Bengal, 1770–1943'*[৬০] (১৯৪৪), অমর্ত্য সেনের *'Poverty and Famine'*[৬১] (১৯৮১), পল গ্রীনোর *'Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943–1944'*[৬২] (১৯৮২), দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'বাংলার মন্বন্তর'*[৬৩] (১৯৮৪) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উল্লিখিত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বিবরণগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগের ফলে দারিদ্র্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

তবে উপরোক্ত গবেষণা ও সাহিত্যে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তি ও বিকাশের সঠিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়নি। তাই আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের

সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে - প্রথমত, ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনার দিকটি সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে ভিক্ষুকদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি বিক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সীমিত। বিশেষত ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টিকে সমাজবিদ্যা, সামাজিক কল্যাণ, ভূগোল, রাষ্ট্রচিন্তা, অর্থনীতি ও আইনের বিষয়গুলিতে যেভাবে চর্চিত হয়েছে, সেভাবে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তা আলোচিত হয়নি। এক্ষেত্রে বৃহৎ সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থের স্বল্পতার বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়, যেমন, - ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে চর্চাগুলি লক্ষ করা যায়, সেগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির উপর প্রাথমিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ফলে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি সাধারণত একটি গৌণ বিষয় হিসেবে চর্চিত হয়েছে। তাই ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত গবেষকদের মধ্যে গবেষণার স্বতঃস্ফূর্ততা পায়নি।

তদুপরি, ভিক্ষুকদের মানবাধিকার নিয়ে কোথাও সেভাবে আলোকপাত হয়নি। ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক অপরাধ ও প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু ভিক্ষুকদের এই দুরবস্থার বিষয়টি সমাজ বা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি, তাই তাদের কিছু অধিকারকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সক্ষম মানুষ হিসাবে অস্বীকার করা হয়। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র ভিক্ষুক সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ

করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গবেষণায় উপলভ্য প্রাথমিক ও গৌণ তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলিকে সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩. গবেষণা সম্পর্কিত সমস্যা:

ভিক্ষাবৃত্তি হল দারিদ্র্যতার (Poverty) পরিণতি, যা সমাজে একাধিক দুর্বলতার পরিস্থিতি তৈরি করে। একইভাবে ভিক্ষাবৃত্তির ধারণাকে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুগামীদের মধ্যে, যেমন - হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ইত্যাদি। দারিদ্র্যতা ও জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতি সমাজে বহু মানুষকে বাধ্য করে ভিক্ষুকের মত জীবনযাপন করতে। গৃহহীন ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র্য, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, ভিন্নভাবে প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, বয়ঃবৃদ্ধ, দুর্বল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমাজের এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হন। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি কোনো নির্দিষ্ট একটি কারণের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়নি। অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে দারিদ্র্য (প্রকৃত দরিদ্র বা প্রতারক দরিদ্র), শারীরিক অক্ষমতা, সংস্কৃতি, জাতীয় বিপর্যয়, গৃহযুদ্ধ, খারাপ অভ্যাস (মাদক, অ্যালকোহল এবং জুয়া নির্ভরতা), পারিবারিক ঐতিহ্য, গ্রাম থেকে শহরে অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন, মানসিক অক্ষমতা এবং ব্যাধি, বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত উপার্জন ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। অন্যদিকে, সামাজিক কারণ হিসেবে নিরক্ষরতা, অভিবাসন, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন এবং পিতামাতার মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষনীয়। এছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তির জৈবিক কারণগুলি হল বার্ধক্য, রোগ, পঙ্গুত্ব এবং মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি। ১৯৮১-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ের শহরাঞ্চলের ভিক্ষুক শ্রেণির অবস্থানের সামগ্রিক চিত্রকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে শহরাঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ৭,৫০,৩০৭ জন ভিক্ষুকের মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৫,১৫,৬৭৫ জন ও শহরে বাস করেন ২,৩৪,৬৬২ জন।[৬৪] ১৯৯১

সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৩,৩৮,৮৭২ জন শহরে বাস করেন ২,০৪,৫০৩ জন।[৬৫] ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৬,২৭,৬৮৮ জনের মধ্যে ৪,১৩,০৩৩ জন গ্রামে বাস করেন ও ২,১৪,৬৫৫ জন শহরে বাস করেন।[৬৬] ২০১১ সালে ভারতের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের (Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India) প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৪,১৩,৬৭০ জন। এদের মধ্যে ১,৩৫,৩৬৭ জন ভিক্ষুক শহরাঞ্চলে বসবাস করেন।[৬৭] শহরাঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল দারিদ্র্যতা। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রামের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষেরা অভিবাসন ও কর্মসংস্থানের কারণে শহরাঞ্চলে আসা ৯৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৯৭ শতাংশ মহিলা দরিদ্র, ফলে তাদের বৃহৎ অংশ কর্মসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয়।[৬৮]

১.৪. গবেষণার পরিসর ও তাৎপর্য:

পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী চর্চা খুবই সীমিত। তাই, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়টি সন্দর্ভে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের কারণগুলি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে, ভিক্ষুকদের সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা পর্বটিতে কলকাতা শহরের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে রাষ্ট্রীয় পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতিগুলিকে অধ্যয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য এই যে, এটি পাঠকদের ভিক্ষুকদের স্থানীয় পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত এবং জীবনযাত্রার অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে। যেহেতু ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে

ভিক্ষুকের সংখ্যা অধিকমাত্রায় বসবাস করে। তাই, আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে কলকাতা শহরের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করা হয়েছে। যেহেতু, সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভিক্ষুকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রান্তিকতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থের অভাব রয়েছে। অতএব, এই ধরনের পরিস্থিতিতে গবেষণার প্রয়োজনে পরিকল্পনা ও কিছু নিবিড় গবেষণা করা প্রয়োজন। এটি শহরাঞ্চলের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতামূলক তথ্য তৈরি করতে সহায়তা করবে। এছাড়া সন্দর্ভটি পরবর্তী সময়ে আরোও গবেষণাধর্মী প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করবে।

১.৫. গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান:

ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা, হুগলী (গঙ্গা) নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে ১৮৮৬.৬৭ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সাম্প্রতিককালে এটি মূলত 'মেগা সিটি' (১৮৫.০০ বর্গ কি.মি.) ও 'মেট্রো সিটি' (১৮৮৬.৬৭ বর্গ) এই দুই ভাগে বিভক্ত। কলকাতা পূর্ব ভারতের প্রধান বানিজ্যিক কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও শিক্ষানগরী হিসাবে স্বীকৃত। এটি ভারতের প্রাচীনতম বন্দর এবং দেশের একমাত্র প্রধান নদী বন্দর। কলকাতা শহর হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ দুই ২৪ পরগনা জেলায় স্পর্শ করে। বর্তমানে শহরটি ১৪১ টি পৌর ওয়ার্ডে বিভক্ত।[৬৯]

মানচিত্র – ১.১: ভারতের মানচিত্রে গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান

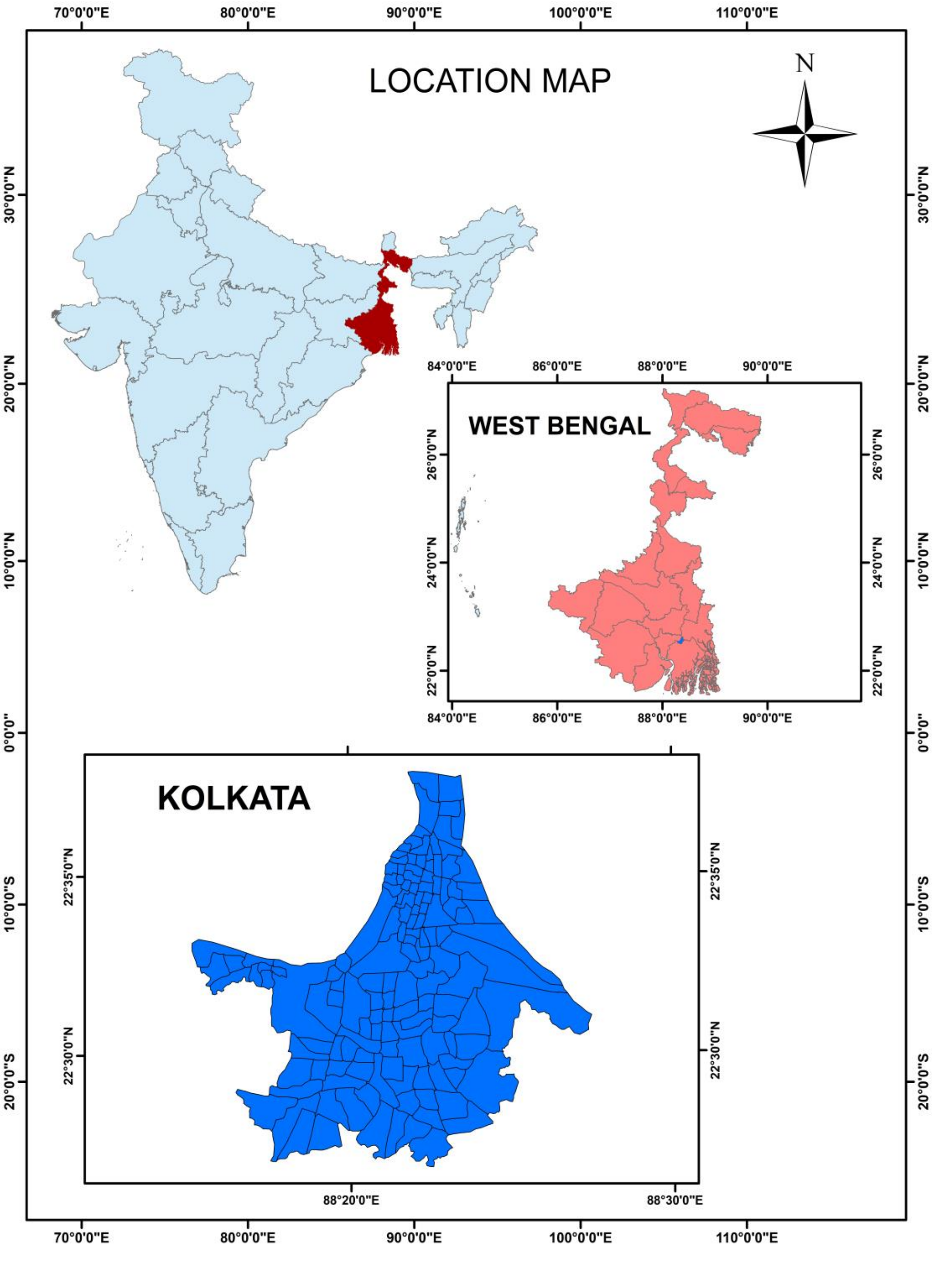

সূত্র: কলকাতা পৌরসংস্থা, বৈদুতিন মানচিত্র নির্মান: গবেষক স্বয়ং প্রসেনজিৎ নস্কর।

মানচিত্র – ১.২: কলকাতা জেলার ওয়ার্ড ভিক্ষুক শ্রেণির অবস্থানের মানচিত্র।

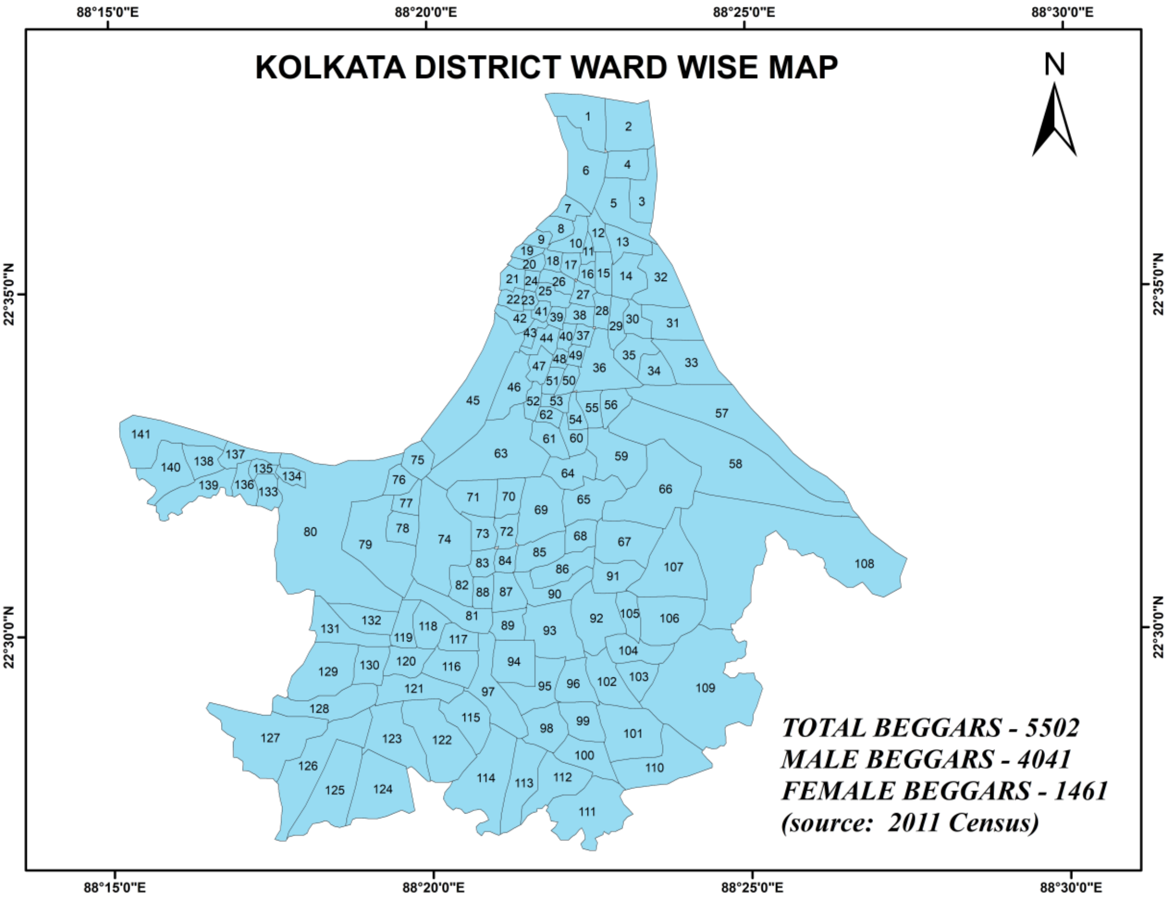

সূত্র: কলকাতা পৌরসংস্থা, বৈদুতিন মানচিত্র নির্মান: গবেষক স্বয়ং প্রসেনজিৎ নস্কর।

২০১১ সালের জনগননা অনুসারে, কলকাতা মেগা শহরের জনসংখ্যার পরিমান ছিল ৪৪,৯৬,৬৯৪ জন এবং বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ। সাধারণত শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ২৪,৩০৬ জন। শহরে পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যা যথাক্রমে ২৩,৫৬,৭৬৬ জন এবং ২১,৩৯,৯২৮ জন। সাধারণ কলকাতা মেগা শহরে লিঙ্গ ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলার অনুপাত প্রতি হাজারে ৯০৮ জন। অনুরূপভাবে শিশুদের লিঙ্গ ভিত্তিক অনুপাত প্রতি হাজারে ৯৩৩ জন, যাদের গড় বয়স (০-৬)। এছাড়া শহরে গড় শিক্ষার হার ৮৬.৩১ শতাংশ, আর পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮৮.৩৪ শতাংশ (১৯,২৬,৯১৫) এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৮৪.০৬ শতাংশ (১৬,৬১,২২২)। শহরের মোট শিশুদের সংখ্যা

(০-৬ বয়স) পর্যন্ত ৩,৩৯,৩২৩, যা মোট জনসংখ্যার ৭.৫৫ শতাংশ। ২০১১ সালে আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১২,২৫০ পরিবার কলকাতা ফুটপাতে বাস করেন এবং ৬৯,৭৯৮ জন গৃহহীন খোলা আকাশের নীচে বসবাস করে। যা কলকাতার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.৫৫ শতাংশ।[৭০] একইভাবে ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কলকাতার ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ৩০,৫০০ জন। এই কলকাতাকে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

১.৬. গবেষণার সময়কাল:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের সময়কাল হিসেবে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নির্বাচিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯০১-২০১১-এর সময়কালের মধ্যে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়গুলিকে অনুসন্ধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার সূচনাপর্ব হিসাবে ১৯০১ সময়টিকে বেছে নেওয়ার মুখ্য কারণ হল, ভবঘুরের পাশাপাশি ভিক্ষুকদেরও আদমশুমারির প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা ও পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে চিহ্নিতকরণ। একইভাবে ২০১১ সময় পর্বটিকে গবেষণার শেষ পর্যায় হিসেবে তুলে ধরার কারণ ভিক্ষাবৃত্তির পেশাগত বিভাজনের বিষয় ও রাষ্ট্রীয় প্রকল্প সত্ত্বেও ভিক্ষুক সমস্যা বৃদ্ধির কারণে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০১১-এর রাজ্যসভায় ‘দ্য প্রিভেনশন অফ বেগিং বিল, ২০১০’-এর ভিক্ষাবৃত্তির নতুন আইন প্রণয়ন হয়েছে।

১.৭. গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে আলোকপাত করা এবং ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি শব্দের আক্ষরিক অর্থের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও

ভিক্ষুক শ্রেণির বিবর্তনের ধারার পর্যালোচনা করা। একইভাবে ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের কারণগুলির বিশ্লেষণ। পাশাপাশি সরকারি নীতির আলোকে ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিন্যাস ও জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত কৌশলগুলিকে বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ও আইনের বিষয়গুলিকে আলোচ্য সন্দর্ভে অনুসন্ধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৮. গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রশ্ন উঠে আসে। -

১. ভিক্ষুক কারা ও তাঁদের উদ্ভবের কারণ কী ?

২. ভিক্ষুক শ্রেণির বিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

৩. ভিক্ষাকে ‘বৃত্তি’ হিসাবে বেছে নেওয়ার মূল কারণগুলি কী ?

৪. ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা।

৫. সরকারি নীতির আলোকে ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

৬. ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণে রাষ্ট্র কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কতটা ফলপ্রদ হয়েছে তার বিশ্লেষণ।

১.৯. গবেষণার উপাদান ও পরিকল্পনা:

ইতিহাস একদিকে যেমন কালের দর্পণ, তেমনি ইতিহাসের অনৈতিকতা, তথা তথ্য বিকলনও সমূহ ক্ষতির কারণ। থমাস হবসের (Thomas Hobbes) মতে, ইতিহাসের বিকৃতি পারমানবিক শক্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর। ইতিহাসকে সত্যের মাপকাঠিতে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির

নিরিখে বিচার করতে হবে। নতুবা তা কাহিনিতে পর্যবসিত হবে এবং কালের দাবিতে জবাবদিহি অবশ্যই করতে হবে। ভিক্টর হুগো বলেছেন, - ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে। এতদিন শুধু তথ্যের দীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাস লেখা হয়েছে, এবার নীতির দিক থেকে ইতিহাস লেখার সময় এসেছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, - 'ইতিহাস তথ্যভিত্তিক কিছু তথ্যের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তবে তথ্য থেকে উত্তরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য' কথাটি মেনে না নিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণহেতু প্রাথমিক ও গৌণ উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেই উপাদানের বিষয়টি প্রধানত কোনো অভিজ্ঞতা, ঘটনা যা অভ্যাসের জায়গা থকে উপলব্ধ হয়। প্রথাগত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে সরকারি লেখ্যাগার বা মহাফেজখানার উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে তথ্য অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে আমাদের সমূহ গুরুত্ব অরোপ করতে আগ্রহী করে তুলেছে। যা ইতিহাসচর্চার সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা, পত্র-পত্রিকা, মৌখিক উপাদান (Oral Narative) এবং চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অনেকটা লেখ্যাগার বা মহাফেজখানার সীমাবদ্ধতার শূণ্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ গবেষণা সন্দর্ভটি সরকারি পরিভাষা পুনর্মূল্যায়নের পাশাপাশি স্থানীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতাবৎ প্রকাশিত হওয়া গ্রন্থের (Secondary Sources) বিচার্যতাকে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে কলকাতার ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়টি বিশ্লেষণে সচেষ্ট হওয়া যাবে। আলোচ্য গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদানের ভিত্তিতে কলকাতার ভিক্ষুকদের উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১.১০. গবেষণার অধ্যায় পরিকল্পনা:

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় পরিকল্পনাহেতু ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। - **প্রথম অধ্যায়:** ভূমিকাতে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের মূল কাঠামোটি রূপায়ণ করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণা সম্পর্কিত সমস্যা, তাৎপর্য, গবেষণার ভৌগোলিক অবস্থান, বিষয়বস্তু, গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী, গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদান, অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গবেষণার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়:** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন। এই অধ্যায়টিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থের বিশ্লেষণের দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির বাস্তবিক চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়:** কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির ঐতিহাসিক বিবরণ। আলোচ্য অধ্যায়টিতে কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সামগ্রিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক ইতিহাসকে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ধারাবাহিক ইতিহাসের পর্যায়কে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, ঔপনিবেশিক পর্ব (১৯০১-১৯৪৭), স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরণ পর্ব, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ব (১৯৫১-১৯৮১), উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের পর্ব (১৯৮১-২০১১)। **চতুর্থ অধ্যায়:** আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব। এই অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক সমস্যার মূল দিকগুলিকে তুলে ধরার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ভিক্ষা দেওয়ার কারণগুলিও আলোচ্য অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়:** সরকারি নীতির আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণির বিভাগ। ফলত ভারতীয় সামাজে

ভিক্ষাবৃত্তি ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণি বিভাজন ঘটেছে। পাশাপাশি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও নানান পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির কৌশলগুলিকে বর্নিত করা হয়েছে। **ষষ্ঠ অধ্যায়:** ভিক্ষুক শ্রেণির পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতি। এই অধ্যায়টিতে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থার মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। **সপ্তম অধ্যায়:** উপসংহারে সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটির স্বরূপ দেখানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বেদান্তনন্দ (সম্পা.): *শ্রীউদ্ধব গীতা,* (কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম পুনমুর্দ্রণ, ২০১৭), পৃ. ১৮৩।

২. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৮৩-১৯৭।

৩. *তদেব*।

৪. Rajya Sabha: *Bill No. LXXXI of 2010, The Prevention of Begging Bill, 2010*, As Introduced in Rajya Sabha on the 25th February, 2011, (Published on GMGIPMRND-6680RS(S3)-28-02-2011).

৫. UN-Habitat: *The Challenge of Slums Global Report On Human Settlements*. *[online]* (London & Sterling, Earthscan Publications Ltd., 2003), Available at: http,7/www.imhahitar.org/pmss/getPage.asD?oage=bookYiew&book=1156 [Last accessed: 24.08.2019].

৬. Lisa Schlein and Sven Krüger: ‘Urban poor worse off than rural poor but good policies can reduce slums: A report by UN-Habitat with additional reporting,” (18 June 2006), http://www.citymayors.com/society/urban_poor.html [Last accessed: 09.12. 2019].

৭. World Bank, ‘Poverty and Equity Brief, South Asia, India, (2011)’. https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Archives-2019/Global_POVEQ_IND.pdf.

[Last accessed: 12.08.2019].

৮. International Food Policy Research Institute (IFPRI), "Global Hunger Index Report (2011)." http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf. [Last accessed: 12.09.2019].

৯. J. M. Kumarappa (ed.), *Our Beggar Problem: How to Tackle It,* (Bombay, Padma Publication, 1945), পৃ.পৃ. III-VI.

১০. Jabir Hasan Khan & Menka Shamshad, 'Problems of Beggars: A Case Study', *International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) ISSN: 2319-4421 Volume 2, No. 12, (December, 2013),* পৃ. ৬৭।

১১. Census of India, 1971: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 1973).

১২. Census of India, 1981: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 1983).

১৩. Census of India, 1991: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 1993).

১৪. Census of India, 2001: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 2003).

১৫. Census of India, 2011: *City of Calcutta. Part I, Volume VI* (Calcutta, Census of India, 2013).

১৬. Lok Sabha: *Statement given on 08.03.2016,* (New Delhi, The Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India).

১৭. Friedrich Engels: *The Origin of the Family, Private Property and the State 1884,* (Chicago, Charles H. & Co., 1902).

১৮. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *Calcutta, The Calcutta Municipal Gazette, (25th October, 1943).*

১৯. J. M. Kumarappa (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৯।

২০. Martin Luther: *Liber Vagatorum,* in transelte The Book of Vagabonds and Beggars, (London, John Camdenhotten, Piccadilly, 1528), পুনর্মুদ্রণ, (1860).

২১. Robert Copland: *High Way to the Spittle House,* (London, OUP, 1535).

২২. John Awdeley: *Fraternity of Vagabonds,* (London, Iohn Awdeley, 1561).

২৩. Thommas Harman: *A Caveat for common Cursetors,* (London, Wylliam Gryffith, 1566).

২৪. William Shakespeare: *Timon of Athens,* (London Oxford University press, 1606).

২৫. John Fletcher: *The Beggars of Bush,* (London: Humphrey Robinson, 1642).

২৬. Richard Brome: *The Antipodes,* (London, Theatre Arts Book, 1640).

২৭. Charles John Huffam Dickens: *Great Expectation,* (London, Oxford University Press, 1861).

২৮. Victor Marie Hugo: *Les Miserable,* (London, Penguin,1862).

২৯. Count Lev Nikolayevich Tolstoy: *The Poor People,* (California, University of California Press, 1858).

৩০. Dominique Lapierre: *City of Joy,* (New York, Grand Central Publishing, 1985).

৩১. শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়: *যাদের কথা কেউ বলে না,* (কলকাতা, পূর্ণ প্রকাশন, ১৯৯৭)।

৩২. বিনতা রায়চৌধুরী: *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য,* (কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭)।

৩৩ J. L. Gillin: 'Vagrancy and Begging', *American Journal of Sociology, Vol. 35, No. 3,* (1929), পৃ.পৃ. ৪২৪-৪৩২।

৩৪. R. Bromley: 'Begging in Cali: Image, Reality and Policy'*, International Social Work, 24 (2), (1987),* পৃ.পৃ. ২২-৪০।

৩৫. Hartley Dean (ed.): *Begging Questions: Street Level Economic Activity and Social Policy Failure,* (Bristol, Policy Press, 1999).

৩৬. J. Wardhaugh: Regulating Social Space: Begging in Two South Asian Cities. Paper presented at the annual meeting of the *American Society of Criminology,* (Royal York and Toronto, 2007).

৩৭. L. Shelley: *Human Trafficking: A Global Perspective,* (London, Cambridge University Press, 2010).

৩৮. A. A. Adedibu and M. O. Jelili: 'Package for Controlling Street Begging and Rehabilitating Beggars and the Physically Challenged in Nigeria', *Global Journal of Human Social Science, Vol. 11, (USA, 2011).*

৩৯. Abul Barkat, Asmar Osman, Manzuma Ahsan & Hasna Hena Shawaly: Situational analysis of the street children involved in begging in Dhaka city, (Dhaka, Human Development Research Centre, 2012).

৪০. Abdullah Al Helal and Shahdat, K. Kabir: 'Exploring cruel business of begging: The case of Bangladesh', *Asian Journal of Business and Economics Volume 3, No.3.1 Quarter I (2013).*

৪১. Md. Arif Billah & Mohammad Manjur Alam: 'Eradication of Street Begging in Bangladesh: In Islamic Perspective', *International Academic Research Journal of Business and Management, Vol. No.6, No. 1, (October 2017),* পৃ.পৃ. ১৪-২৩।

৪২. J. M. Kumarappa (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It,* (Bombay, Padma Publication, 1945).

৪৩. M. S. Gore, J. S. Mathur, M. R. Laljani, and H. S. Takulia: *The Beggar Problem in Metropolitan Delhi,* (New Delhi, Delhi School of Social Work, 1959).

৪৪. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study,* (Bombay, Indian Conference of Social Work, 1959).

৪৫. M. Rafiuddin: *Beggar in Hyderabad: A Study on Understanding the Economics of Beggary in Hyderabad,* (Hyderabad, Council of Human Welfare, 2008).

৪৬. A. Goel, 'Indian Anti Beggary Laws and Their Constitutionality Through the Prism of Fundamental Rights with Special Reference to Ram Lakhan V. State', *Asian Pacific Journal of Human Rights and the Law, 11 (1), (2010),* পৃ.পৃ. ২৩-৩৮।

৪৭. Caroline Cheng & Vikash Kumar, Challenges and Strategies of Justice Delivery for Victims of Organised Crimes: Case Studies on Homeless Beggars in Patna District, Bihar, Mumbai: 35th All India Criminology Conference at Tata Institute of Social Sciences, 2012.

৪৮. M. S. Gore: ‘Society and the Beggar’, *Sociological Bulletin, Vol. 7, No. 1 (March 1958),* পৃ.পৃ. ২৩-৪৮।

৪৯. S. Reddy: ‘Begging and its mosaic dimensions: Same preliminary observations in Kadapa district of Andhra Pradesh’, Afro Asian Journal of Social Sciences 4 (1), (2013), পৃ.পৃ. ১-৩১।

৫০. Nileema Sarap, N. S. Sarap & P.G. Mehta: ‘Beggars Problem in Akola City in Maharashtra State’, *IOSR Journal of Humanities and Social Science, (IOSR-JHSS) Volume 15, Issue 6, (Sep. - Oct. 2013),* পৃ.পৃ. ৪৫-৪৮।

৫১. Saini Menka & Butool Falak: ‘Rural and urban beggars of Aligarh District: A comparative analysis of spatial analysis’, *Economic, 2013.*

৫২. R. Iqbal Ganai: *Beggary: A Socio-Legal Study*, (Delhi, A. P. H. Publishing Corporation, 2016).

৫৩. Amiya Rao: ‘Poverty and Power: The Anti-Begging Act’, *Economic & Political Weekly, Vol. 16, Issue No. 8, 21 Feb, 1981.*

৫৪. P. Sailaja & V. Rao: ‘Profile and problems of the beggars in Vishakhapatnam City of Andhra Pradesh: empirical evidence’, *International Journal of Scientific Research, Volume: 5, Issue: 7 (July 2016),* পৃ.পৃ. ৫০৪-৫০৮।

৫৫. Sheba Saeed: *Begging, Street Politics and Power: The Religious and Secular Regulation of Begging in India and Pakistan*, (New York, Routledge, 2023).

৫৬. M. M. Chatterjee: *Mendicancy in Calcutta*, (Calcutta, Central Press, 1918).

৫৭. Moni Nag: *Beggar Problem in Calcutta and Its Solution,* published in *The Indian Journal of Social Work, 16(3), (1965),* পৃ.পৃ. ২৪৩-২৫২।

৫৮. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat Calcutta,* (Calcutta, Anthropological Survey of India, 1987).

৫৯. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: *রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর,* (কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫১)।

৬০. Kali Charan Ghosh: *Famine in Bengal, 1770–1943,* (Calcutta, National Council of Education Bengal, 1944).

৬১. Amartya Sen, *Poverty and famine*, (Oxford, Oxford University Press, 1981).

৬২. Paul R. Greenough: *Prosperity and misery in modern Bengal: The famine of 1943 – 1944,* (Oxford, Oxford University Press 1982).

৬৩. দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়: *বাংলার মন্বন্তর,* (কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৮৪)।

৬৪. Census of India, 1981: *প্রাগুক্ত*।

৬৫. Census of India, 1991: *প্রাগুক্ত*।

৬৬. Census of India, 2001: *প্রাগুক্ত*।

৬৭. Lok Sabha: *Statement on 08.03.2016, প্রাগুক্ত*।

৬৮. Ashray Adhikar Abhiyan: 2006. https://www.homelesspeople.in/. [Last Accessed: 12.02.2020].

৬৯. Basudeb Bhatta: *Remote Sensing and Gis*, (Oxford, Oxfod University Press, 2011).

৭০. Census of India, 2011: *প্রাগুক্ত*।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন

বর্তমান সময়ে সমাজ বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে ইতিহাসের গবেষণায় নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ও তার পরিবর্ধন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, নিম্নবর্গীয় প্রভৃতির ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি 'প্রান্তিক মানুষের ইতিহাসচর্চা'র দিগন্তও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তত্ত্বগতভাবে 'প্রান্তিক মানব' শব্দটি নতুন হলেও আদতে এই মানুষেরা মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই ছিলেন। বর্তমানে 'প্রান্তিক মানবে'র তাত্ত্বিক রূপটি গড়ে উঠেছে মাত্র। 'প্রান্তিকতা তত্ত্বে'র (Marginality Discourse) প্রথাগত ধারণার বাইরেও সাম্প্রতিককালে ইতিহাসের গবেষণায় নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন ঘটছে।[১] সেক্ষেত্রে এই প্রান্তিকতা তত্ত্বের মধ্যেই ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কিত ইতিহাসোচিত চর্চা উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে 'প্রান্তিকতা' বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং কীভাবে প্রান্তিকতা থেকে সামাজিক স্তরে ভিক্ষুকদের আবির্ভাব ঘটছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

'Marginal' ইংরেজি শব্দটি সমাজ বিজ্ঞানে ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়।[২] যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ হল 'প্রান্তিক'। সাধারণভাবে 'প্রান্তিক' কথাটির দ্বারা সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা গোষ্ঠীগুলিকে বোঝানো হয়; যাদের অবস্থান সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে। 'প্রান্তিক' শব্দটির বিবর্তনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে প্রান্তিকতা। বর্তমানে প্রান্তিকতার সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বৌদ্ধিক প্রতর্ক রয়েছে। কোনো জাতি বা গোষ্ঠী অকস্মাৎ প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয় না, সামাজিক বৈষম্যের অবস্থানে ধীরে ধীরে প্রান্তিকতায় পরিবর্তিত হতে থাকে। একাধারে 'প্রান্তিক' মানুষদের কথা আলোচনা করতে

গিয়ে হাজার হাজার মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ভেসে উঠে। প্রান্তিক গোষ্ঠীরা মূলত একই প্রজাতি, গোষ্ঠী, জাতপাতের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই 'প্রান্তিক' গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের অবস্থান রয়েছে, যাদের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ অবস্থায় রয়েছে; আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল ধারার সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগই নেই। প্রান্তিকতার রূপ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির ভাষা, খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জনঘনত্ব, প্রতিবন্ধকতা ও ব্যক্তিভেদে।[৩] প্রসঙ্গত, উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমি ভাবুকদের দ্বারা এই শব্দটির সৃষ্টি। তাঁরা বিষয়টিকে জনসমক্ষে তুলতে গিয়ে বলেছেন;

'Marginality is generally used to describe and analyse socio-cultural, political and economic spheres, where disadvantaged people struggle to gain access (societal and spatial) to resources, and full participation in social life. In other words, marginalished people might be socially, economically, politically and legally ignored, exculded or neglected, and are therefore vulnerable to livelihood change.'[৪]

এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রান্তিকতা হল সমাজ বৃত্তের সেই পরিধি যেখানে কোনো একক মানব বা মানব গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কেন্দ্রের তুলনায় দূরে অবস্থান করে এবং সেই অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে আসার জন্য সংগ্রাম করে। কেন-না তার কাছে এই অবস্থানটি বিপজ্জনক। এই সকল প্রান্তিক মানুষজন নানাভাবে নিগৃহীত, অসম্মানিত এবং অবজ্ঞার শিকার হয়ে থাকেন। আর এই প্রান্তিকতা তত্ত্বের মধ্যেই ভিক্ষুকদের অবস্থান আলোচিত হতে পারে।

ভিক্ষুক সমস্যার মতো একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যার চরিত্র সারা বিশ্বে প্রায় একই রকমের এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত প্রচলিত সাহিত্য ও গবেষণামূলক বিশ্লেষণে এটিকে স্বীকার

করে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশে এই ভিক্ষাবৃত্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় এবং প্রায় সকল দেশেই ভিক্ষাবৃত্তি একটি অতীব সাধারণ বিষয়। অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তির অস্তিত্ব প্রায় সকল দেশে কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই ভিক্ষাবৃত্তিকে শুধুমাত্র বঞ্চনা, বিয়োজন বা বিভাজনমূলক বিষয় হিসেবে সরলীকরণ করে দেখা ঠিক নয়, বরং বিষয়টিকে মানুষের নাগরিকত্ব, মর্যাদাসম্পন্ন কাজ ও জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চনার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে ভাবা যেতে পারে।[৫] সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় বলা হয়েছে, - "Wherever beggary appears amongst people, there is, a physical, social and economic deprivation, especially when such deprivation is not countered by any organised effort. Panhandling defines a situation where in the needy ask for material benefits or money and sometimes even basic amenities like food and clothing."[৬] - এই কারণে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ (Distress People) বলা হয়। ভিক্ষাবৃত্তি কোনো স্বেচ্ছামূলক বৃত্তি নয়, এই বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষেরা নিতান্ত বাধ্যবাধকতার জায়গা থেকেই এই বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এটা অনস্বীকার্য যে, ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের সমাজে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ভিক্ষাবৃত্তি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটিকে একটি সার্বজনীন ঘটনা হিসেবে গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত পশ্চিমি সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির প্রাবল্য কম। দ্বিতীয়ত, ভিক্ষার সঙ্গে জনসংখ্যার কাঠামোর সম্পর্ক রয়েছে তা সর্বজনবিদিত। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরাঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা এবং ঘনত্ব বেশি।[৭] আলোচ্য অধ্যায়টিতে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তনের বিষয়টি জাতীয় ও

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থের বিষয়টিকেও তুলে ধরা হয়েছে।

২.২. ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা:

ভিক্ষুক একটি সার্বজনীন বিষয় যা প্রাচীন সময়কাল থেকে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। পশ্চিমি দেশগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তির যে ধরন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। উন্নত দেশগুলিতে ভিক্ষুকরা বিভিন্ন শিল্প ও কলা প্রদর্শনের দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি করে থাকেন, কিন্তু ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি দয়া ও করুণার পথ।[৮] ভিক্ষাবৃত্তি কোথায় এবং কখন প্রথমে শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনোও লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তথাপি বিভিন্ন গবেষণায় ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে। আদিম সমাজগুলিতে ভিক্ষুক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না, কারণ তৎকালীন সমাজ বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বসবাস করত ও একে অপরের সাহায্য করত। ভিক্ষুক বা ভিক্ষাবৃত্তির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় কালক্রমে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন ঘটে।[৯]

সভ্যতার সূচনা পর্বে ভিক্ষা প্রদানকে একটি পবিত্র কর্ম হিসাবে বিবেচিত করা হত ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হত। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় ভিক্ষা প্রদান ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তাই পতিতাবৃত্তি, দাসত্ব ইত্যাদি প্রান্তিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জন্য প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় সহায়তার ব্যবস্থা ছিল।[১০] সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সহায়তা ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তিরও পরিবর্তন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মধ্যযুগের ইউরোপে মেন্ডিক্যান্ট ফ্রিয়ার্স, জিপসিস, ভিক্ষাবৃত্তির পন্ডিত, রোমের ব্যান্ড ও পাম রিড এবং ফিজিওগামির মতো বিষয়গুলির পাশাপাশি ব্ল্যাক ডেথ, শিল্প বিপ্লব, আমেরিকার আবিষ্কার, ষোড়শ ও সপ্তদশ

শতাব্দীর যুদ্ধ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির জন্য, যা পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছিল ফলে সমাজে ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১]

মধ্যযুগের সূচনালগ্ন থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মীয় ভাবাদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হত। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দানের মধ্যে দিয়ে পুণ্যার্জনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসজীবনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তিকে সম্পূর্ণ পেশা হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রটি সমাজে পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশে ভিক্ষুকদের সাহায্য করার ক্ষেত্রটি ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে মিশনারিগুলি দানক্ষেত্র হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এই সকল মিশনারিগুলি দরিদ্রদের এমনভাবে সাহায্য করত, যাতে তাদের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন না হয়।[১২] এই সময় থেকে ভিক্ষাবৃত্তি সাধারণ মানুষের কাছে বিরক্তিকর উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। এ সত্ত্বেও লক্ষ করা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের শ্রমজীবী আইন, সপ্তম শতাব্দীতে দরিদ্র আইন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে শ্রম আইন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমি উন্নত দেশগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তি রোধে আইন তৈরি করা হয়েছিল। যদিও, এই সময়ে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত যেমন, - ধর্মীয় ক্ষেত্র, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ, যুদ্ধজনিত, বৃদ্ধ, শারীরিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভিক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।[১৩]

আর্থ-সামাজিক বিষয়ের বিভিন্ন দিক যেমন, - স্বল্প আয়, বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রভাবিত করে এসেছে। ভিক্ষাবৃত্তির এই বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে বিশ্লেষণ করে এই বৃত্তিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করা হল।

২.৩. ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞা ও আক্ষরিক অর্থ:

'ভিক্ষুক' (Beggar) শব্দটি বিশ্বে নতুন নয়, বিশেষত ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই ধারণাটি বিদ্যমান। ভারতে ভিক্ষুক শ্রেণিকে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত করা হয়ে থাকে, যেমন - ভিক্ষু (Bikshu), দরবেশ (Darvesh), ফকির (Fakir), সাধু (Sadhu) ও সন্ন্যাসী (Sannyasi) ইত্যাদি।[১৪] বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি ভারতেও ভিক্ষুক শ্রেণিকে ধর্মীয় অর্থে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। ভিক্ষা শব্দটি ধর্মীয় রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে উল্লিখিত হওয়ার কারণে, ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে বিবেচিত করা হত না।[১৫] বর্তমান সময়ে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ খুবই জটিল ও বিবাদমান। সাধারণত, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক, ভিক্ষাবৃত্তিকে দরিদ্র (Poor) ও দারিদ্র্যতা (Poverty) থেকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করেন। ভিক্ষুক শ্রেণি দারিদ্র্যতা (Poverty) ও দৈন্যতা (Misery) থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অ-ভিক্ষুক শ্রেণির উপর নির্ভরশীল।[১৬] ভিক্ষুক শ্রেণির বিভিন্ন কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে MOLSA (১৯৯২) কর্তৃক "Study on Begging in Addis Ababa: Ethiopia" গবেষণা পত্রে ভিক্ষাবৃত্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, - "Begging as method of earning one's living from the income obtained from other sectors of society using age, health and economic conditions as a means of gaining sympathy".[১৭] MOLSA প্রদত্ত ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞাটি "Webster's Third International Dictionary"[১৮]-তে ভিক্ষাবৃত্তির সম্পর্কিত ধারণার একই রূপ। 'Encyclopaedia of Social Work in India'-তে ভিক্ষুক শ্রেণিকে ভারতের চলমান দাতব্য সন্ধানকারী মানুষ হিসেবে দেখত, যাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের উপায়টি সহজেই তারা লক্ষ করতে পারে; এবং এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই গৃহহীন এবং শহর ও শহরাঞ্চলের বিভিন্ন ফুটপাত, রেল স্টেশন, ওভার ব্রিজের নিচে বাস করে থাকেন।[১৯]

শহরের ভিক্ষুকদের অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তির কারণে ভবঘুরে মানুষের মতো কোনো প্রকার আইনসঙ্গত উপায় ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভবঘুরেরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে বিষয়ে সক্ষম হলেও, তারা ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে জীবন নির্বাপিত করেন।

ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন দিকগুলির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ১৮২৪ সালে ইউরোপীয় ভবঘুরে আইন (European Vagrancy Act, 1824) অনুসারে ভিক্ষুকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। ইউরোপীয় ভবঘুরে আইনের উল্লিখিত সংজ্ঞাটি 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোসাল ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া' (Encyclopaedia of Social Work in India)-তে বিশ্লেষিত হয়েছে, - "A beggars means any person of European extraction found asking for alms when he has sufficient means of subsistence of asking for alms in a threatening or insolent manner or continuing to ask for alms of any person, after he has required to desist".[২০] EVA প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ভারতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিক ও সরকার কর্তৃক ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ভারতের আদমশুমারি (Census of India, 2001) অনুসারে ভিক্ষুক হল, - "Vagrants, Prostitutes and person having unidentified source of income and those with unspecified source of subsistence and not engaged in any economically productive work during reference period called Beggars".[২১] সমাজতাত্ত্বিক Ahamdi তাঁর প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তিকে সংজ্ঞায়িত করেন, - "Begging is a social problem which has not only psychological consequences such as the development of inferiority complex in the beggar's family member and their network of kingship, but also problem of begging will affect, as a unpleasant problem, the geographical and social structure of the urban areas."[২২] G.R. Madan (১৯৮২) তাঁর গ্রন্থে ভিক্ষুক শ্রেণি

সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, - “A beggar is one who asks for alms or charity or performs such action which drive sympathy from others and who give something in return.”[২৩] রাধাকমল মুখার্জি (১৯৪৫) ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, - “Begging is a symptom of social disorganization.”[২৪] উপরি বর্ণিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষক দ্বারা সংজ্ঞায়িত ভিক্ষাবৃত্তিকে আইনগতভাবে পুনর্সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কে Criminal Procedure Code of India, যেখানে বিবৃত হয়েছে, - “A person who has no ostensible means of subsistence of who can not give a satisfactory account of himself is registered as a destitute, vagrant or a beggar.”[২৫]

সমাজতাত্ত্বিকদের বিবরণের পাশাপাশি স্বাধীনতার পূর্বে ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে ভিক্ষুক সমস্যার বিষয়টিকে পর্যালোচনা করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলির উদ্যোগে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণ করা হয়। এই আইনগুলিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে সেগুলি হল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন *The Hyderabad Prevention of Beggary Act (XX of 1940)* অনুযায়ী ভিক্ষুক শব্দের অর্থ হল, - “begging on roads or from door standing of loitering or entering into the premises of a dwelling house or a place of business or otherwise for the maintenance of himself or his dependents.”[২৬]

আবার বাংলায় ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞা হিসেবে *The Bengal Vagrancy Act (VII of 1943)*-তে বলা হয়েছে, - “A person asking for alms in any public place or remaining in any public place or wandering about in such a condition or manner as makes it likely that he exists by asking for alms.”[২৭]

অন্যদিকে মহীশূরে *The Mysore Prohibition of Beggary Act (XXXIII of 1944)* প্রণয়ন করে ভিক্ষুকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, - "A beggar is a person, living by soliciting alms in any public place. Anything given gratuitously to a beggar in the form of alms, it may be money, food (cooked or uncooked), grain, clothing or any other thing of value. Begging includes wandering from door to door, soliciting alms, exhibiting or exposing sores, wounds, bodily ailments or deformities, or making false pretenses of them for exciting pity for securing alms."[২৮]

তাছাড়া তামিলনাড়ু'র *The Tamil Nadu Prevention of Begging Act, 1945*-এ ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, - "(i) soliciting or receiving alms in a public place, whether under the pretence of singing, dancing, performing tricks or selling articles or otherwise; (ii) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (iii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of himself or of any other person or of an animal; (iv) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for such purposes as may be prescribed."[২৯]

পাশাপাশি বোম্বে প্রদেশেও *The Bombay Prevention of Beggary Act (XXIII of 1945)* প্রণয়ন করে ভিক্ষুকদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, - "A person without means of subsistence or wandering about or found in public place or allowing himself to be used as an exhibit for the purpose of begging is covered by the definition."[৩০]

অন্যদিকে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে ভিক্ষুক সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে ঔপনিবেশিক পর্বের ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইনগুলিকে অনুসরণ করে বিভিন্ন রাজ্যে

ভিক্ষাবৃত্তি রোধকল্পে আইন প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম বিহারের ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন *The Bihar Prevention of Beggary Act (I of 1952)* প্রণীত হয়। এতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে, - "(i) soliciting alms in a public place or in or about a temple, mosque or other place of public worship, whether or not under any pretence such as singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or selling articles; (ii) entering on any private premises for the purpose of soliciting alms; (iii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease whether of a human being or an animal; (iv) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place or in a temple, mosque or other place of public worship in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting alms; (v) allowing himself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting alms, but does not include soliciting money or food or gifts for a purpose authorised by any law or authorised in the prescribed manner by the District Magistrate or by the State Government: Provided that the State Government may, by general or special order, direct that 'begging" shall not include soliciting alms in or about any temple or mosque or any other place under such terms and conditions and on such occasions as may be specified in the order."[৩১]

অনুরূপভাবে, জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯৬০ সালে ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত *The Jammu and Kashmir Prevention of Beggary Act* প্রণীত হয়। উক্ত আইনে ভিক্ষুকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, - "(i) soliciting alms in a public place, or in or about a temple, mosque or other place of public worship, whether or not under any pretence ; (ii) entering on any private premises for the purpose of soliciting alms ; (iii) exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms, any sore,

wound, injury, deformity or disease whether of human being or an animal ; (iv) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place or in a temple, mosque or other place of public worship in such condition or manner as makes it like that the person doing so exists by soliciting alms ; (v) allowing himself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting alms, but does not include soliciting money or fee or gift for a purpose authorised by law or authorised in the prescribed manner by the District Magistrate."[৩২]

অন্যদিকে আসামে *Assam Prevention of Beggary Act, 1964* অনুযায়ী, ভিক্ষুকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, - "(a) soliciting or receiving alms in a public place by any person including children; (b) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (c) exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease of a human being; (d) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food (cooked or uncooked), grain, clothing, gift or any other thing of value for a purpose authorised by any law or authorised in the manner prescribed by the District Magistrate or by the State Government: Provided that the State Government may, by general or special order, direct that "begging" shall not include soliciting alms in or about any temple or mosque or any other place under such terms and conditions and on such occasion as may be specified in the order."[৩৩]

১৯৭১ সালে পাঞ্জাবে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে *The Punjab Prevention of Beggary Act*-এ ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, - "(a) soliciting or receiving alms in a public place, whether or not under any pretence such as singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles; (b) having no visible means of

subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (c) entering on any private premises for the purposes of soliciting or receiving alms; (d) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound injury, deformity or disease, whether of a human being or of an animal; or (e) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorised by any law, or authorised in the manner prescribed."[৩৪]

১৯৭১ সালে পাঞ্জাবের ভিক্ষাবৃত্তি আইন অনুসারে হরিয়ানাতেও *Haryana Prevention of Beggary Act*, -এ ভিক্ষুকদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, - "(i) soliciting or receiving alms in a public place whether or not under any pretence, such as singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or selling articles; (ii) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (iii) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (iv) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease whether of a human being or of an animal; or (v) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorised by any law, or authorised in the manner prescribed."[৩৫]

অনুরূপভাবে, গোয়া এবং দমন ও দিউতে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধকল্পে *The Goa, Daman and Diu Prevention of Begging Act, 1972*-তে ভিক্ষুকদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, - "(a) soliciting or receiving alms in a public place; (b) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (c) exposing or

exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease of a human being or of an animal; (d) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner, as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; or (e) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorised by any law, or authorised by the Government or by such officer as may be specified by it in this behalf, in such manner as may be prescribed."[৩৬]

এছাড়া মধ্যপ্রদেশে ভিক্ষুক সমস্যাকে কেন্দ্র করে *The Madhya Pradesh Bhiksha Vritti Nivaran Adhiniyam*, 1973 আইন তৈরি হয়। উক্ত আইনে ভিক্ষুকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, - "(i) soliciting or receiving alms in a public place or a private place or indulging in any activity in any place directed to induce other persons to give alms by appealing to their sense of charity; (ii) exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of a human being or animal; (iii) having no visible means of sustenance and, wandering about or remaining in any public place in such condition or manner, as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (iv) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include, soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorised by any law or authorised in the prescribed manner by the District Magistrate or by the State Government."[৩৭]

অন্যদিকে, ১৯৭৫ সালের উত্তর প্রদেশে *The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act*-এ ভিক্ষা শব্দের অর্থকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, "with its cognate

expressions and grammatical variations means soliciting or receiving alms in a public place, whether or not under any pretence such as singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or offering any article for sale, and includes— "(i) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (ii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of a human being or animal; (iii) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (iv) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorized by any law or authorized in the manner prescribed."[৩৮]

অনুরূপভাবে, কর্নাটকে *The Karnataka Prohibition of Beggary Act, 1975*-এ ভিক্ষুক শব্দের অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে, - 'beggar' means any person other than a child who,- "(a) solicits or receives alms in a public place whether or not under any pretence such as singing, dancing, fortune telling, performing tricks, or selling articles; (b) enters any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (c) exposes or exhibits with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease whether of a human being or of an animal; (d) having no visible means of subsistence, wanders about or remains in any public place in such condition or manner as makes it likely that he exists by soliciting or receiving alms; (e) allows himself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms: Provided that a person shall not be deemed to be a beggar if he,- (i) is a religious mendicant licensed by the Central Relief Committee to solicit alms in the prescribed manner ; (ii) in the performance of any religious vow or obligation as sanctioned by custom

or religion collects alms in a private or public place, without being a nuisance; or (iii) is permitted in writing by the Central Relief Committee to collect contributions in cash or kind from the public for any public institution, whether religious or secular or for the furtherance of any object for the good of the public; or (iv) is a student collecting alms for the prosecution of his studies."[৩৯]

একইভাবে তেলেঙ্গানা'র *The Telangana Prevention of Begging Act, 1977*-এ ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে, - "(i) soliciting or receiving alms for one's own subsistence or for the subsistence of his dependents and includes allowing a child in his care to solicit or receive alms; (ii) soliciting or receiving alms, whether or not under any pretence, such as singing, dancing, fortune telling, performing tricks or offering any article for sale; (iii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of a human being or of an animal; (iv) having no ostensible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (v) allowing one self or a child or an animal to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; (vi) entering on any private premises for the purposes of soliciting or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose, authorised by any law or authorised in the prescribed manner by the Government, or by the Commissioner of Police in the cities of Hyderabad and Secunderabad or by the District Collector elsewhere; and the word "beggar" shall be construed accordingly."[৪০]

১৯৭৯ সালে হিমাচল প্রদেশে ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন The Himachal Pradesh Prevention of Beggary Act, 1979–এ ভিক্ষুকের অর্থকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, - "(i) soliciting or receiving alms in. a public place, under any pretence; (ii) having

no visible means of subsistence and wandering about or remaining in public place in such condition or manner as, makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (iii) entering in any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (iv) exposing or exhibiting; with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of a human being or of an animal; or (v) allowing oneself to' be used as an exhibit or exhibiting someone else (e.g. a child or some article, animal, bird, snake, etc.) for the purpose of soli citing or receiving alms; but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorised by any law, or authorised in the manner prescribed; (c) "beggar" means a person who is found begging."[৪১]

স্বাধীনতার প্রায় পঁচিশ বছর পর সিকিম ভারতে অন্তর্ভুক্তি হলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন সিকিমেও প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যায়। অবশেষে ২০০৪ সালে *The Sikkim Prohibition of Beggary Act, 2004* প্রণীত হয়। এই আইনে ভিক্ষুকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, - "Any person other than a child who - "(i) solicits or receives alms in a public place, whether or not under any pretence such as singing, dancing, fortune-telling, performing or offering any article tor sale; (ii) enters on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (iii) exposes or exibits, with the object of obtaining or extorting alms, arty sore, wound, injury, deformity or disease whether of a human being or animal; (iv) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner, as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms; (v) allows oneself to be used as an exhibit for the purpose of. soliciting or receiving alms: Provided that a person shall not be deemed to be a beggar if he:- (i) is a religious mendicant licensed by the competent authority as may be

designated by the State Government to solicit alms in the prescribed manner; or (ii) in the performance of any religious vow or obligations as sanctioned by custom or religion collects alms in a private or public place, without being a nuisance; or (iii) is permitted in writing by the competent authority as may be designated by the State Government to collect contribution in cash or kind from the public for any public institution, whether religious or secular or for the furtherance of any object for the good of the public; or (iv) is a student collecting alms for the prosecution of his studies."[৪২]

অন্যদিকে কেরলে ২০১৪ সালে ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন আইন তৈরি করা হয়। কেরলে *The Kerala Prevention of Begging and Protection of Destitute Beggars Bill, 2014*-এ ভিক্ষুকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "A person who is found begging"; আর ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, - "(i) Soliciting or receiving alms in a public place or entering into any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms. where under any pretence; (ii) Exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of himself or of any other person or of an animal. (iii) Allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms, but does not include soliciting or receiving money or food (cooked or uncooked), grain, clothing, gift or any other thing of value for a purpose authorised by any law or authorised by the Government in the rule made under this act."[৪৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ভিক্ষুক শ্রেণির প্রকৃত অবস্থার পর্যালোচনা করা যায়, - (ক) ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ভিক্ষুক জনবহুল স্থান, মন্দির বা মসজিদ, বিভিন্ন ফুটপাত ও রাস্তা, হোটেল, বাস স্টপ বা বাজার ইত্যাদি স্থানে ভিক্ষা করেন। (খ) ভিক্ষুক শ্রেণি সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করার জন্য তারা বেশ কিছু পন্থার অবলম্বন করেন, যেমন, -

শারীরিক ক্ষত, ঘা, অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি দ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (গ) ভিক্ষুক শ্রেণি জীবিকার কোনো উপায় না পেয়ে এই ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করে থাকেন। অতএব, ভিক্ষাবৃত্তির ধারণার সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরন এবং ভিক্ষার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি কিছু ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে হলেও এর প্রকৃত সমস্যা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতার কারণে পরিলক্ষিত হয়।

২.৪. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির পর্যালোচনা:

ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে 'দরিদ্র আইন' (Poor Low) প্রবর্তনের পূর্বে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি দানের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এটি দাতব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'দারিদ্র্য আইন' বলবৎ করার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রের ধারণাটি মধ্যে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তিক শ্রেণির সংযোজন ঘটে।[৪৪] তাদের মধ্যে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের সংখ্যাও ছিল। এই ধারণাতে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে অপরাধ প্রবনতার একটি সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের অনেক জায়গাতে ভিক্ষাবৃত্তিকে মানুষের একটি 'অনভিপ্রেত আচরণ' (Undesirable Behaviour) হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, - দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকান শহরে ভিক্ষাবৃত্তিকে 'বিচ্যুত আচরণ' এবং জীবন ধারনের শেষ অবলম্বনের একটি উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাহীন একটি বৃত্তিকে বোঝায়, যা একজন ব্যক্তিকে একটি অধঃপতিত সামাজিক অবস্থানে নিয়ে যায়।[৪৫] ঔপনিবেশিক পর্বে 'গোল্ড কোস্ট কলোনি'র শহরে বেশিরভাগই প্রতিবন্ধী মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এই ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টিকে একটি ছোট অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।[৪৬]

আধুনিক ব্রিটেনে পথ ভিক্ষুকদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ রয়েছে এবং তাদের প্রায়ই সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হয়। ভিক্ষাবৃত্তিকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার অংশ হিসেবে গণ্য করা হলেও এর একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। যেমন, জামাইকা'র রাজধানী কিংস্টনে, যারা স্কোয়াটার বসতিতে বসবাস করে তাঁদের অধিকাংশই জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যতার কারণে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, এবং পতিতাবৃত্তি থেকে উদ্ধারকৃত স্ক্র্যাপ বিক্রি করার মতো 'অবৈধ' কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।[৪৭] আবার ইরানে দেখা যায় যে, দারিদ্র্যতার কারণে পরিবারের নারীরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ বিষয় সম্পর্কে ইরানের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে নারীদের জীবনযাপনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে; খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থার অভাবে তাদের দুর্দশা আরও বেড়ে গিয়েছিল।[৪৮] পশ্চিমি বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে ঐতিহাসিকভাবে ভবঘুরে আইন যে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে তা ভালোভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে নিষিদ্ধ হয়েছে। কারণ জনশৃঙ্খলা (Public Discipline) রক্ষার জন্য মানুষকে ভিক্ষা করার পরিবর্তে কাজ করতে প্ররোচিত করার হচ্ছে। বিংশ শতকের কল্যাণকামী রাষ্ট্রগুলি উন্নত দেশগুলি থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন সাহায্য পেয়ে এসেছে।[৪৯] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় আক্রমনাত্মক প্যানহ্যান্ডলিং[৫০] (Aggressive Panhandling) করে, অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে ভিক্ষা আদায়ের করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বর্তমান সমাজে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সমস্যা। বিশ্বের অনেক দেশেই দারিদ্রের হার কমিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের উদ্দেশ্যে ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রতিহত করার

জন্য আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক দেশের সরকার ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনি নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেছে। ১৯৯৯ সালে কানাডার অন্টারিও প্রদেশে আক্রমণাত্মক ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রতিহত করার জন্য 'সেফ স্ট্রীট অ্যাক্ট' প্রবর্তন করে।[৫১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা শহরে একটি অধ্যাদেশ (Ordinace) পাস হয় (ওরল্যান্ডো মিউনিসিপাল কোড সেকশন ৪৩.৮৬)। অধ্যাদেশটি অরল্যান্ডোর ডাউনটাউনের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে, সেই সঙ্গে যেকোনো ব্যাঙ্ক বা স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনের (এটিএম) ৫০ ফুট দূরত্বের মধ্যে প্যানহ্যান্ডেল করা (ভিক্ষা করা) নিষিদ্ধ হয় এবং নিদির্ষ্ট উদ্দেশ্যে (খাবার, ওষুধ) অর্থ দাবি করার জন্য মিথ্যা বা অসত্য বিবৃতি দেওয়া এবং ছদ্মবেশ ধারণ করা, একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়।[৫২]

যুক্তরাজ্যে ১৮২৪ সালের 'ভ্যাগারেন্সি অ্যাক্টের' (Vagrancy Act) অধীনে ভিক্ষা করা বেআইনি ঘোষিত হলেও এই আইনে সাজার ভার ছিল অত্যন্ত লঘু। ১৯৮৭ সাল থেকে ফিনল্যান্ডে ভিক্ষাবৃত্তি বেআইনি বলে ঘোষিত হয় এবং ১৮২৪ সালের আইনটির সাজার ভার অত্যন্ত গুরু করা হয়। ২০০৩ সালে, পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট স্থানীয় সরকারি নিয়মগুলিকে প্রতিস্থাপন করে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধমুক্ত করে। ১৯৯১ সালের আইনের ৬১ নং ধারা অনুযায়ী রোমানিয়াতে কর্মক্ষম ব্যক্তির ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।[৫৩]

২.৫. জাতীয় প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির পর্যালোচনা:

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের একাধিক অভিমত লক্ষ করা যায়, একইভাবে ভারতবর্ষে ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয় সম্পর্কে Macdonell ও Keith-

এর মতে, 'ভিক্ষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল 'অথর্ব বেদে'। কিন্তু 'ভিক্ষুক' শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী বৈদিকযুগে ধর্মীয় ভিক্ষুকগণ আশ্রম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেও ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না।[৫৪] এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় ধর্মীয় ভিক্ষুকদের কোনো প্রকার প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায় না। আর্যরা পরবর্তী সময়ে ভারতে এসে ছিলেন শাসক হিসাবে। তখন এদেশের আদি বাসিন্দারা দক্ষিণে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং এখানে যারা থেকে গিয়েছিল তারা দাসে পরিনত হয়েছিল। ভারতে আগত আর্যরা পূর্বের মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভিক্ষা বিমুখ ছিলেন। সম্ভবত ওই সময়ে জনসংখ্যার চাপ কম ছিল, তাই জীবিকারও অভাব হত না, এবং মানুষকে জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্য অন্যের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। স্বাভাবিক কারণে ভিক্ষাকে কেউ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেনি। অতএব বলা যায়, বৈদিক যুগে ভিক্ষাবৃত্তি ছিল তাৎপর্যহীন বিষয়।[৫৫]

ভারতের ইতিহাসে ভিক্ষুকদের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণ বর্তমান। মেহেরগড় সভ্যতা কিংবা হরপ্পা সভ্যতার অসমাপ্ত ইতিহাসের দরুন ভিক্ষুকদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগের সাহিত্যে, বিশেষত ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ অংশে বেশ কিছু ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৬] তৎকালীন সময়ের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার কঠোরতার দরুন ধর্মীয় ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সন্ন্যাস পর্বে জীবন অতিবাহিত করার উদ্দেশ্য ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করার বিষয়টির দিকে আলোকপাত করা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল। এই সকল ধর্মের মূল বিষয় ছিল ভিক্ষা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করা। ফলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। গুপ্তযুগ ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তিত

পরিস্থিতির কারণে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তবে এ বিষয়েও পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না।[৫৭]

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী সময় অর্থাৎ ৬০৬-৬৪৭ খ্রি. এদেশে অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ায়, আঞ্চলিক রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণে কিছু মানুষ গৃহহীন হয়ে ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৫৮]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণের মধ্যমে দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির সম্পর্ক ও দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নীতির আলোচনার মাধ্যমে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন।[৫৯] ছাত্র, সন্ন্যাসী এবং বানপ্রস্থে গমনকারী ব্যক্তিগণ মধুকরীর মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারতেন। উপনিষদে ভিক্ষার সময় ও স্থান সম্পর্কে কিছু নিয়ম শৃঙ্খলার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মনু' তাদেরকে জীবনযাপনের বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি দিক্‌নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা কোথায় যাবেন, মহিলাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলবেন ইত্যাদি বিষয়ে।[৬০]

ছাত্র ও সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তির অনুমতি থাকলেও কিছু নিয়ম পালন ছিল আবশ্যক। কারণ ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃত লক্ষ অন্যদের সমস্যায় জর্জরিত করা নয়, পরিবর্তে নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা। অন্যদিকে দান করা হল মানুষের পরম ধর্ম। আবার দান করার প্রসঙ্গটিও প্রশংসার যোগ্য এবং দান নেওয়ার বিষয়টিও ভক্তির সঙ্গে সংযুক্ত।[৬১]

মনুসংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের, ব্রাহ্মণদের দান সহ বিভিন্ন ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার কথাও বলা হয়েছে। মনু আরো বলেন যে, যদি বৈশ্য বা শূদ্র কাজের জন্য ব্রাহ্মণের কাছে যেত, ব্রাহ্মণরা তাদের কর্মে নিয়োগ করতে সাহায্য করত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন

ভারতে যদি কোনো সক্ষম মানুষ অন্যকে কাজের সুযোগ না দিত তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার সক্ষম ব্যক্তিকে যদি কাজ দিতে অস্বীকার করা হত, তাহলে তা ছিল অপরাধ। সবশেষে বলা যায়, বর্ণাশ্রম প্রথাই দারিদ্র্যতাকে নির্মূল করতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণি ও বর্ণ বিভেদের ক্ষেত্র লক্ষ করা যায়। যা আধুনিক সমাজের ন্যায় পরায়নতা, একতা ও একত্রীকরণের কথা বলে না।[৬২]

বর্ণাশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতে যৌথ পরিবারও দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। এই পরিবারগুলি একতা ও বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছিল। বাড়ির বড়ো সদস্যের হাতে সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থাকত এবং তাদেরকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশুনো করতে হতো। পরিবারে পিতা কিংবা বয়স্ক সদস্যের মৃত্যুতে বড়ো ছেলেকে পরিবারের ভার নিতে হত। এই পরিবারে একতা ও যৌথতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই পরিবারের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করা হত এবং পরিবারের সমস্ত সদস্যদের তা দেওয়া হত। বর্তমান সময়ে একজন মানুষ সম্পদশালী হলেও তার ভাইরা ভিক্ষুকও হতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় যে, ছেলেরা ধনী কিন্তু পিতা ভিক্ষা করছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের যৌথ পরিবারের কোনো অন্ধ বা শারীরিক প্রতিবন্ধী সদস্যরাও পরিবারের বাকি সদস্যদের মতো সমান অংশের দাবীদার হতে পারতেন, তাদেরকে ভিক্ষা করতে হত না। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র ও এই বিষয়ে জোর দিত। কৌটিল্য লিখেছেন, "কোনো সক্ষম ব্যক্তি তার ছেলে, বউ, মা, বাবা, ছোট ভাই, বোন, অথবা বিধবা মেয়েকে ভরণ-পোষন না করলে তাকে বারো-আনা জরিমানা আদায় করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র এইভাবে যৌথ পরিবারগুলির অসহায় সদস্যদের ভালো-মন্দের দায়িত্ব নিত"।[৬৩] আর এভাবেই রাষ্ট্র পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করত, যাতে

ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা না দেখা দেয়। তাই বলা যায়, প্রাচীন ভারতে পরিবার প্রথার একতা ও অবিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেওয়া হত।

যৌথ পরিবারের গুণাগুণগুলি ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছিল। যৌথ পরিবার এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিল যে, যদি পরিবার তার সদস্যদের প্রতি যত্নবান হয়, তাহলে খাদ্য সংকটজনিত কারণে পরিবারের সদস্যদের আর ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে না। তৎকালীন সময়ে পরিবারকে ত্রাণ কেন্দ্র হিসাবে দেখা হত। কিন্তু যৌথ পরিবারে যথেষ্ট সম্পদ থাকতে হত এবং সমস্ত সদস্যকে কর্মঠ হতে হত। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে যৌথ পরিবারের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়।[৬৪]

পূর্বে বর্ণাশ্রম ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি স্থানীয়করণের জন্য যে বিষয়গুলি কাজ করত তা নিরূপন করা হয়েছে। এই বিষয়টি মূলত শারীরিক, তথাপি ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রভাব ছিল। প্রাচীন কালে রাস্তাঘাট না থাকার জন্য মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে যেতে পারত না। এক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।[৬৫] কিন্তু বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উন্নতিতে এই সকল সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় না। ফলে অসহায় মানুষজন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু প্রাচীন ভারতে তা সম্ভব হত না। কারণ একজন অন্ধ বা শারীরিক প্রতিবন্ধী অন্য স্থানে ভিক্ষা করা সম্ভব ছিল না। যদিও সে জানত নতুন জায়গায় গমন করলে সে ভালোভাবে থাকতে পারবে। তাছাড়া সে যদি নতুন কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারত, তাহলে তার সঙ্গে সেই এলাকার স্থানীয় লোকজনের পরিচিতিও ঘটত এবং সেই সুবাদে তার দারিদ্র্যতা দূরীকরণের উপায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে

স্থানীয়করণ সম্ভব হত। যদিও এই বিষয়টি ভিক্ষুকদের অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগণিত হয়।[৬৬] বর্তমানে উন্নত যানবাহনের সুবিধার্থে শহরগুলিতে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ত্রাণ পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে দারিদ্র্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা অনেকটাই কার্যকরী হলেও তার ব্যপকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ফলে অসংখ্য মানুষ অসহায় ছিল। তারা সমাজের সহযোগীতার অভাবে ক্ষুধার্ত জীবন-যাপন করত। তাদের এই ত্রানের ধরন কেমন ছিল এই প্রশ্নটাই আমাদের দারিদ্র্য দূরীকরনে আবশ্যিক পদ্ধতির কথা বলে।

প্রাচীন ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরনের জন্য কোনোরকম বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র থেকে ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এগুলি মানুষের দয়া, মায়া, বা সমবেদনা থেকে আসত। এই সকল শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের সাহায্য করা ছিল বিভিন্ন ধর্মের আদর্শ। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিগত দানের কোনো অভাব ছিল না। তৎকালীন সময়ে ‘বেলা ভিক্ষা’ অর্থাৎ কোনো ভিক্ষুক সকাল বেলা, অথবা দুপুর বেলা, কিংবা সন্ধ্যা বেলা ভিক্ষা করতে এলে, তাদেরকে ফিরিয়ে না দিয়ে খাদ্যশস্য, রান্না-খাবার, পুরোনো জামা-কাপড় ইত্যাদি দান করার রীতি প্রচলিত ছিল।[৬৭] এখনও আমাদের সমাজে এই দানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিকাল বেলা বা সন্ধ্যায় রান্না খাবার দেওয়া হয়। এটাই ছিল গৃহস্থের পক্ষে সবচেয়ে ভালো দান, যা তাদের মানবিক গুণের পরিচায়ক। এটি এমনই এক অভ্যাস যা বর্তমানেও চলে আসছে। এই দানগুলি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সময় বেশি লক্ষ করা যায়। কোনো ধনী মানুষ তাঁর পুত্র বা কন্যার বিবাহের কারণে গরিবদের খাওয়ানো বা বস্ত্র বিতরণ করতেন। এই প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত। কারণ, সাধারণত অনুষ্ঠানের সময় মানুষের আবেগ-অনুভূতি খুব ভালো থাকে, যা দান-ধ্যানের প্রবনতাকে বাড়িয়ে তুলতো।[৬৮]

প্রাচীন ভারতের ধনী পরিবারগুলি অনেক মানুষের সেবা করতে নিজ গৃহে অথবা মন্দির প্রাঙ্গনে। এই প্রথাটিই ‘Sadavastas’[৬৯] নামে পরিচিত। এর মূল কথা হল যিনি ভালোভাবে আছেন তার উচিৎ যে সমস্ত মানুষ অনাহারে আছে তাদের সেবা সাহায্য করা। এটা বলা হত যে যিনি পূর্বজন্মে দান করেছিলেন তিনি বর্তমান জীবনে ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে পারবেন এবং বর্তমান জন্মে দান করলে আগামী জীবনেও সুখী হবেন। যারা সম্পদ ব্যয় করে তাদের সম্পদ আসবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এ কথা মান্য যে, হিন্দুদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দানকার্যে ব্যবহার করলে পুণ্যার্জন হবে। অনুরূপভাবে, মুসলিম সমাজেও আয়ের চল্লিশ ভাগের একভাগ দান করার কথা বলা হয়েছে। আবার বিশেষ বিশেষ মাসে, যেমন শ্রাবণ (হিন্দুদের) ও রমজান মাসে (মুসলিমদের) দান করার রীতি রয়েছে।[৭০]

অন্যদিকে ধনীব্যক্তি জমিদার এবং রাজারা পরিচালনায় গরীবদের খাওয়ানোর জন্য ধর্মশালা নির্মাণ করা হত। ধর্মশালাগুলিতে খাওয়া এবং প্রয়োজনে রাতে থাকার ব্যবস্থাও করা হত। কোনো কোনো ধর্মশালা আবার মন্দির সংলগ্ন স্থানেও দেখা যেত। মুসলিম পরিচালিত ধর্মশালাগুলি *জামাতখানা, লঙ্গরখানা* এবং *মুসাফির খানা* নামে পরিচিত ছিল।[৭১] মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে তীর্থযাত্রীদের জন্য রাস্তায় থাকা খাওয়ার জন্য এইরকম ধর্মশালার প্রচলন ছিল। যদিও এই সকল বিষয় সম্পর্কে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়েও এই ধরনের কিছু ধর্মশালা রয়েছে যা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়।[৭২]

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র দ্বারা খরা বা দুর্ভিক্ষের সময় অসহায় মানুষের সাহায্য দেওয়া হত। চতুর্দশ শতকে বাহমনী রাজারা এই সকল ভোজনালয়গুলি পরিচালনা করত। কৌটিল্যের মতানুসারে দুর্ভিক্ষের সময় রাজারা তাদের কোষাগার থেকে অথবা ধনীদের তহবিল থেকে দান করত। প্রয়োজনে প্রতিবেশী রাজার কাছ থেকেও সাহায্য গ্রহণ করতেন। পাশাপাশি

প্রাচীন ভারতে অনেক রাজারা ভূমিদান করতেন। মনু বলেছেন যে, রাজার উচিত পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দান করে সন্তুষ্ট করা, অথবা যারা রোগাক্রান্ত, প্রবীন ও শিশু, তাদেরকে সাহায্য করা। কৌটিল্য বলেছেন, রাজা "অনাথ, বয়স্ক, রোগাক্রান্ত এবং অসহায় মহিলা ও শিশুদের সাহায্য করবে"।[৭৩] অশোকের সময়েও এই ধরনের সেবামূলক কার্যাবলী লক্ষ করা যায়। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন উল্লেখ করেছেন, মগধে অনেকগুলি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হত।[৭৪]

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র অসহায়দের ত্রাণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেকারত্বও মেটাতো। কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন Working House বা কর্মগৃহের কথা। যদিও তিনি এ সম্পর্কে বিশদ কিছু বলেননি।[৭৫] শুধু এর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, অসহায় মানুষদেরকে কর্মে নিযুক্ত করা হত, এমনকি মহিলাদেরও কাজে নিযুক্ত করা হত। কৌটিল্য আরও বলেন, যে অসহায় মহিলা, দরিদ্র বৃদ্ধ কর্মচারী ও গণিকাবৃত্তির সঙ্গে যুক্তদের সুতো বা পশম কাতার কাজে লাগানো হত।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্র সক্ষম মানুষদেরকে কৃষিকাজ ও শিল্পে নিয়োগ করত। রাজারা তাদের জমিতে কর্মচারী হিসাবে দাস, দাসী ও জেলবন্দীদের নিয়োগ করতেন। তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্র অনাথদের ও দৈহিক বিকৃত অসহায় তপস্বীদের গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ করত এবং তাদের পোষাক ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও রাষ্ট্র কর্তৃক করে দেওয়া হত। যা পক্ষান্তরে জনকল্যাণকর দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। শ্যামশাস্ত্রী বলেন যে, বর্তমানে বৈরাগী হল প্রাচীন তপস্বী গুপ্তচরের আধুনিক রূপ।[৭৬] যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র আর তাদের প্রয়োজনে গুপ্তচর হিসেবে

খুব একটা ব্যবহার করে না। ফলত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি ও জ্যোতিষী পেশার সঙ্গে যুক্ত।

এই বিষয় থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রাচীন ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণকে অবহেলা করা হত না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বর্ণাশ্রমের দারিদ্র্য নিবারণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। যৌথ পরিবারগুলি সামাজিক কল্যাণের কেন্দ্র রূপে কাজ করত। প্রাচীন ভারতে দারিদ্র্য সমস্যা স্থানীয়করণ হয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ চলত। নাগরিকরা তাদের অঞ্চলের ভিক্ষুকদের চিনতেন এবং ভিক্ষুকরাও সাহায্যকারীদের জানতেন। তাই তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী হত। আবার প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রও গরীব অসহায়দের কল্যাণে আগ্রহী ছিল।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সমস্যা ভারতের প্রগতিকে নানাভাবে ব্যাহত করছে। জাতপাত, অভিবাসন উদ্বাস্তু ও সন্ত্রাসবাদজনিত সমস্যায় ভারতের উন্নয়ন প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এগুলি সমাজতাত্বিকদের, তথা সাধারণ জনসাধারণের কাছে খুবই চর্চিত বিষয়। তবে এই সমস্যাগুলির বাইরেও কিছু আন্তঃদেশীয় সমস্যা আছে, সেগুলিও দেশের প্রগতিতে বাধা দান করে। ভিক্ষুক সমস্যা হল এমনই এক সমস্যা যা ভারতের প্রগতিকে নানাভাবে ক্ষুন্ন করছে। তবে এ সমস্যা আজকের নয়। এর শুরু মূলত বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে।[৭৭] যা ক্রমশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ঔপনিবেশিক শাসকরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ১৮৭৪ সালে ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতে ইউরোপের আদলে ভবঘুরে আইন প্রণয়ন করেন। আর পরবর্তীকালে এই আইনটিই সংশোধিত হয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে প্রণীত হয় ভিক্ষুক সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে।

২.৫.১. ভারতের প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আইন:

ভারতের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে প্রায় ১.২১ কোটি মানুষের বসবাস। তার মধ্যে প্রায় চোদ্দো লক্ষ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করে চলে।[৭৮] ভারতে এই পেশা ধর্মের মোড়কে আবদ্ধ। এখন প্রশ্ন হল, ধর্ম কি ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মীয় পেশার অন্তর্গত করে? সাধারণভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, ভিক্ষাবৃত্তি ও খয়রাত ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ। তবে বিংশ শতাব্দীতে কর্পোরেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'ভিক্ষাবৃত্তি'র পেশাকে তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভারতে এই পেশা 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ' লাভের উপায়রূপে পরিগণিত।[৭৯] পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ১৯১৯ সালে বোম্বে সরকার 'পেশাগত ভিক্ষাবৃত্তি'র প্রসঙ্গে হিন্দু ও জৈন ধর্ম থেকে চোদ্দো জন এবং মুসলিমদের মধ্যে থেকে তেইশ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি নির্মাণ করেন। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, জরাথ্রুষ্টপন্থী থেকে শুরু করে জৈন ধর্মাবলম্বী, বল্লভাচার্য ও স্বামী নারায়ণের বৈষ্ণব গোষ্ঠী ও উঁচু পর্যায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যেও পেশাগত ভিক্ষুকের কোনো বিবরণ নেই। ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশারূপে তারাই পরিগণিত করেছে, যারা মূলত 'বাবা', 'বৈরাগী', বা 'নাগা' হিসেবে পরিচিত, আর যাদের তথাকথিত কোনো ধর্মীয় শিক্ষা নেই। এমনকি হিন্দুধর্মের মধ্যেও 'পেশাগত ভিক্ষুকে'র তক্‌মাটি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা জাগতিক বা সাংসারিক ধারণার ঊর্দ্ধে। ইসলামে পেশাগত ভিক্ষুকেরা অনুমোদন লাভ করলেও, তারাও ভিক্ষাবৃত্তির প্রসারতার বিষয়ে চিন্তাশীল। অতএব, কমিটির রিপোর্ট থেকে এটা অনুমান করা যায়, কোনোও আধুনিক দেশের প্রতিচ্ছবিতে 'ভিক্ষাবৃত্তি' তার ধারক হতে পারে না।[৮০]

মহীশূরের সরকার ভিক্ষাবৃত্তির অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যে কমিশন গঠন করে, তাতে সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটি উঠে আসে যে, 'ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি কী ধর্মীয় মদতপুষ্ট?'

কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানা যায়, হিন্দু আইনে যেমন শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদেরই এই পেশা গ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়। সেরকম আবার ইসলামেও ফরিকদেরকেই এই পেশা গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া কোনো ধর্মই ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দেয় না। অতএব, ধর্মীয় অনুমোদন ছাড়া যেসব ভিক্ষুকরা মুক্তভাবে এই পেশাকে গ্রহণ করছে, তাদেরকে কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পরাশ্রয়ী হিসেবে গণ্য করা হয়।[৮১] ১৯১৫ সালে বোম্বে কর্পোরেশন সর্বপ্রথম এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেও, কলকাতাতে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে ১৯১৮ সালে। ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধীয় সেরকম আইন নেই। তথাপি বর্তমান আইন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে এই বিষয়ের অন্যান্য অবশিষ্ট আইনগুলির আলোচনা করা প্রয়োজনীয়।[৮২] ঔপনিবেশিক সময়ে ভিক্ষুকদের বিপক্ষে ১০৯ নং ধারায় Criminal Procedure Code চালু করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে এই পেশার সঙ্গে নিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের পরিচয় গোপন করে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে তা সরাসরি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। এসম্পর্কে বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তির যদি নিজস্ব কোনো পরিচয় না থাকে বা পরিচয় গোপন করে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলেও তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। তৎকালীন সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অবধি 'খারাপ ব্যক্তিত্বে'র মানুষদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে যুক্ত করা হয়। তবে এর সঙ্গে কোনোভাবেই ভিক্ষুকদের তুলনা করা সম্ভব নয়।[৮৩] বি. বি. মিত্র তাঁর 'Code of Criminal Procedure' নামক সংস্করণে দেখান যে, ভারতের মতো দেশে যেখানে বেশিরভাগ মানুষই বেকারত্বের অন্ধকারে আবদ্ধ, সেখানে কোনো ব্যক্তি যদি জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তা কোনোভাবেই অপরাধের আওতায় পড়ে না।[৮৪] ভিক্ষাবৃত্তি যেহেতু পেশার

অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই সেই ব্যক্তি তার আয়ের অংশ সরকারকেও দিতে বাধ্য নয়। সে কারণে তাদের কাছে এই পেশা অপরাধমূলক।

এখানে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন আইনের বিশ্লেষণ করা হল, -

২.৫.২. ইউরোপীয় ভবঘুরে আইন:

১৮৭৪ সালে The European Vagrancy Act সম্পূর্ণ ভারতে প্রচলিত হলেও তার সুবিধা পেয়েছিল কেবলমাত্র ইউরোপীয় ভিক্ষুকরা। উক্ত আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতরা, যারা ভারতে জীবিকার সন্ধানে অসমর্থ, তারাই এই আইনের অন্তর্গত ছিল। আবার ২৩ নং ধারা অনুযায়ী বলা হয় যে, কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই পেশা অবলম্বন করে, তাহলে এই আইন অনুযায়ী তাকে অন্তত একমাস, অথবা অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তিনমাস কারাবাসে থাকতে হতে পারে।[৮৫] কিন্তু এইসব 'ভবঘুরে'দের হয় কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হত, অথবা ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হত, - যা এই ধারার বিপরীত। তবে এই আইনের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত: এখানে কিশোর বা অল্পবয়সী ভবঘুরেদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। অতএব, তাদেরকেও প্রাপ্তবয়স্কদের মতো একই বিচারের অন্তর্গত করা হয়। দ্বিতীয়ত: এই আইনে দুঃস্থ, রোগগ্রস্ত, অথবা অক্ষম পুরুষ ও নারীদের ক্ষেত্রেও কোনো আলাদা ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। আর পুলিশ কর্তৃক যদি কোনো ভবঘুরে ধরা পড়ত তাদেরকে সরকারি কর্মশালায় রেখে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যদি ব্যবস্থা করা সম্ভব না হত তাহলে তাকে দেশান্তর করা হত।

২.৫.৩. কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত আইন:

ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৯৮ খ্রী ‘Lepers Act’ চালু করা হয়।[৮৬] এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারকে সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রদেশের সরকার নিজ অঞ্চলকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করতে অসমর্থ হয়। এখানে ‘কাঙ্গাল কুষ্ঠরোগী’দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আর বলা হয় যে, এই ভবঘুরেদের দেখামাত্র গ্রেপ্তার করা হবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কুষ্ঠরোগীদের আবাসস্থলে তাদের রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এই আইনের ৯ নং ধারায় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়। এমনকি ৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক স্থানীয় সরকারকেও নির্দিষ্ট অঞ্চলের কুষ্ঠরোগী নিয়োগের কথা বলা হয়। এই আইনের ৩ নং ধারায় আরও কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়। যেমন, (ক) কুষ্ঠরোগীদের বস্ত্র, খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজেদেরকেই করতে হবে। (খ) কোনো পৌর বা স্থানীয় পাতকুয়া বা ট্যাঙ্কে কুষ্ঠরোগীদের ব্যবহার করার পরই পরিত্যক্ত করতে হবে। (গ) কেবলমাত্র রেল পরিবহণ ব্যতীত অন্য পরিবহণের খরচ তাদের নিজেদেরই বহন করতে হবে। (ঘ) তাঁরা কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে না। এই আইন লঙ্ঘন করলে তাকে ২০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আর কুষ্ঠরোগীদের যদি কেউ কাজে বহাল করেন তাহলে তাদেরকেও ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অতএব, বলা যায় এই আইন তাদের অবস্থাকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে।[৮৭]

২.৫.৪. সি. পি পৌরসভা সংক্রান্ত আইন:

‘Central Provinces and Berar Municipalities Act’ দ্বারা ভিক্ষুকদের কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২২ সালে এই আইন চালু হয়। এই আইনের ২০৬ নং ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি জোর করে ভিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে তাকে ২০ টাকা জরিমানা

দিতে হবে। অতএব, এই আইনে ভিক্ষুকদের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না, তবে এই আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ এই আইনে 'জোরপূর্বক ভিক্ষাগ্রহণে'র উপায় সম্পর্কে কোনো কিছু নিদের্শনার কথা উল্লেখ নেই। সি. পি. গভর্মেন্ট এই বিলটিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দেয়। এছাড়া ভিক্ষুকদের শাস্তিস্বরূপ গরিবালয়ে পাঠানোর কথা বলা হয়। পাশাপাশি যারা এই পেশাকে সমর্থন করে ও শিশুদের এই পেশায় নিয়োগ করেন, তাদের শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে আইনটিতে 'জোরপূর্বক ভিক্ষাগ্রহণে'র বিষয়টিকেও উহ্য রাখা হয়।[৮৮]

২.৫.৫. পাঞ্জাব পৌর আইন:

১৯১১ সালে 'Punjab Municipal Act' চালু করা হয়। এই আইনের ১৫১ নং ধারা অনুযায়ী বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো পরিস্থিতিতে রাস্তায় বা সাধারণের জন্য ব্যবহৃত জায়গায় ভিক্ষা করে ও কোনো রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও যদি ভিক্ষা করতে দেখা গেলে তাকে উপরিউক্ত ধারা অনুযায়ী অন্তত তিনমাসের কারাবাস অথবা ৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে। এই আইনে উল্লেখ করা যায়, কোনো ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে প্রথম উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপর সে আবার এই কার্যে ধরা পড়লে তাকে মিউনিসিপ্যালিটির সার্টিফিকেট দ্বারা চিহ্নিত গরিবালয়ে পাঠানো হবে।[৮৯] আর সেই ব্যক্তি যদি তৃতীয়বার এই একই 'অপরাধে' ধরা পড়ে তাহলে তাকে ১৮৯৮ সালে 'কোড অব্ ক্রিমিনাল প্রসেডিউয়ার আইন' অনুযায়ী সংশোধনাগারে পাঠানো হবে। তবে ১৫১ নং ধারায় অনুসারে আরও বলা হয়, সেই ব্যক্তিকে বিচারালয় কর্তৃক সরাসরি গরিবালয়ে পাঠানো হবে না। কিন্তু কোনো Poor House যদি নিজে থেকে তার দায়িত্ব নেয় তাহলে তাকে তিন বছরের জন্য রেখে দেওয়া হবে। পরে তার আচার ব্যবহার দেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।[৯০]

২.৫.৬. বোম্বে সিটি পুলিশ অ্যাক্ট:

'Bombay City Police Act, ১৮৬১'-এর ১২১ নং ও ৬৪ নং ধারা, এবং ব্যাঙ্গালোর মিউনিসিপ্যাল আইনের ২১ নং ও ১৩A নং ধারা অনুযায়ী বলা হয় যে, যে সব ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে কেবলমাত্র তাকে নয়, যারা এই পেশাকে সমর্থন করে এবং ছোট ছোট শিশুদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে অন্যায়ভাবে কাজ করতে বাধ্য করে তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে। এই আইনও অনুযায়ী ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।[৯১] তবে সম্পূর্ণ আইন ছাড়া ভারতে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।

২.৫.৭. মাদ্রাস সিটি পুলিশ অ্যাক্ট:

মাদ্রাস সরকার ১৮৮৮ সালের ১৩ই মে 'Madras City Police Act' চালু করেন। এই আইন অনুযায়ী পুলিশ কোনো ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখলেই তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করবে। বিচারে তাকে ৫০ টাকা জরিমানাসহ একমাসের জন্য জেলে পাঠানো হবে, অথবা কোনো সরকারি কার্যালয় থাকলে তাকে সেখানে ৩ বছররের জন্য নিয়োগ করা হবে। এই ব্যক্তিটির যদি ১৬ বছররের নীচে হয় তাহলে তাকে Juvenile Court এর অন্তর্গত করা হবে। এই আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র তাদেরকেই কার্যালয়ে পাঠানো হবে যারা শারীরিক দিক থেকে সমর্থ, আর যারা অসমর্থ 'বিশেষ স্থানে' রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[৯২] ১৯২০ সালে মাদ্রাস শিশু আইন চালু হয়। এই আইনে ৭১-A নং ধারায় ১৪ এবং ১৬ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, কোনো শিশু যদি বাস্তুহীন, পরিবারহীন হয়ও সে যদি অবৈধ সন্তান হয় অথবা তার অভিভাবক যদি কোনো অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে সেই শিশুটিকে ওয়ার্ক হাউস বা স্পেশাল হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।[৯৩]

২.৫.৮. উত্তর প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট:

১৯১৬ সালে ‘U. P. Municipalities Act’ এই আইনের ২৪৮ নং ধারা অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই পেশার সঙ্গে নিযুক্ত তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৯৪] এছাড়া উত্তর প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৪২ সালের ১১ ই এপ্রিলের গ্যাজেট অনুযায়ী বলা হয় স্বেচ্ছায় নিযুক্ত ভিক্ষুকদের অন্তত একমাসের জন্য জেলে ও তার সঙ্গে ৫০ টাকা জরিমানা নেওয়া হবে। এছাড়া তাকে গরিবালয়ে পাঠাতে হবে। এই আইনের ৪ নং ধারায় গরিবদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন, (ক) যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, (খ) যারা বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত, (গ) নাবালক ভিক্ষুক, (ঘ) যেসব ব্যক্তি শারীরিকভাবে সমর্থ।[৯৫] এই আইনে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য চালু করা হয়। এই আইনের গুরুত্বপূর্ণতা হল এখানে ভিক্ষুকদের উন্নতি প্রদানের উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ, পৌর প্রধান এবং গরিবালয়ের সচিব একসঙ্গে একটি বোর্ড গঠন করেন। সেখানে বলা হয়, - ভিক্ষুকদের কর্মের উপযোগী গড়ে তোলা হবে। ১৮৯১ সালে বেলজিয়ামেও এই আইন চালু করা হয়েছিল। যাই হোক, লক্ষ্ণৌতে এই আইন এখনো প্রচলিত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এদেরকে অন্তত ছ’মাসের কারাবাস দেওয়া হবে। আর চল্লিশ বছরের ঊর্দ্ধে যারা, তাদেরকে গরিবালয়ে পাঠানো হবে। ‘ইউ. পি. মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট’ বর্তমানে লক্ষ্ণৌতে প্রযোজ্য। এখনও অবধি চল্লিশ বছরের নীচে কোনো ব্যক্তিকেই কারাবাস বা জরিমানার আওতায় ফেলা হয়নি। তবে চল্লিশ বছরের ঊর্দ্ধে ভিক্ষুকদের ছয় মাসের জেল এবং এক বছরের জন্য গরিবালয়ে রাখার বিষয়টি লক্ষ্ণৌর সোশ্যাল সার্ভিস লিগ ও লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।[৯৬] আর লক্ষ্ণৌর যে সব শহরে গরিবালয় নেই, সেখানে ভিক্ষুকদের সরাসরি জেলে পাঠানো হয়। তবে পূর্বের অন্যান্য আইনগুলোর মতো এই আইনের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল

'Importunate Beggar' (যারা জোর করে ভিক্ষা গ্রহণ করে), তাদের প্রসঙ্গটি। কারণ কোনো ব্যক্তি বাধ্য হয়ে এই পেশা অবলম্বন করছে, না জোর করে কোনো কাজ না করার উদ্দেশ্যে এই পেশা গ্রহণ করছে, তা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। লক্ষ্ণৌর ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য অনুযায়ী, যেসব শারীরিক অসুবিধার কারণ ছাড়া এই পেশা অবলম্বন করবে তাদের আইন অনুযায়ী, গ্রেপ্তার করে ছয় থেকে আঠারো মাস অবধি গরিবালয়ে রাখা হবে।[৯৭]

২.৫.৯. সিন্ধ ভ্যাগারেন্সি বিল:

১৯৩৯ সালের ১২ই এপ্রিল পি. এ. ভোপাতকার (P. A. Bhopatkar) সিন্ধ প্রদেশে 'Sind Vagrancy Bill' চালু করেন। এই বিল অনুযায়ী যেসব ব্যক্তি শারীরিকভাবে সক্ষম, তারা এই পেশার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে না। আর কেউ যদি এই আইনের উলজ্ঘন করে তাহলে তাকে অন্তত একমাস থেকে এক বছরের জন্য জেলে পাঠানো হবে। তবে সেই ব্যক্তি যদি কোর্টের কাছে আপিল করে সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাজ খুঁজে নেবে, তাহলে তাকে সময় দেওয়া হয়।[৯৮] তবে এই বিলের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, এই বিলের মধ্যে ভিক্ষুকদেরকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, এখানে পূর্বের আইনগুলোর মতো সরকারি কার্যালয়ের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয় নি।[৯৯]

২.৫.১০. কোচিন ভ্যাগারেন্সি বিল:

কোচি'তে 'Cochin Vagrancy Bill' দ্বারা ভিক্ষুকদের সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।[১০০] এই বিলের ৩ নং ধারা অনুযায়ী, অনুমতিহীন হকার, জুয়াড়ি, পলাতক, জ্যোতিষ, বারবনিতা, প্রায় সবাইকেই এই পেশার আওতায় ফেলে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়াও ভিক্ষুকদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়।[১০১] এরপর ১৮ নং ধারায় বলা হয়, কোনো ব্যক্তি সক্ষম থাকা সত্ত্বেও জীবন নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা

হবে। এরপর কোনো ব্যক্তি যদি কোচিনের অধিবাসী না হওয়া সত্ত্বেও এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হন তাহলেও তাকে অন্তত ছয় মাসের জন্য সংশোধনাগারে পাঠানো হবে।[১০২] তবে এই বিলের সীমাবদ্ধতা হল এখানে শাস্তির ব্যাখ্যা ঠিকভাবে করা হয়নি।

২.৫.১১. রেলওয়ে বিল:

ভারতীয় রেলের অধীনস্ত অঞ্চলের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে ১৯৪১ সালে 'The Railway Act'-এর প্রণয়ন করে। ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য রেলের আইনটি কেবলমাত্র রেল ও রেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১০৩]

২.৫.১২. মহীশুর ভিক্ষুক নিয়ন্ত্রক বিল:

'Mysore Draft Bill for the Prohibition of Beggary'[১০৪] সেন্টার রিলিফ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়, যে কমিটির মাধ্যমে ভিক্ষুকদের সংশোধন করা হবে। এছাড়াও ভিক্ষুকদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে তাকে পুর্নবাসনের কথা বলা হয়। এছাড়াও এই কমিটিতে ধার্মিক ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে আইনে কোনো সরকারী কার্যালয় বা ওয়ার্ক হাউসের কথা বলা হয় নি। তার পরিবর্তে অক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য 'সিক ওয়ার্ড' বা সংশোধনাগার নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও যে সব নারীরা বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্য আলাদাভাবে পরিত্রাণ গৃহ বানানোর কথা বলা হয়। শিশুদের জন্যও পৃথকভাবে ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে বলা হয়, - (ক) বারো বছরের নীচে কোনো শিশু যদি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে তাকে সর্বপ্রথম সংশোধনাগারে পাঠানো হবে। (খ) তবে সেই শিশুটির যদি অভিভাবক থাকে তাহলে তাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। (গ) কিন্তু তার যদি অভিভাবক না থাকে তাহলে তাকে তার যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে।[১০৫]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিক্ষুক সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন তৈরি হয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে বিভিন্ন আইন ও বিল থাকলেও কেন্দ্রীয় স্তরে কোনো রকম আইন ছিল না। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য যে সকল আইন তৈরি করা হয়, সেগুলি ছিল ঔপনিবেশিক আইন অনুসারে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, স্বাধীন ভারতে ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানকল্পে জাতীয় স্তরে কোনো আইন তৈরি করা হয় নি। বর্তমানে ভারতের ২২ টি রাজ্য ও ২ টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে আইন রয়েছে।[১০৬] তথাপি ভারতের ভিক্ষুক সমস্যার বিষয়টি আজও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কারণ ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্তরে যথাযথ আইন নেই। সারণি-১.১-এ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে যে আইন রয়েছে, সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি – ২.১: ভারতের ২২ টি রাজ্যে ও ২ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে আইন সমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	ভিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আইন
১	অন্ধ্র প্রদেশ	The Andhra Pradesh Prevention of Begging Act, 1977.
২	অসম	The Assam Prevention of Begging Act, 1964.
৩	বিহার	The Bihar Prevention of Begging Act, 1951.
৪	ছত্তিসগড়	The Madhya Pradesh Bhikshavirty Nivaran Adhiniyam, 1973 গ্রহণ করেছে।
৫	দিল্লি	The Bombay Prevention of Begging Act, 1959.
৬	গোয়া	The Goa, Daman & Diu Prevention of Begging Act, 1972.
৭	গুজরাত	The Bombay Prevention of Begging Act, 1959 গ্রহণ করেছে।
৮	হরিয়ানা	The Haryana Prevention of Begging Act, 1971.
৯	হিমাচল প্রদেশ	The Himachal Pradesh Prevention of Begging Act, 1971.
১০	জম্মু ও কাশ্মীর	The Jammu and Kashmir Prevention of Begging Act, 1960.

১১	ঝাড়খণ্ড	The Bihar Prevention of Begging Act, 1951 গ্রহণ করে।
১২	কর্ণাটক	The Karnataka Prevention of Begging Act, 1975.
১৩	কেরল	ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলে The Madras Prevention of Begging Act, 1945; The Travancore Prevention of Begging Act, 1945 এবং The Cochin Vagrancy Act, 1120 লাগু করা হয়েছে।
১৪	মধ্যপ্রদেশ	Madhya Pradesh Bhikshavirty Nivaran Adhiniyam, 1973.
১৫	মহারাষ্ট্র	The Bombay Prevention of Begging Act, 1959.
১৬	পাঞ্জাব	The Punjab Prevention of Begging Act, 1971.
১৭	সিকিম	The Sikkim Prohibition of Beggary Act 2004.
১৮	তামিলনাড়ু	The Madras Prevention of Begging Act, 1945.
১৯	উত্তর প্রদেশ	The Uttar Pradesh Prevention of Begging Act, 1972.
২০	উত্তরাখণ্ড	The Uttar Pradesh Prevention of Begging Act, 1972 গ্রহণ করেছে।
২১.	পশ্চিমবঙ্গ	The West Bengal Vagrancy Act, 1943.
২২.	দমন ও দিউ	The Goa, Daman & Diu Prevention of Begging Act, 1972.

সূত্র: Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, November 29, 2010.

উল্লিখিত আইনগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং তাদের জেল ও আর্থিক জরিমানা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই আইনগুলিতে ভিক্ষুকদের সংজ্ঞা এবং শ্রেণিবিন্যাসও করা হয়েছে। পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে তাদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্যে বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা বলা হয়, যেমন – খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত আইনগুলি ছাড়াও, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের পৌর আইনগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করে এবং এটিকে আইনি অপরাধ বলে ঘোষণা করে। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি এবং ব্যাঙ্গালোরের মতো বড় বড় শহরগুলিতে যেখানে বিদেশীরা প্রচুর সংখ্যায় আসে, সেখানে ভিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে এবং এই জায়গাগুলিতে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্যা

যাচাই করার জন্য এই শহরগুলিতে গরিব ঘর রয়েছে যেখানে ভিক্ষুক রাখা হয়। তাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হয় এবং কিছু দরকারী কাজ করতে বা কিছু দক্ষতা শিখতে উৎসাহিত করা হয়।[১০৭]

২.৫.১৩. ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আর্দশ বিল:

উপরোক্ত নিয়ন্ত্রক বিলগুলির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি আদর্শ বিল তৈরী করেন। আর প্রাদেশিক সরকারদেরও তা পালনের কথা বলা হয়।[১০৮] আইনগুলি হল, -

(ক) জবরদস্তিমূলক ভিক্ষাবৃত্তি সমেত সমস্ত প্রকারের ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়।

(খ) সব ধরনের ভিক্ষাকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

(গ) ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পৌরসভার অফিসারদের নিয়ে বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়।

(ঘ) শুধুমাত্র কোনো স্বতন্ত্র ভিক্ষুককে নয়, যে ভিক্ষা দেবে তাদের শাস্তিপ্রদানের কথা বলা হয়।

(ঙ) শিশু ভিক্ষুকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর যারা তাদের এই পেশায় নিয়োগ করেছেন তাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(চ) প্রকারভেদ অনুযায়ী ভিক্ষুকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

(ছ) কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও শিশুদের বাসস্থান, সংশোধনাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) এছাড়া গরিবালয় নির্মানের কথা বলা হয়।

২.৬. পর্যালোচনা:

ভিক্ষুক সমস্যা কেবলমাত্র কোনো একটি রাষ্ট্রের সমস্যা নয়। এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষ করা যায়। ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের ইতিহাসকে অনুধাবন করে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রকৃতিগত ধরণগুলি প্রায় একই রকমের। সেই সঙ্গে ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানকল্পে বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রগুলিতেই বিভিন্ন আইন প্রনয়ণের দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষনীয়। সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও একই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তথাপি ভারতের ভিক্ষাবৃত্তির নিবারণকল্পে বিদ্যমান আইনগুলি সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করতে সক্ষম নয়; কারণ বিভিন্ন রাস্তায়, বাজারে, ট্রাফিক সিগন্যালে, রেলস্টেশনে, কিংবা ধর্মীয় স্থানগুলিতে অধিক পরিমাণে ভিক্ষুকদের দেখতে পাওয়া যায়, যা জনসাধারণের অসুবিধার কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিষয় হিসেবে গণ্য করার ফলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। যে কারণে ভিক্ষুক সমস্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Jonathan Crewe: ‘Defining Marginality?’ *Tulsa Studies in Women’s Literature* 10, *No. 1 (1991)*, পৃ.পৃ. ১২১-১৩০। https://doi.org/10.2307/463956.

২. Ghana S. Gurung and Michael Kollmair, *Marginality: Concepts and their Limitations*, (Switzerland, Development Study Group, Department of Geography, University of Zurich, 2005), পৃ. ১০।

৩. W Labow: *The Social Stratification of English in New Work City*, (Washington, De, Center for Applied Linguistics, 1966), পৃ. ২৫।

৪. Ghana S. Gurung and Michael Kollmair, *Marginality: Concepts and their Limitations,* প্রাগুক্ত।

৫. Sumita Sarkar: 'Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', *The Indian Journal of Social Work, 68, No. 4, (October 2007),* পৃ.পৃ. ৫৩১-৫৪৪।

৬. Vijay Kumar: 'The Destitutes and Their Problems: A Study with Special Reference to the Destitute Depending on the Begging from the Worshipers Near the Various Temples of the City of Bangalore', (September 20, 2011). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2423506.

৭. Namwata (et al.): 'Demographic dimensions and their implications on the incidence of street begging in urban areas of Central Tanzania: The case of Dodoma and Singida Municipalities', *Global Journal of Human Social Science, 11, No. 4, (2010),* পৃ.পৃ. ৫৩-৬০।

৮. Woubishet Demewozu: 'Begging as a Survival Strategy: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa', (Dissertation, Addis Ababa University, 2003), doi http://etd.aau.edu.et/handle/123456789/3311

৯. Charles Richmond Henderson: *Modern methods of charity: an account of the systems of relief, public and private, in the principal countries having modern methods,* (London, Macmillan, 1904), পৃ. ৫।

১০. K. L. Kamat, 'The begging profession', *Kamat Potpourri,* (2007), পৃ. ১। https://www.kamat.com/kalranga/bhiksha/begging.htm [Last Accessed 20.07.2019]

১১. MOLSA: *Study on begging in Addis Ababa. Ethiopia: Action Oriented Addis Ababa'* (Ethiopia: Ministry of Labour and Social Affairs, 1992).

১২. Woubishet Demewozu: *Begging as a Survival Strategy: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa,* প্রাগুক্ত।

১৩. M. Jha: *The Beggars of a pilgrim's city: anthropological, sociological, historical & religious aspects of beggars and lepers of Puri,* (Varanasi, Kishor Vidya Niketan, Bhadaini, 1979), পৃ.পৃ. ২৫-২৬।

১৪. *তদেব*।

১৫. Roseline Olufunke Bukoye: "Case Study: Prevalence and Consequencies of Streets Begging among Adults and Children in Nigeria, Suleja Metropolis', *Procedia - Social and Behavioral Sciences 171, (January 1, 2015),* পৃ.পৃ. ৩২৩-৩৩৩। https://doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.129.

১৬. Mesfin Woldemariam: *The Horn of Africa: Conflict and Poverty,* (Addis Ababa, Commercial Printing Press, 1999), পৃ. ১৯৭।

১৭. MOLSA: *Study on begging in Addis Ababa. Ethiopia: Action Oriented Addis Ababa, প্রাগুক্ত*।

১৮. Katyun H. Cama: "Types of Beggars", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ২।

১৯. *The Encyclopedia of Social Work in India*, (New Delhi, Publication Division, 1968). পৃ. ১৫৮।

২০. *তদেব*।

২১. Census of India, 2001: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 2003).

২২. H. Ahamdi: 'A Study of Beggars - Characteristics and Attitude of People Towards the Phenomenon of Begging in the City of Shiraz', *Journal of Applied Sociology, 39, No. 3, (Autumn 2010),* পৃ.পৃ. ১৩৫-১৪৮।

২৩. G.R. Madan: *India of Tomorrow,* (New Delhi, Allied Publication Private Limited, 1986), পৃ. ৩৪৪।

২৪. R. Mukharjee: "Causes of beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ১৮।

২৫. "*Section 55(1) in The Code of Criminal Procedure, 1973*,"

২৬. '*The Hyderabad Prevention of Beggary Act (XX of 1940)*'.

২৭. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *The Calcutta Municipal Gazette,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 25th October, 1943).

২৮. ‘The Mysore Prohibition of Beggary Act, 1944, and the Rules for the Prohibition of Beggary, 1947’, (Government of Mysore, Law Department, 1959).

২৯. ‘The Tamil Nadu Prevention of Begging Act, 1945, (Act 13 of 1945).

৩০. ‘Bombay Act No. XXIII of 1945’, (The Bombay Beggars Act, 1945).

৩১. ‘Bihar Prevention of Beggary Act, 1951’, (Bihar Act 1 of 1952).

৩২. ‘The Jammu and Kashmir Prevention of Beggary Act, 1960’, (Act No. XL of 1960).

৩৩. ‘Assam Prevention of Begging Act, 1964’, (Assam Act XVII of 1964).

৩৪. ‘Punjab Prevention of Beggary Act, 1971’.

৩৫. ‘The Haryana Prevention of Beggary Act, 1971’, (Act 9 of 1971).

৩৬. *The Goa, Daman and Diu Prevention of Begging Act, 1972 (Act No. 4 of 1973)*

[2nd March, 1973] published in the Official Gazette, Series I No. 50 dated 15th March, 1973.

৩৭. ‘The Madhya Pradesh Bhiksha Vritti Nivaran Adhiniyam, 1973’, (Act 3 of 1974).

৩৮. ‘The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975’, [U.P Act No. 36 of 1975], (Amended by U.P. Act No. 21 of 1978).

৩৯. ‘The Karnataka Prohibition of Beggary Act’, (1975).

৪০. ‘The Telangana Prevention of Begging Act, 1977’, (Act No. 12 of 1977).

৪১. ‘The Himachal Pradesh Prevention of Beggary Act’, (1979).

৪২. ‘Sikkim Prohibition of Beggary Act, 2004’, (October 26, 2004).

৪৩. ‘The Kerala Prevention of Begging and Protection of Destitute Beggars Bill’, (2014).

৪৪. Woubishet Demewozu: *“Begging as a Survival Strategy: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa’,* প্রাগুক্ত।

৪৫. তদেব।

৪৬. *তদেব*।

৪৭. Prashan Ranasinghe: 'Reconceptualizing Vagrancy and Reconstructing the Vagrant: A Socio-Legal Analysis of Criminal Law Reform', *International Journal of Law in Context*, 11, No. 3, (2015), পৃ.পৃ. ৩২০-৩৪০ ।*doi:10.1017/S1744552315000178*

৪৮. Chris Fitter: 'Review of Paola Pugliatti: Beggary and Theatre in Early Modern England', *A Companion to Shakespeare's Works: Volume 1,* The Tragedies, Early Modern Literary Studies, http://purl.oclc.org/emls/12- 2/revpugli.htm. [Last Accessed 26.06.2013].

৪৯. M. S. Scott: 'Panhandling', *Problem-Oriented Guides for Police Series,* 13, (2002), পৃ.পৃ. ১-৫৭।

৫০. *তদেব*।

৫১. *তদেব*।

৫২. *তদেব*।

৫৩. *তদেব*।

৫৪. M. Vasudeva Moorthy: "An Historical Survey of Beggar Relief in India", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ৭০।

৫৫. Subrata Kumar Acharya: 'Evaluation of the Institution of beggary in Ancient India', *Bhandarkar Oriental Research Institute, 69, No. ¼ (1988),* পৃ.পৃ. ২৬৯-২৭৭।

৫৬. তদেব, পৃ. ৭৬।

৫৭. M. Vasudeva Moorthy: "*An Historical Survey of Beggar Relief in India*", *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭২।

৫৮. *তদেব*।

৫৯. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: *মনুসংহিতা,* (কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০), পৃ.পৃ. ৫৮-৬২।

৬০. *তদেব,* পৃ. ৬৬।

৬১. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৩৬-১৪০।

৬২. M. Vasudeva Moorthy: "*An Historical Survey of Beggar Relief in India*," *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৭৭-৭৮।

৬৩. Subrata Kumar Acharya: '*Evaluation of the Institution of beggary in Ancient India*', *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৬৯-২৭৭।

৬৪. M. Vasudeva Moorthy: "*An Historical Survey of Beggar Relief in India*," *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৭৮-৭৯।

৬৫. Subrata Kumar Acharya: '*Evaluation of the Institution of beggary in Ancient India*', *প্রাগুক্ত*।

৬৬. M. Vasudeva Moorthy: "*An Historical Survey of Beggar Relief in India*," *প্রাগুক্ত*।

৬৭. অচিন্ত্য বিশ্বাস: *অদ্বৈত মল্লবর্মন রচনা সমগ্র,* (কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন, ২০০০), পৃ.পৃ. ১১০-১১১।

৬৯. M. Vasudeva Moorthy: "*An Historical Survey of Beggar Relief in India*," *প্রাগুক্ত*।

৭০. J. L. Gillin: 'Vagrancy and Begging', American Journal of Sociology, 35, No. 4, (November 1929), পৃ.পৃ. ৪২৪-৪৩২।

৭১. John Jeremiah Bigsby: *A Lecture on Mendicity,* (Palala Press, 24 May 2016), পৃ.পৃ. ১-৪৬।

৭২. M. Vasudeva Moorthy: "*An Historical Survey of Beggar Relief in India*," *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৮২-৮৩।

৭৩. *তদেব*।

৭৪. *তদেব*।

৭৫. Damodar Dharmanand Kosambi: *Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outlines* (New Delhi, Vikas, 1990), পৃ. ১৩।

৭৬. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৬-২৬।

৭৭. Sumita Sarkar: 'Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৫৪২-৫৪৮।

৭৮. Census of India, 2011: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 2013).

৭৯. John Barnabas: "Legislation Relating to Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ১৬১।

৮০. *তদেব*, পৃ.পৃ. ১৬৩-১৬৯।

৮১. The Mysore Prohibition of Beggary Act (XXXIII of 1944), *প্রাগুক্ত*।

৮২. John Barnabas: "Legislation Relating to Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৬৩-১৬৯।

৮৩. "*Section 55(1) in The Code of Criminal Procedure, 1973*", *প্রাগুক্ত*।

৮৪. *তদেব*।

৮৫. 'The European Vagrancy Act, 1874, (IX of 1874), as Modified Up to 1st September, 1909', (New Delhi, Superintendent Government Printing, India, 1909).

৮৬. "The Lepers Act, 1898".

৮৭. *তদেব*।

৮৮. "Central Provinces and Berar Municipalities Act, 1922 Section 67(7)".

৮৯. "Punjab Municipal Act, 1911 - Act No. XX of 1911." *প্রাগুক্ত*।

৯০. *তদেব*।

৯১. 'The Maharashtra Police Act, 1951', (Bombay Act No. 22 of 1951).

৯২. The Madras City Police Act, 1888

৯৩. *তদেব*।

৯৪. 'The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916', (U.P. Act. No. II of 1916).

৯৫. *তদেব*।

৯৬. John Barnabas: “Legislation Relating to Beggary,” in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৭৫-১৮০।

৯৭. তদেব।

৯৮. তদেব।

৯৯. তদেব।

১০০. Cochin Vagrancy Act, 1945.

১০১. তদেব।

১০২. তদেব।

১০৩. ‘The Railways (Local Authorities' Taxation) Act, 1941, Act No. 25 of 1941’, (26th November, 1941).

১০৪. ‘The Mysore Prohibition of Beggary Act, 1944, and the Rules for the Prohibition of Beggary, 1947’, প্রাগুক্ত।

১০৫. তদেব।

১০৬. Press Information Bureau: Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, (November 29, 2010).

১০৭. N. Jayapalan: *Urban Sociology*, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributers, 2002), পৃ. ২৭।

১০৮. John Barnabas: “Legislation Relating to Beggary,” in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৮৫-১৯০।

তৃ তী য় অ ধ্যা য়

কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির ঐতিহাসিক বিবরণ

কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক উৎস সম্পর্কে অধ্যয়ন প্রসঙ্গে ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের (যার রাজধানী হল কলকাতা) ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের পর্যায়গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তনের আলোচনায় সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত এই অধ্যায়টিতে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সময়কালীন পর্ব পর্যন্ত কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভবের বিষয়টি প্রধান আলোচনার দিক। এতে এই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তাৎপর্যকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভবের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য কালপর্বে তাদের বিবর্তনের ধারাগুলি এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

৩.২. কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

ঐতিহাসিক সময়কাল জুড়ে লক্ষনীয় যে, সমাজে দারিদ্র্যতা একটি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সমাজের গরিব ও অনাহারী মানুষজন দৈন্যতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের উত্তরণের পথকে ভুলে যান। সেক্ষেত্রে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে ‘দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে’ (The Vicious Circle of Poverty)[১] আবর্তিত হয়ে যায়। তাদের এই দৈন্যদশার চিত্র ফুটে ওঠে নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে। আর সেই কারণেই দারিদ্র্যতার সবচেয়ে খারাপ দিকগুলি ক্রমশ প্রতীয়মান হয়, যার শেষ পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় ভিক্ষাবৃত্তি। তবে এই শেষ পরিণতিতে পৌঁছনোর পূর্বে দারিদ্র্যতার পরিবেশ নির্মিত হয় নানা

কারণে। এ প্রসঙ্গে Mosley এবং Verschor তাঁদের 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র' সম্পর্কিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, গ্রামীণ ইথিওপিয়া, উগান্ডা এবং পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) ক্ষুদ্র পরিসরের দরিদ্র কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্রই থেকে গেছে।[২] কারণ তাদের মধ্যে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য বা সাহস, কোনোটাই নেই। তাঁরা গবেষনায় আরও দেখিয়েছেন যে, দরিদ্র কৃষকরা শুধুমাত্র দৈন্যতার কারণেই নয়, কৃষকরা যে কোনোরকম ঝুঁকি নিতেই অনিচ্ছুক। যে কারণে ক্ষুদ্র পরিসরের দরিদ্র কৃষকরা কম আয় এবং নিম্নমানের জীবনযাপনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এমনকি তারা দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যতাকেও মেনে নিতে রাজি থাকে।[৩]

উল্লেখ্য যে, মানুষের দারিদ্র্যতার ওপর বাহ্যিক প্রভাব পড়লে দরিদ্র হয়ে জীবনযাপন করার প্রবনতা হ্রাস পায়।[৪] এক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রভাব বলতে দরিদ্র মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কোনো উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ কিংবা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা দ্বারা গৃহীত কোনো জনকল্যাণকর উদ্যোগকে বোঝায়। তবে দরিদ্র মানুষ যদি দারিদ্র্যতা নিরসনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকে, তার জীবনধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

সুতরাং, যে দরিদ্র মানুষগুলি কোনোরকম ঝুঁকি গ্রহণে অপারগ, তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবনধারণের শেষ উপায় হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়। ভিক্ষাবৃত্তির ফলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার অবস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকে। যেমন, - সে বুঝতে পারে না তার বৈভব কতখানি, তার আত্মমর্যাদাবোধ কতখানি, তার সামনে কোনো নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে বিনিয়োগ ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উপযোগী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা কতখানি।[৫]

এই ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে ভিক্ষুক ও তার পরিবারে একটি হীনমন্যতার বাতাবরণ তৈরি করে শুধুমাত্র নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাই ঘটায় না, উপরন্তু এই বৃত্তির ফলে সমাজের ভৌগোলিক ও সামাজিক গঠনেও একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যা বিশেষ করে নগর এবং মহানগরের সামাজিক গঠনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, - ভিক্ষাবৃত্তির বৃদ্ধি সেই অঞ্চলগুলিতেই, যেখানে প্রচুর দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আধিক্য থাকে, এবং সেখানে অপরাধ প্রবনতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ভিক্ষাবৃত্তির চর্চাটি বর্তমান সময়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।[৬] শিকাগো স্কুলের (Chicago School) মতে, নগরায়ণ, অভিবাসন, বসবাসক্ষেত্র, জনঘনত্ব ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ভিক্ষাবৃত্তির কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, - দরিদ্র মানুষ যখন তার জনগোষ্ঠী থেকে, জাতিসত্তা থেকে, তার পারিপার্শ্বিক চালচিত্র থেকে বিযুক্ত হয়, তখন সে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। যা প্রকারন্তে তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে।[৭] মার্টনের 'মিন্স এন্ড' তত্ত্ব অনুযায়ী, ভিক্ষুক হল তারাই, যারা তাদের সাংস্কৃতিক লক্ষ্যতে পৌঁছতে পারে না। অর্থাৎ আইনানুগ পদ্ধতিতে তারা নিজেদের বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যকে গ্রহণ করতে পারে না।[৮]

যে সমাজ দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান করতে পারে না, এবং যেখানে দারিদ্র্য দূরীকরণের কোনো কার্যকারী সমাধান থাকে না, সেখানে ভিক্ষাবৃত্তির প্রবনতা বেশি। যদিও মূল্যবোধ ও চেতনার আধিক্য যে সমাজে বেশি, সেখানেই দরিদ্রদের জীবনযাত্রার নিম্নমানকে তাদের ঐ অক্ষমতার একটি ফল হিসেবে ভাবা হয়। এই রকম এক পরিস্থিতিতে সেই সমাজে দরিদ্র মানুষেরা মনে করেন যে, তাদের এই নিরাশা এবং অক্ষমতার অনুভূতি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে নিরসন সম্ভব। তাঁরা মনে করেন, বৃহত্তর সমাজে যে মূল্যবোধ ও যে লক্ষ্য

থাকে তা তাদের আয়ত্তে আসা বাস্তবে অসম্ভব।[৯] অন্যদিকে পিরেনের মতে, দ্রুত নগরায়ণের ফলে জনাধিক্য ও জনঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মানুষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শক্তি থেকে এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে দূরে সরে যায়। এই মানুষেরা মনে করেন যে, তারা দুই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যেই আছেন। আবার তারা একই সঙ্গে এটাও ভাবেন যে, দু'টোর কোনও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নেই।[১০] অর্থাৎ এই দোদুল্যমানতা থেকে তারা নিজেদেরকে বাস্তব নগরজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়।

রবার্ট মার্টন দেখিয়েছেন, যে কোনো সমাজই চায় যে তার সদস্যরা সম্পদশালী এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠুক। কিন্তু, সমাজ প্রতিটি মানুষের জন্য সেই সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে না। যার ফলস্বরূপ একটি বৃহৎ অংশের মানুষ এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন অনৈতিক, অপ্রচলিত ও অস্বাভাবিক পথ বেছে নেয়, যার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অন্যতম।[১১] 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে'র (The Vicious Circle of Poverty) ওপর ভিত্তি করে Ogunkan এবং Fawole দেখিয়েছেন যে, এই দারিদ্র্য হল একটি দীর্ঘ লালিত বিষয়, যা এক প্রজন্ম থেকে ধাবিত হয়; এবং এর ফলেই কালক্রমে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবনতা এই দুষ্ট চক্রকে ভাঙতে পারে।[১৩]

ভিক্ষুকদের প্রতি নৈতিক সমর্থনের প্রশ্নে এমনও লক্ষনীয় যে, বহু ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকগণের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধাভাস রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৫২৮ সালে প্রকাশিত মার্টিন লুথার (Martin Luther) 'Liber Vagatorum' গ্রন্থের মুখবন্ধে ভিক্ষুকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, -

> "...princes, lords, counsellors of state, and everybody should be prudent, and cautious in dealing with beggars, and learn that, whereas people will not give and help honest paupers and needy neighbours, as ordained by

God, they give, by the persuasion of the devil, and contrary to God's judgement, ten times as much to vagabonds and desperate rogues."[১৩]

মার্টিন লুথারের (Martin Luther) এহেন বক্তব্যের মতোই এক ধরনের আভাস পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের এক পরীক্ষায়। সেখানে প্রশ্ন করা হয় যে, রাস্তার ভিক্ষুকদের পরিবর্তে সংগঠিত দাতব্য কেন্দ্রগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা অধিক ভালো কেন। - এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই চেতনার যাচাইকরণের প্রয়াস হয়েছে যে, দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য সাধারণ মানুষের সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে কী বেছে নেওয়া উচিত?[১৪]

সমাজতত্ত্ববিদ এ. এরস্কাইন (A. Erskine) এবং ইয়ান ম্যাকিন্টস (Ian McIntosh) বলেছেন, অনেকসময় ঐতিহাসিকরা তাঁদের রচনায় ভিক্ষার বিবরণে ভিক্ষুকদের জীবন-যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা না দিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। যার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণগুলির খুব একটা সামঞ্জস্য লক্ষনীয় নয়। সেক্ষেত্রে তাঁরা ক্ষমতাবানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমসাময়িক ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করেন। তাঁদের এহেন মন্তব্যের কারণ ঐতিহাসিক জে. পাউন্ড (J. Pound), ভিক্ষুক সম্পর্কিত হারমানের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, -

"There seems no good reason for a person of his social standing to have deliberately invented the types of vagrant he describes so graphically."[১৫]

আবার হারমান (Harman) এবং পাউন্ডের (J. Pound) বক্তব্যের বিরোধিতা করে এ. এল. বেইয়ার (A. L. Beier) এবং পি. স্ল্যাক (P. Slack) বলেছেন যে, হারমান ও পাউন্ডের ভিক্ষুক সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ভিক্ষুকদের বাস্তব চিত্রের অনেক অমিল রয়েছে। তাই বেইয়ার এবং

স্ল্যাক পরামর্শ দিয়েছেন যে, বাস্তবে বেশিরভাগ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে যুবক ছিল এবং তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ত। তাদের এই অপরাধ প্রবনতার পশ্চাতে নানাবিধ কারণও ছিল।[১৬]

ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের মধ্যে অন্যাহ্য আচরণ এবং অপরাধ করার মানসিকতার পেছনে অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে, যার মধ্যে দারিদ্র্যতা, অবহেলা, লাঞ্ছনা, অসম্মান, এমনকি অনেক সময় স্বভাবজনিত কারণেও তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হত। তবে এসবের মূলে সর্বদাই থাকত দারিদ্র্যতা। আর ভারতে ক্রমবর্ধমান জনাধিক্য ছিল দারিদ্র্যতার অন্যতম কারণ। ফলে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমানতার জন্য খাদ্য, শক্তি, জল, মানব বসতির জন্য জমি, উন্নত নাগরিক পরিকাঠামোগত সুবিধা এবং মানসম্মত জীবনযাত্রার জন্য সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দরিদ্র মানুষ ভারতে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের কারণে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলিও মেটাতে অক্ষম, যা সমাজের নিম্ন স্তরের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা দরিদ্র মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্য উপার্জনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে অনেক সময়ই তথাকথিত ভিক্ষুকদের মধ্যে অপরাধ করার প্রবনতা দেখা যায়।[১৭]

ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভিক্ষাবৃত্তির ওপর সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় বিষয় হল - ব্রিটিশরা যখন ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে কৃষিসংস্কার চালু করে তখন দরিদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতের প্রান্তিক মানুষজন কৃষিকাজ থেকে ক্রমেই বিচ্যুত হয়ে অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির ফলে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যা মানুষকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য করে। তাছাড়া ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবার

ব্যবস্থায় পরিবারের দুর্বল (বৃদ্ধ, বিধবা, অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী) সদস্যদের যত্ন নেওয়া হত, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সূচিত হলে তাদের পারিবারিক আয় হ্রাস পায়, এবং যৌথ পরিবারগুলি তাদের দুর্বল সদস্যদের বোঝা হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে।[১৮] ফলে এমন পরিবারের সদস্যরা পরিবার ছেড়ে রাস্তায় থাকতে বাধ্য হয় এবং কেউ কেউ শহরাঞ্চলে অভিবাসিত হয়। অন্যদিকে যারা ইতিপূর্বেই শহরে বসবাস করত, তাদের ছোট পরিবার ছিল এবং তারা স্বল্প আয়ে জীবনযাপন করত। তাই যারা নতুন করে গ্রাম থেকে শহরে আসতে শুরু করল, তাদের থাকার ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থার অভাব দেখা দেয়। ফলে তারা দারিদ্র্যতার শিকার হয়ে অনেক সময়ই ভিক্ষাবৃত্তির পথকে বেছে নিতে বাধ্য হয়।

যদিও কলকাতাবাসী বাঙালি ভদ্রলোক ও ইউরোপীয়রা শহরে আগত গ্রামীণ দরিদ্র ও অনাহারী মানুষদেরকে খুব একটা ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ের সমাজে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেরা নিজেদের দৈন্যতার কারণে নানা পরিচয়ে পরিচিত হতে থাকে। এর ফলে কলকাতার ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দারিদ্র্যতার সীমারেখা পরিমাপ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।[১৯] যদিও ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যথাযথ পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা দরকার। তবে এর মধ্যে অনেক সময়েই পক্ষপাতদুষ্টতা লক্ষ করা যায়। কেন-না সাধারণত ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের ওপর যেকোনো বিবরণ একমুখী এবং পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং শহুরে সুবিধাভোগীদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়ে থাকে। তাই ভিক্ষুকদের সম্পর্কে বিবরণগুলিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে বিশ্লেষণ করা উচিত।

৩.৩. কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির ধারা:

কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সামগ্রিক ইতিহাসকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক (১৯০১-২০১১) পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের পর্যায়কে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যথা: (ক) ঔপনিবেশিক পর্ব (১৯০১-১৯৪৭), (খ) স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরণ পর্ব (১৯৪৭-১৯৫১), (গ) পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ব (১৯৫১-১৯৮১), এবং (ঘ) উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের পর্ব (১৯৮১-২০১১)। এই ধারাগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করার পূর্বে প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তির সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরা আবশ্যক।

৩.৩.১. প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সময়কাল:

ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকেই দান করা এবং দান গ্রহণ করার ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। যা কালের নিয়মে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতে সনাতন/হিন্দু ধর্মানুসারে 'দান' বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ধর্মমতে রয়েছে যে, যুগে যুগে মানুষ জগতের মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করে এসেছে। যেমন, - 'সত্য' ও 'ত্রেতা' যুগে মানুষ 'তপস্যা' করেছে, 'ত্রেতা' যুগে 'জ্ঞান' আহরণ করেছে, 'দ্বাপর' যুগে মানুষ 'যজ্ঞ' করেছে এবং 'কলি' যুগে (বর্তমান যুগ) মানুষকে 'দান'কার্যের দ্বারা জগতের মায়া থেকে মুক্ত হতে হবে।[২০] তাই এই ধর্মাবলম্বী মানুষেরা দান করার ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহী। এ কারণে হিন্দু ধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এই 'দানে'র বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের চতুরাশ্রম ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর এজন্যই দানের পাশাপাশি দান গ্রহণ তথা ভিক্ষা গ্রহণের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে; যা এই ধর্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখা হয়।[২১] অনুরূপভাবে বৌদ্ধ ধর্মমতেও মানুষের প্রারম্ভিক জীবনযাপনের সূচনা হত ভিক্ষাবৃত্তির হাত ধরে। তাছাড়া এই

ধর্মে ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য গার্হস্থ্য জীবনে 'দানগুণ' থাকা আবশ্যক। এতে বলা হয়েছে, কৃপণতা ত্যাগ করে দান কার্যে প্রীতি অনুভব করা উচিত এবং গরিব-দুঃখী, ভিক্ষুক, পথিক, যাচক প্রমুখ সবাইকে দান করে জীবনযাপন করা উচিত। - এ থেকে স্পষ্ট যে, বৌদ্ধ ধর্মে দান করা এবং দান গ্রহণ করার বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়কালে 'আশ্রম' ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হত; এবং সেই ব্যবস্থা অন্যের দান, তথা ভিক্ষার ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা পক্ষান্তরে ভিক্ষাবৃত্তির মতো বিষয়গুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

অন্যদিকে প্রাচীন সময়কালে দান এবং দানকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত ভিক্ষার বিষয়টিতে দুর্নীতির সম্ভাবনা তৈরি হলে ভিক্ষার বিষয়টি আর শ্রদ্ধার জায়গায় না থেকে ক্রমেই একটি অসম্মানজনক বিষয়ে পরিণত হয়। মৌর্য যুগে কৌটিল্যের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সাংসারিক দায়িত্ব পালন না করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাকে অন্যায় হিসেবে পরিগণিত করে শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আবার - যদিও প্রাচীনকালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে কোনো অসম্মান ছিল না। সনাতন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের বহু ক্ষেত্রে ভিক্ষু ও ভিক্ষা ধর্মীয় আচার-আচরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল প্রাচীন সময়কালে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, প্রাচীন ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২২]

ভিক্ষাবৃত্তির ধারণার আরও শক্তিশালি হয় আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। এর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত কিংবা সমাজগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ

হিসেবে সমষ্টিগত সমস্যা বা সমষ্টিগত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গণ্য হত। যার ফলে সমাজের নানা সমস্যা প্রাথমিকভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে সমাধান করার প্রয়াস চালান হত।[২৩] ফলস্বরূপ সমাজের দরিদ্র ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের প্রতি নানা সময়ে ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যবোধ থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হত। যে কারণে দরিদ্রদের প্রতিদান কার্য পরিচালনা করা হত, এবং সেখান থেকেই বহু মানুষের মধ্যে পরভোজী কিংবা অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার মানসিকতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।[২৪]

পরবর্তী সময়ে ভারতে ইসলামের আগমন ঘটলে সুলতানি ও মুঘল শাসকদের দ্বারা ভারতে ইসলামীয় সংস্কৃতির আনয়নের মধ্য দিয়ে সুফি-সন্তদের ত্যাগের জীবনধারণের আদর্শ ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যাকে কেন্দ্র করে ফকির-দরবেশের মতো আরও বেশ কিছু মানুষজনের অস্তিত্ব তৈরি হয়, যারা অন্যের দান তথা ভিক্ষার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে অনেক জমিদার ও রাজন্যবর্গের সাহায্য নিয়ে তৎকালীন সময়ের শাসকরা রাজস্ব আদায়ের নামে কৃষকদের ওপর অত্যাচার করত। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের বহু দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হতে থাকে। উপরন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলে পড়ে অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্যতার শিকার হয়ে পরান্নভোজীতে পরিণত হয় এবং সাময়িকভাবে ভিক্ষা করে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে অনেকসময় দুর্ভিক্ষ ও অনাহার দুরীকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও গ্রহণ করা হত, যা সাময়িক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হলেও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকারের কোনোরূপ পথ দেখাতে সক্ষম ছিল না। ফলত দারিদ্র্যের সমস্যা, সমস্যা হয়েই থেকে যেত।[২৫]

পরবর্তীতে আঠারো শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় ইংরেজ শক্তির জয়লাভ ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব

পড়ে ছিল। কারণ নতুন নতুন অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ভারতে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা কিছুটা প্রভাবিত হয়; এবং অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতের চিরাচরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভাঙন ধরে। অন্যদিকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায়, কর্মচারীদের দুর্নীতি এবং কোম্পানি ও ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থে আর্থিক লুণ্ঠন বাংলার অর্থনীতিতে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করে ছিল। কোম্পানির শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির উপর। বিপর্যস্ত হয়ে ছিল অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা। ফলে সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষিত হতে হয় দারিদ্র্যের আবর্তচক্রে।[২৬] অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বাংলার অর্থনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দেওয়ানী লাভ, আর্থিক নিষ্ক্রমণ, ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন, কৃষক শোষণ, মন্বন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস এবং একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার অর্থনীতিকে বিপদের সম্মুখীন করেছিল। এ সময়ে ভয়াবহ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার চরম ক্ষতিসাধন করে ছিল। যার ফলস্বরূপ বাংলা দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[২৭] কোম্পানির এই লুঠতরাজের ফলাফল কেবলমাত্র ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষেই নয়, এর পাশাপাশি ১৭৮৪, ১৭৮৭ ও ১৭৮৯ সালেও বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের বাংলার অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায় এবং দীর্ঘকালের জন্য দরিদ্রে পরিণত হয়ে যায়।[২৮] অন্যদিকে বাংলার দেশীয় বাণিজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয় কোম্পানীর কর্মচারীদের বে-আইনীভাবে 'দস্তকে'র অপব্যবহারের ফলে।

কোম্পানীর আমলে বাংলা দেশে পাঁচশালা, দশশালা ও চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের কারণে বহু ভূ-স্বামীর উত্থান ঘটে, আবার বহু ভূ-স্বামীর পতনও ঘটে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড

কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন বাংলা দেশে। ফলে একদিকে যেমন এক শ্রেণির স্থায়ী ভূ-স্বামীর সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনই বাংলার নানা অঞ্চলে নতুন নতুন প্রান্তিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।[২৯] যার মধ্যে দরিদ্র মানুষের অবস্থা ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং ক্রমেই তারা অন্যের দয়া এবং দাতব্যের ওপর আস্থাশীল হয়ে পড়ে, যা তাদের 'ভিক্ষুক' পরিচয়ে পরিচিত করে ছিল।

অন্যদিকে এ সময়ে, অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক পরিসরে কয়েকটি ঘটনা মানুষের চিন্তন ও মনোজগতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষত ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকার বিরোধের সূচনা (১৭৭২ খ্রি.); জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৭৭৫ খ্রি.); আমেরিকা কর্তৃক স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা (১৭৭৬-এর ৪ঠা জুলাই); ইঙ্গ-আমেরিকা যুদ্ধ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার; অ্যাডাম স্মিথের 'The Wealth of Nations' (১৭৭৬ খ্রি.) গ্রন্থ প্রকাশ এবং এতে অবাধ বাণিজ্য নীতির বিশ্লেষণ; ফরাসি বিপ্লবের সূচনা (১৭৮৯ খ্রি.); ফরাসী বিপ্লবে সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯৩ খ্রি.); ওয়াটারলু'র যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনের হাতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরাজয় (১৮১৫ খ্রি.) প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ভারতেও প্রভাব ফেলেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও বাংলার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের যে সূচনা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে লক্ষ করা যায়, তা অত্যন্ত ধীর গতিতে হলেও এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সমগ্র শতক জুড়েই অব্যহত ছিল। পাশাপাশি এই নতুন যুগে নতুন শহর হিসেবে কলকাতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। যা উনিশ শতকে কলকাতা শহরের আদি পর্বের ইতিহাসে শহুরে সমাজ জীবনের পরিবর্তন সাধিত করে। ফলে এ সময়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে শিল্প-বানিজ্যের অগ্রগতি এই স্থানে জীবিকার প্রয়োজনে বাংলা দেশের বিভিন্ন

অঞ্চল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে মানুষজন ভিড় করতে থাকে। জীবিকার প্রয়োজনে আগত প্রান্তিক মানুষজন কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে তারা বিভিন্ন প্রান্তিক পেশা, যেমন – মুটে, কুলি, জুতো সেলাই, ঝাড়ুদার, গণিকাবৃত্তির মতো নানা কাজে নিযুক্ত হয়। যদিও এই সকল পেশাগুলি তাদের অভাব-দারিদ্র্যতাকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোচন করতে ব্যর্থ ছিল। অন্যদিকে বাৎসরিক খরা, বন্যা, অথবা কর্মহীনতার হাত থেকে বাঁচার আশায় বাংলার গ্রামীন সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা শহরে আরও ভিড় করতে শুরু করেছিল।[৩০] ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে অনেকেই নিরূপায় হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়।

৩.৩.২. ঔপনিবেশিক পর্ব (১৯০১-১৯৪৭):

বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শহরের প্রান্তিক মানুষের অনেকাংশই জীবন-জীবিকার কারণে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের শিকার হয়, ফলে যে ভিক্ষাবৃত্তিকে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির অঙ্গ হিসেবে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত, তাকেই এই সময়ে আর্থ-সামাজিক সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করে অশ্রদ্ধা এবং অসম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রবনতা শুরু হয়। অর্থাৎ, কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব নিয়ে জনমানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তার ভিত্তিতে বিষয়টি আলোচনা ক্ষেত্রে নানা দিক উঠে আসে। এক্ষেত্রে কলকাতা শহরে দরিদ্র মানুষের আগমনের পশ্চাতে ফুটপাতে অবাধ বসবাসের বিষয়টি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে হঠাৎ করেই ফুটপাতকে কেন মানুষ বেছে নিল? দরিদ্র মানুষের ফুটপাথকে বেছে নেওয়ার পিছনে থেকে গেছে অন্য ইতিহাস যা হল। -

১৮৫৬ সালে মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারম্যানদের বৈঠকে কলকাতার ফুটপাত তৈরির প্রস্তাব দেন কনজারভেন্সি অফিসার মিঃ ক্লার্ক। তিনি ফুটপাত তৈরির জন্য বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেন, - কলকাতার রাস্তার পাশে পাকা ড্রেন খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাছাড়া

জল জমে থাকার ফলে মশা ও অন্যান্য রোগ ছড়াতে পারে। সে কারণে এই ড্রেনগুলির খোলা মুখগুলি কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো দরকার। অন্যদিকে পথচারীরা রাস্তার বদলে ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করতে পারবে। এছাড়া রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গাগুলিতে গাছপালা ভরে যাবে। তাই এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ১৮৫৬ সালেই কলকাতার নানা জনবহুল স্থানে ফুটপাত তৈরীর প্রস্তাব দেওয়া হয়।[৩১]

১৮৫৬ সালে কনজারভেন্সি অফিসার মিঃ ক্লার্কের প্রস্তাব মিউনিসিপ্যালিটির অফিসাররা নাকোচ করে দেন। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় পথ দুর্ঘটনা ঘটার ফলে ফুটপাত তৈরির পুনঃপ্রস্তাব গৃহীত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি আইনের ১৫ নং এবং ৯ নং ধারা অনুযায়ী কমিশনার অথবা আন্ডারম্যানদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ শুরু হয়।[৩২] কলকাতার চৌরঙ্গিতে ১৮৫৮ সালে ৪০০০ টাকা খরচে প্রথম ফুটপাত তৈরি হয়। এছাড়া ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ সালে মিউনিসিপ্যালিটি ফুটপাত তৈরির খাতে খরচ করেন যথাক্রমে ৬০০০, ১৩,৩১৮ এবং ১৬,৭১১ টাকা। ১৮৬৬ সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলা হয়, -লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিটের কিছু অংশ, হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, হ্যালিডে স্ট্রিটের ফুটপাত তৈরি করা হয়েছিল। ১৮৬৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ড্রেনের কাজের জন্য ফুটপাতের কাজ হয়েছে শুধুমাত্র পার্ক স্ট্রিট, নর্থ সার্কুলার রোড, থিয়েটার রোড, লাউডন স্ট্রিট, রাসেনল স্ট্রিট, রবিনসন স্ট্রিট, এবং শর্ট বাজার স্ট্রিটে। এছাড়া ১৮৭২-এর রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, ওই বছর বউবাজার থেকে মির্জাপুর হয়ে সার্কুলার রোডের পশ্চিম এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব দিক পর্যন্ত ফুটপাত তৈরি হয়েছিল। ১৮৭৫ সালের মধ্যে কলকাতায় মোট ৭০ মাইল ফুটপাত তৈরি হয়। ১৮৭৭ সালের মিউনিসিপ্যালিটি রির্পোটে বলা

হয়েছে যে, কলকাতার ফুটপাথ রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব, কারণ ফুটপাত ব্যবহারের কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না।[৩৩]

কাজেই কলকাতা শহরে দরিদ্র মানুষের আগমনের ফলে ঐ সমস্ত ফুটপাতগুলিই হয়ে উঠলো তাদের বাসস্থান। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ফুটপাতের জন্মলগ্ন থেকেই তা শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের বসবাসের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি; প্রথম দিকে ফুটপাতগুলি হাঁটার রাস্তা হিসেবেই ব্যবহৃত হত। তবে অনেক সময়েই তা গৃহহীন দরিদ্র মানুষের রাত্রিযাপনের স্থানে পরিণত হয়, যা কালক্রমে তাদের কাছে দীর্ঘস্থায়ী বাসস্থানে রূপান্তরিত হয়। যদিও কলকাতার ফুটপাতগুলিতে ঠিক কবে থেকে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল, তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। - প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতার ফুটপাতগুলিতে দরিদ্র মানুষ বসতি স্থাপন করে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় থেকে হাজার হাজার মানুষ পাকাপাকিভাবে চলে আসে কলকাতার ফুটপাতগুলিতে।[৩৪] তবে ফুটপাতগুলিতে শুধুই যে, দরিদ্র মানুষেরা বসবাস করতে শুরু করেছিল, তা নয়; এই সময়েই বহু উন্মাদ ও মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ তথা ভবঘুরেরাও বসবাস করতে শুরু করে। ১৮৭৬ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুসারে, কলকাতার ভবঘুরেদের সংখ্যা ছিল ২৫৬ জন যাদের মধ্যে ২১৪ জন পুরুষ এবং ৪২ জন মহিলা।[৩৫]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পরবর্তী সময়কাল থেকে কলকাতায় গ্রামীণ দরিদ্র ও অনাহারী মানুষের আগমন ও খাদ্য সংকট প্রসূত নানা সমস্যা কলকাতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান যে, দরিদ্র-অনাহারী মানুষজন অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা পরিবেশে বসবাস করতো। এবং এই সমস্ত মানুষের বৃহৎ অংশ ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভিক্ষা ও দাতব্যের শরণাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে এরা ক্রমেই ভিক্ষুকের পরিচয়ে পরিচিত হতে

শুরু করে। অন্যদিকে ভারতের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের 'অ-উৎপাদনশীল' পেশাজীবী শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে, যারা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে কোনো প্রকার অবদান রাখে না। সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, কলকাতার পথ ভিক্ষুকদের জীবন-জীবিকার মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।[৩৬] ১৯১৯ সালে চুনিলাল বসু কলকাতার ভিক্ষুকদের ওপর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যথা: রাস্তার ভিক্ষুক (Street Beggers), ঘরে ঘরে ভিক্ষুক (House to House Beggers) এবং দুস্থ 'ভদ্রলোক' শ্রেণির ভিক্ষুক (Distressed 'Bhadralog' Class)। তিনি কলকাতার নানা স্থানের দাতব্য সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুবাদে ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা পোষণ করেছেন। - পথ ভিক্ষুকদের জনবহুল স্থানগুলিতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যেমন, - বাজার, ট্রাম জংশন, গঙ্গার ঘাট, মন্দির-মসজিদ ও সিনেমা হলের সামনে তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পথ ভিক্ষুকদের মধ্যে বেশিরভাগই বৃদ্ধ এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কিশোর ও কিশোরী যারা নিজের এবং নিজ পরিবারের জন্য ভিক্ষা করতেন। অন্যদিকে বয়ঃবৃদ্ধ এবং ধর্মীয় ভিক্ষুকরাই ঘরে ঘরে ভিক্ষুক হিসেবে চিহ্নিত হয়। এছাড়া দুস্থ 'ভদ্রলোক' শ্রেণির ভিক্ষুকরা হলেন সেই সমস্ত ভিক্ষুক যারা তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণির হওয়ার সত্ত্বেও পরিবারের নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভিক্ষার মাধ্যমে জীবনযাপনের পথকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এঁরা মূলত বিভিন্ন দাতব্য কেন্দ্রের দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে থাকেন।[৩৭]

উল্লেখ্য, ফুটপাতে বসবাসকারী অনাহারক্লিষ্ট এবং অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি আস্থাশীল দরিদ্র মানুষদের ভিক্ষুক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মেডিকেন্সি কমিটি।[৩৮] এই মেডিকেন্সি কমিটি কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির ভিক্ষুক সমস্যার প্রতিবেদন প্রকাশ করে

তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থকে ভিক্ষুক শ্রেণির জনসংখ্যার প্রতিবেদন প্রকাশ হতে থাকে, সেই প্রতিবেদনে কলকাতার ভিক্ষুকদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। যেমন, - ১৯০১ সালে ভিক্ষুক জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৬৫১ জন[৩৯] এবং ১৯১১ সালে এই সংখ্যা কমে গিয়ে প্রায় ৫৬২৪ জন হয়ে যায়।[৪০] ১৯২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৯৮২ জন।[৪১] কিন্ত ১৯৩১ সালে ভিক্ষুকের সংখ্যা কমে ৩৮৪৩ জন হয়ে যায়।[৪২] - ভিক্ষুক শ্রেণির এই হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আধিকারিক ডব্লিউ. আর. হামফেরি কলকাতার ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিন্যাস করে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের আলাদা করার প্রস্তাব দেন।[৪৩]

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ১৯১১ সালে কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে প্রায় ৫৬২৪ জন ভিক্ষুক ছিল, তার মধ্যে প্রায় দুই-পঞ্চমাংশের জন্ম কলকাতা ও ২৪-পরগনায়, এবং বাকিদের বেশিরভাগই বিহার, উড়িষ্যা ও ইউনাইটেড প্রদেশ থেকে এসেছিল।[৪৪] ভিক্ষুকদের মধ্যে প্রধান অংশ মূলত কুষ্ঠরোগী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং অন্যান্য দুরারোগ্য রোগের শিকার ছিল।[৪৫] এর মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। যা কলকাতা শহরের একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯২১ সালে মেদিনীপুর জেলায় একটি 'কুষ্ঠ কলোনি' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে এই পরিকল্পনা দীর্ঘসূত্রিতার ফলে বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লেগে যায়। অন্যদিকে ১৯২০-র দশকের শেষদিকে কলকাতায় প্রায় ৩০০০ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুক ছিল এবং বাংলায় প্রায় এক লক্ষেরও বেশি ছিল।[৪৬] এই ধরনের ভিক্ষুকরা কলকাতাকেই নিজেদের জীবনধারণের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়ে ছিল। কারণ,

কলকাতায় তাদের ভিক্ষাবৃত্তি অধিক সহজতর ছিল এবং বেশি সংখ্যক দাতব্য কেন্দ্রের অস্তিত্ব তাদেরকে কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট করে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতায় অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে ড. ই. মুইরের নেতৃত্বে The School of Tropical Medicine এবং The Leprosy Relief Association, Bengal-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলার পাঁচটি জেলা ও কলকাতার ৩২ টি ওয়ার্ডে ৩০১১ জন ভিক্ষুকের ওপর এক সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই সমস্ত ভিক্ষুকদের মধ্যে ৩৩.৯৪ শতাংশ ছিল রোগাক্রান্ত; ৩৮.৮২ শতাংশ ছিল সুস্থ-বেকার এবং ২৭.২৩ শতাংশ ছিল পেশাগত ভিক্ষুক।[৪৭] এই সমীক্ষায় আরও বলা হয় যে, ১৯৩০ সাল নাগাদ বাংলায় শতকরা ৪ জন ভবঘুরে-ভিক্ষুক ছিল। আবার ভিক্ষুকদের মধ্যে বেশিরভাগই ভিনরাজ্য থেকে কলকাতায় এসে ভিক্ষাবৃত্তির কাজ করত। অন্যদিকে ১৯৩৪ সালের একটি সমীক্ষায়ও এরূপ চিত্র লক্ষনীয়। নিম্নে সারণির মধ্য দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে। -

সারণি – ৩.১: কলকাতা শহরে অভিবাসিত ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ১৯৩৪

স্থান	**কুষ্ঠহীন ভিক্ষুক**	**কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুক**
বাংলা	৪৭১	২১
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৮৯	৫৩
যুক্ত প্রদেশ	১২১	২২
কেন্দ্রীয় প্রদেশ	৭৮	১২০
অন্যান্য	১,১৫৫	৮
মোট	২২১৪	২২৪

সূত্র: E. Muir, “Begger in Calcutta: A Survey,” *The Calcutta Municipal Gazetter*, XIX, no. 17 (4th March, 1934), 25-28.

অপরদিকে ১৯৩৬ সালে কলকাতায় প্রায় ৪০০০ জন ভিক্ষুকের মধ্যে, প্রায় ৫০% স্থায়ীভাবে অসুস্থ বা অক্ষম ছিল না। এদের মধ্যে প্রায় ২০০০ জন সুস্থ, প্রায় ৪০০ জন দৃষ্টিহীন, প্রায় ১০০০ জন কুষ্ঠরোগী এবং বাকি ৬০০ জন অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ছিল।[৪৮] এই ভিক্ষুকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব, কাজ ও উপার্জনের প্রতি অনীহা এবং দাতব্য কেন্দ্রের প্রতি অধিক আস্থাশীল হওয়ার কারণে শারীরিকভাবে সক্ষম পুরুষ ও মহিলারা পেশাদার ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত হয়ে পড়ে। - এভাবেই ভিক্ষা করা একটি 'উপদ্রব' হয়ে ওঠে এবং ভিক্ষাবৃত্তি একটি চিরস্থায়ী 'সমস্যা' হিসেবে থেকে যায়।

পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাংলার তৎকালীন বনিক সম্প্রদায় মুনাফার লোভে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে উধাও করে দিলে কলকাতা জুড়ে খাদ্যাভাবের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে দারিদ্র্যের সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ঠিক এই সময়ে বাংলায় দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের আবহে আর্থ-সামাজিক ভিত্তি একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চারিদিকে খাদ্য সংকট দেখা দেয়, সেই সঙ্গে ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, মৎস্যজীবী, কারিগর, নৌকার মাঝি প্রমুখরা আর্থিকভাবে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়।[৪৯] দুর্ভিক্ষ কমিশনের রির্পোট আনুযায়ী ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল প্রধানত 'মনুষ্য সৃষ্ট সংকট'। যা এ সময়ে মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর (Poorest of the Poor) করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[৫০] বলা ভালো, এই পরিস্থিতি মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত হতে বাধ্য করেছিল।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রির্পোট অনুযায়ী (১৯৪৩–১৯৪৪) এই সময়কালে বাংলায় ৪৮ লক্ষ মানুষ সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচেছিল।[৫১] গ্রামের দরিদ্র ও মাঝারি কৃষকরা বাঁচার জন্য লাঙল, বলদ, বীজ, বাসনপত্র সব বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলত

চাষবাস শুরু করার মতো কোনো অবলম্বন এদের ছিল না। কারণ গ্রামীন অর্থনীতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে। এর ফলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত স্থানে কিছু পরিমানও খাদ্যশস্য ছিল, সেখানে লুঠতরাজ শুরু হতে লাগল। পরিস্থিতি ক্রমশ বিশৃঙ্খল থেকে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে থাকে। অনাহার পীড়িত গ্রামবাসীরা খাদ্য অন্বেষণ করতে দলে দলে শহরে ও গঞ্জে ভিড় করতে শুরু করে। এ বিষয়ে ডব্লু. আর. অ্যার্কয়েড বলেছেন-

> "Calcutta was full of starving and destitute people from Rural Bengal, it was Reckoned and that about 100000 had reached the city." [৫২]

অন্যদিকে, জমিদারি অধিগ্রহন আইনের দ্বারা প্রান্তিক চাষি ও বর্গাদাররা সহায় সম্বলহীন হয়ে বাধ্য হয় শহরমুখী হতে। ফলে বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে শহরে অভিবাসিত হয়, কিন্তু শহরে বসবাসের উপযুক্ত স্থানের অভাবে এইসব শরণার্থীরা ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

এই সময় কলকাতার পথে পথে ধ্বনিত হয় কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত নর-নারী ও শিশুর আর্তনাদ - "মাগো ফ্যান দাও, একটু খানি ফ্যান দাও"। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে কলকাতা পরিণত হয় এক মৃতের নগরীতে।[৫৩] এ প্রসঙ্গে ভবানী ভট্টাচার্য তাঁর 'So Many Hungers' (১৯৪৭ খ্রি.) উপন্যাসে ভিক্ষুকদের কৌশল এবং সচ্ছল অধিবাসীদের মনে তারা যে দ্বিধা, করুণা, অপরাধবোধ এবং ঘৃণা তৈরি করেছিল, তার বর্ণনা আছে। -

> "এক অবিরাম অনুনয়ের কান্না, গলার নিচ থেকে, পেটের ভিতর থেকে উঠে আসা দীর্ঘ আর্তনাদ, 'মা, মাগো, মা একটু ফ্যান দাও মা, মা গো–ও-ও' - আপনি শুনবেন এবং শুনতেই থাকবেন।[৫৪] একটা কষ্ট আপনার গলার কাছে উঠে আসবে। খাবার মুখে আটকে যাবে। আপনি দিনের পর দিন, প্রতি ঘন্টায় প্রতি মিনিটে, আপনার নিজের দরজায়, প্রতিবেশীদের দরজায় শুনতে থাকবেন, যতক্ষণ না এই কান্না আপনার কষ্ট ও

মমতার বোধকে ভোঁতা করে দিচ্ছে, আগের মত আপনাকে আরও বিদ্ধ না করছে, আরও আহত জন্তুর ছটফটানির মত কষ্ট মনে হচ্ছে। আপনি এই বীভৎস একঘেয়ে কান্নাকে ঘৃণা করবেন। দুঃস্থরা একটা আলাদা জাত, অচেতন, অমানবিক। একজনকে তার কোলের সন্তানের জন্য এক বাটী ফ্যান দেওয়া হল। হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, মা-গো-ও তুমি আমাদের একি দিলে? আমার ছেলে মারা গেল। দেখো, মা-গো-ও। আমি তোমার কি করেছি যে, তুমি আমার বাচ্চাকে মেরে ফেললে? লজ্জিত হতভম্ব গৃহস্থ ভেঙে পড়া মহিলাকে থামাতে দুটো টাকা দিয়ে দেয়। সে জানে না মহিলাটি একটি মৃত শিশু কোলে করে দরজায় দরজায় ঘুরছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা পাবার জন্য। এরা এমনই কুৎসিত।”[৫৫]

একইভাবে বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকেও ধরা পড়েছে মন্বন্তর পীড়িত চরিত্রগুলির করুণ আর্তনাদ। এই নাটকে মূলত দু’ধরনের চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, - (১) দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারী, এবং (২) দুর্ভিক্ষ স্রষ্টা ও শোষণকারী সম্প্রদায়। নাটকের প্রথমভাগে দেখতে পাওয়া যায় প্রধান, কুঞ্জ, দয়াল, রাধিকা, বিনোদিনী প্রভৃতি চরিত্র। এক মুষ্টি অন্নের আশায় গ্রামত্যাগী ও শহরে শরণার্থী। শহরে এদের আহার ও বাসস্থানের কোনো সংস্থান হয় না। খাদ্যস্বরূপ মেলে লঙ্গরখানার দু’হাতা খিচুড়ি, তাও অনিয়মিত। ভিক্ষাই হয়ে ওঠে জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। অনাহারে অর্ধাহারে চরিত্রগুলি পীড়িত হতে থাকে।[৫৬] নাটকের চরিত্র ‘প্রধানে’র সংলাপে চরম খাদ্যাভাবের পরিচয় মেলে। -

“আমি কিন্তু একমুহুর্তের জন্যও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে।”[৫৭]

কিংবা শহরের পথে ক্ষুধার্ত প্রধান, ধনীর উৎসবোজ্জ্বল বাড়ির দিকে তাকিয়ে যখন কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা প্রার্থনা করে, -

> "কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে একমুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু।"[৫৮]

এই সংলাপে খাদ্যাভাবজনিত অন্নকষ্ট যেমন প্রকাশিত তেমন ধনী মানুষের সহানুভূতিহীনতার দিকটিও প্রতিফলিত।

খাদ্যের অভাব এবং কু-খাদ্য গ্রহণে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সচিব এল. আমেরি 'House of Commons'-এর বক্তৃতায় জানিয়ে ছিলেন, - বাংলায় সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার ১ হাজার বলে তাঁর অনুমান। তবে তার থেকেও বেশী মৃত্যু হয়েছিল বলে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। -

> "On the basis of 535 starvation death weekly for October in the Provincial Capital there should now be 10710 deaths weekly in the whole Province"[৫৯]

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন, -

> "The death role in second half of 1943 would seem to have been around 38000 per week."[৬০]

বলাবাহুল্য, দুর্ভিক্ষের ফলে হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ চলে আসে কলকাতায়। ১৯৪৩ সালের ২৫ শে নভেম্বরে কলকাতায় আগত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৫,২৪৪ জন।[৬১] অপরাংশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে ওই সময়ে একটা নমুনা সমীক্ষা করা হয়, যেখানে দেখা যায় - কলকাতায় আগত নিরন্ন মানুষের মধ্যে খেতমজুরের

সংখ্যা ৪৭.৭%, ছোট কৃষক, বর্গাদারের সংখ্যা ছিল ২৫%। এছাড়া ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশাভুক্ত মানুষ।[৬২] বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর কেবলমাত্র ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভবের কারণ ছিল না। এর সঙ্গে ১৯৪৬ সালের ১৬ ই আগষ্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ভিক্ষুক শ্রেণির বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। কারণ এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহুমানুষ সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুক শ্রেণিতে পরিণত হয়ে ছিলেন।[৬৩] অনুরূপভাবে ১৯৪৭-এর দ্বি-খন্ডিত স্বাধীনতায় জন্ম নিল অসংখ্য-অগণিত উদ্বাস্তু ভিক্ষুক শ্রেণির।[৬৪] অপরাংশে স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ছয় দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজ অবধি গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ পোক্ত হয়নি। বর্তমানে অতীতের ন্যায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকলেও ক্ষেত্রগুলি প্রায় একই রকমের। ফলে অতীতের ন্যায় একদল ধনী হয়েছে আর একদল খেতে না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

৩.৩.৩. স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরণ পর্ব (১৯৪৭-১৯৫১):

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতা অর্জন করলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেই মুহূর্তে সম্ভব হল না। দীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের হাত থেকে ভারত মুক্ত হলেও সদ্য-স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া যথেষ্ট কঠিন ছিল। উপরন্তু দেশ ভাগজনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলে ছিল। এমতাবস্থায় উদ্বাস্তু সমস্যা, যুদ্ধজনিত সমস্যা, অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এই সময়ে দেশের দারিদ্র্যতাকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছিল।[৬৫]

এই পরিস্থিতিতে দেশের সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে সমাজের সামাজিক বৈপরিত্যের দিকগুলিকে মোচনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা শুরু করে। সংবিধান বিশেষভাবে লক্ষ দিয়েছিল

সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতির মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন করতে।

দেশের সংবিধান প্রণেতা ও রাষ্ট্রনায়করা সংবিধান রচনায় মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য জনসাধারণের প্রতি রাষ্ট্রের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নিদির্ষ্ট করে দেন। সমকালীন পর্বের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মতো নানা সমস্যা দেশের দারিদ্র্যতাকে প্রবল করে তুলেছিল। ফলে এই দারিদ্র্যতা নিরসন করে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করার মধ্যে দিয়ে সকলের জন্য খাদ্য ও সকলের জন্য বাসস্থানের সুযোগ দিতে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে ভারতকে একটি একটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত করার চেষ্টা শুরু হয়। তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রেক্ষিতে খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রতী হয়।[৬৬] বিশেষত সরকার দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার মধ্য দিয়ে দেশের দারিদ্র্যতা, খাদ্যাভাব ও অনাহারক্লিষ্টতাকে দূর করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি, উপরন্তু মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ, - তিন কলঙ্কময় মনুষ্যসৃষ্ট ‘কারণ’ ভারত তথা, বাংলার গ্রামের মানুষকে শহরের ফুটপাতে নামিয়ে এনেছিল। যার ফলস্বরূপ স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে বাংলা তথা, কলকাতা শহরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায়।

৩.৩.৪. পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্ব (১৯৫১-১৯৮১):

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্ব তথা, পঞ্চাশের দশক থেকে আশি’র দশক পর্যন্ত লক্ষনীয় যে, গ্রামের ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি সম্পর্ক ও উৎপাদন সম্পর্ক – এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ কৃষক বাধ্য হয়ে ছিল কলকাতা শহরের ফুটপাতে নেমে

এসেছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে তেভাগা আন্দোলনের চাপে ‘জমিদারি ক্রয়’ বিষয়ক একটি বিল উত্থাপন করে বর্গাদারদের স্বত্ব বৈধ করে মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের কথা বলা হয়। বিলটি ১৯৫০ সালে আইনে পরিনত হয়। আবার ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ (সংশোধনী) বিল ১৯৫৪ সালে আইনি প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯৫৫-তে ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়। ফলে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমির স্বত্ব ব্যক্তির হাত থেকে সরকারের হাতে চলে যায়।[৬৭] একইভাবে ১৯৫৬ সালে আইনে আরও বেশ কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়ে ছিল, যেমন – রায়তদের আই আইনের আওতায় আনা হয়ে ছিল এবং রায়ত ও মধ্যস্বত্বভোগীদের একই নিয়মাধীন করা হয়। আরও একটি সংশোধনীতে বলা হয়, - যেসব ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তারাও স্বত্ব ফিরে পাবে। জমিদারি অধিগ্রহণ আইন আসলে কী বস্তু ছিল, তা বোঝা গেল বহু প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারদের উচ্ছেদের ফলে। তাছাড়া এ সময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে খেতমজুরের সংখ্যা। যারা ছিল মূলত ভূমিহীন এবং এরা অন্যের জমিতে কাজ করে মজুরি পেত। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, - ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা ১৫.৩ থেকে বেড়ে ২৫.৭ শতাংশ হয়ে যায়।[৬৮] ঠিক ঐ সময়েই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মন্দা দেখা দিলে খেতমজুরদের পক্ষে সেই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে হাল-বলদ-কাস্তে-ধান নিয়ে যাদের দিন কাটতো, তারা পেটের দায়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হল। তারপর ফুটপাতই হয়ে যায় তাদের আস্তানা। বস্তুত, এই সকল ভূমিহীন খেতমজুর, প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারদের বেশ কিছু অংশ শহরে কর্মসংস্থানের অভাবে এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে ভারতীয় সমাজে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা 'বহু বিবাহ' প্রথা অনেক দরিদ্র নারীর জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল; কারণ, বহুবিবাহের মধ্য দিয়ে দরিদ্র নারীরা স্বামীর আশ্রয়ে থাকতে পারতো, ফলে চরম দারিদ্র্যতার সময়েও তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা পতিতা হতে হত না। ১৯৫৬ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' প্রবর্তিত হলে বহুবিবাহের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়।[৬৯] ফলস্বরূপ, দরিদ্র মহিলা বহুবিবাহকারী স্বামীর আশ্রয়ে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই অনেক দরিদ্রপীড়িত নারীই বাধ্য হয়ে জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

আবার পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে দেশে খাদ্য সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৫৯ সাল নাগাদ খাদ্য সংকট চরমে উঠলে খোলা বাজার থেকে চাল, গম প্রভৃতির মতো অনেকগুলি অত্যাবশ্যক দ্রব্য উধাও হয়ে যায় এবং বহু গ্রামে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় কলকাতায় গ্রাম থেকে বহু হত-দরিদ্র মানুষের আগমন ঘটে। দিকে দিকে অনাহারপীড়িত মানষের আনাগোনা বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে কলকাতায় ভিক্ষুকদের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করে। শুরু হয় নানা রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আন্দোলন। দাবি ওঠে "খাদ্য চাই, খাদ্য দাও; কেউ খাবে আর কেউ খাবে না - তা হবে না, তা হবে না...।"[৭০] বলাবাহুল্য, খাদ্য সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা, কলকাতায় যে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে ছিল, তাতে বাস্তবে কলকাতায় ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের সংখ্যা কয়েকগুন বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ সময়ে কলকাতায় প্রায় ১৭ হাজারের বেশি ভিক্ষুক ও অন্যান্য অ-শ্রেণিবদ্ধ এবং অ-উৎপাদনশীল মানুষজনের সংখ্যা ছিল। যাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৫ শতাংশ নারী ছিল।[৭১]

অন্যদিকে ১৯৬০-এর দশকে ভারত পরপর দু'টো (চিন-ভারত এবং পাকিস্তান-ভারত) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে গোটা দেশের মতো বাংলাতেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। একদিকে খাদ্যাভাব ও তদ্‌জনিত নানা সমস্যা, এবং অন্যদিকে আর্থিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস শুরু করে। ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালে ভারতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 'সবুজ বিপ্লবে'র সূচনা হয়। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে খুব একটা ছিল না।[৭২] ফলত, বাংলার কৃষকরা শস্য উৎপাদনের নিরিখে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। যে কারণে বাংলায় দারিদ্র্যতা আরও বাড়তে থাকে। আর ঠিক এ সময়েই পূর্ব বঙ্গে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে এ বাংলায় শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এর থেকে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নানা রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি খাদ্য সংকট, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বহু সমস্যা উপনীত হয়। বলাবাহুল্য, ১৯৭১-এর 'মুক্তিযুদ্ধে'র সময় পূর্ব বঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমনের ফলে বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পাশাপাশি কলকাতায় দরিদ্র-অনাহারি মানুষের আনাগোনা কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়। কলকাতার ফুটপাতে প্রচুর শরণার্থী আশ্রয় নিলেন। ঐ বছরের ২৮ শে এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ১৫০ টি সরকারি ত্রাণ শিবিরে প্রায় ৩,৬২,০০০ শরণার্থী এসেছিল।[৭৩] অন্যদিকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৯৬ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে এপার বাংলায় চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গে সে সময়য় প্রতিদিন গড়ে ১৪,০০০ শরণার্থী এসেছিল।[৭৪] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ, বাদুরিয়া, বসিরহাট ও হাসনাবাদ সীমান্ত অঞ্চলের বহু মানুষ, খেতমজুর পরিবার চলে আসে কলকাতায়। এরা মূলত শিয়ালদা স্টেশনে ও স্টেশন-চত্বরকে কেন্দ্র করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, জগদীশ বসু রোড, এন্টালি, মৌলালি, হ্যারিসন রোড, বৈঠকখানা বাজার, কলেজ স্ট্রিট,

বউবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রিট, রাজাবাজারসহ মধ্য কলকাতার ফুটপাতগুলিতে আশ্রয় নেয়।[৭৫] কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এদেরকে কেন্দ্র করে কলকাতায় নানা সমস্যা আবর্তিত হয় এবং তাদের স্থায়ী বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। শিবিরগুলিতে খাদ্যের অভাব যাতে না হয়, সেজন্য সরকার পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি খাদ্য মজুতের ব্যবস্থা করে ছিল। তাছাড়া শিবিরে নারীদের নিরাপত্তা, স্যানিটেশন, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদি দেওয়া হয়। তবে সে সময়ে এদেশের বেকার সমস্যার কথা বিবেচনা করে শরণার্থীদেরকে কোনো প্রকারের কর্মসংস্থান দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এমতাবস্থায় শিবিরের শরণার্থীদের অনেকেই, বিশেষ করে যুবকরা নিজেদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই, বিড়ি তৈরি ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হলেও, দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়ে ধীরে ধীরে তারা ভিক্ষাবৃত্তির পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় এসে ভিড় জমায় কর্মসংস্থানের আশায়, কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক সময় তারা কাজের সুযোগ হারায় এবং নিরুপায় হয়ে নানা প্রান্তিক কাজে নিয়োজিত হত ঠিকই, কিন্তু দারিদ্র্যতার তাড়নায় তাদের সামনে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিল না।[৭৬]

অন্যদিকে ৭০-এর দশক থেকে বাংলার গ্রামগুলিতে একটি পরিবর্তন আসতে শুরু করে, কিন্তু বাস্তবে অনেক মৌলিক সমস্যারই সমাধান সম্ভব হয় নি। খরা-বন্যার প্রকোপ একটি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে উঠে ছিল এ সময়। এর পাশাপাশি নদী ভাঙনও ছিল। ফলে বহু জমি নদীগর্ভে চলে যেত। এই খরা-বন্যা ও নদী ভাঙনে জমি হারানোরাও বাধ্য হয় কলকাতায় চলে আসতে। এই দশকের শেষ দিকে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গার

মাধ্যমে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[৭৭] এই প্রসঙ্গে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত 'বিশ দফা কর্মসূচী' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্ম সূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান প্রকল্প (Empolyment Generation Scheme), বিভিন্ন গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্প (Community Development Scheme), কর্মের জন্য খাদ্যের প্রকল্প (Food for Work Seheme) চালুর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা (Poverty Aleviation)।[৭৮] আশা করা হয়েছিল এই সমস্ত প্রকল্প চালু হলে দেশের সার্বিক দারিদ্র্যতার হার হ্রাস পাবে। ফলত ভিক্ষাবৃত্তির প্রবনতাও হ্রাস পাবে। তদ্‌সত্ত্বেও সমাজে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলে ছিল। কারণ এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি উদ্দেশ্য মহতী হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গাফিলতি থেকে গিয়েছিল। যার ফলে খেতমজুরের সংখ্যা ও কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলে ছিল। জীবনের উপান্তে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, আবার কখনো কখনো চূড়ান্ত দেনায় জর্জরিত হয়ে ভিটে-মাটি বিক্রি করে তাদের চলে আসতে হয়েছে শহর কলকাতাতে জীবনের খোঁজে, জীবিকার আশায়।

৩.৩.৫. উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের পর্ব (১৯৮১-২০১১):

খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে উদারীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদারীকরণের ফলে শিল্পের অগ্রগতি দ্রুত হতে থাকে; ফলে এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক জনসংখ্যার অর্থনীতি ভারত ও চীনে আবাদী জমি শিল্প, বাণিজ্য ও বসবাসযোগ্য নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষি জমির পরিমান হ্রাস পেতে শুরু করে। যদিও প্রকৃতিগতভাবে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না ঠিকই, তবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেই ঘাটতি পূরণের প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। তাই বহুফসলি চাষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং প্রতি একক উৎপাদন বৃদ্ধি করে মোট বপনযোগ্য জমির

পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চলে এ সময়ে। সেক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ ও জলসেচসহ অন্যান্য কৃষি সহায়ক বিষয়গুলির উন্নয়ন দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়।

বস্তুত, আশি'র দশক থেকে সরকারি উদ্যোগে কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে এবং ১৯৯১ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে এ সময় সরকারি গ্রামীণ বিনিয়োগ ও ব্যয় আরও দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে।[৭৯] নয়া-উদারীকরণ অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল প্রতিপাদ্য সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সংকোচন-এর প্রথম আঘাত এই উৎপাদনশীল বিনিয়োগের উপর এসে পড়েছে। প্রকৃতিগতভাবে জমির অপরিবর্তনশীলতা বা হ্রাসমান যোগানের সমস্যা বহুদিনের এবং এর জন্য বহু ফসলি উৎপাদন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও বহুকালের জ্ঞাত বিষয়। তথাপি লক্ষণীয় যে, ভারত সরকার সঠিক সময়ে এই সমস্যাটিতে মনোযোগী হওয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। নব্বইয়ের দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদন অঞ্চলের বহুমুখী পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জমির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বিষয়টি খাদ্য নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে, কারণ কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি বহির্বাণিজ্যের কাছে মুক্ত হয়ে পড়েছে।[৮০] ঔপনিবেশিক শাসন এবং কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য উদারীকরণ দেখা গিয়েছিল প্রাথমিক ক্ষেত্রে। - উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি এবং দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্য ভোগের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান।

উদারনীতিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের (Liberalization, Privatization and Globalization/LPG) ফলে দেশের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তথা কৃষি অর্থনীতিতে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে একথাও সত্য। কিন্তু এই সার্বিক উন্নয়ন যে সুষম ছিল তা জোর দিয়ে বলা যায় না। LPG অর্থনীতির যুগে

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে একটা অসম উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উৎপাদকরা উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে বেকার হয়ে পড়েছে।[৮১] তাদের উতপাদনের ক্ষেত্রটি ধরে নিয়েছে কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। LPG অর্থনীতির সমস্ত সুফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠী পাশাপাশি বঞ্চিত হচ্ছে অগণিত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উৎপাদক শ্রেণি, যারা পরবর্তীকালে কর্মহীনদের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

ভিক্ষা, ভিক্ষুক, ভিক্ষাবৃত্তি ভারতের মতো মিশ্র অর্থনীতির দেশে দিনে দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। আর্থিক অনটন, অসহায় সম্বলহীন পরিবার, একেবারে অনাহারে দিন কাটানো মানুষের সংখ্যা কম নয় তাই ক্ষুধা নিবারনের জন্য অনেক সময় মানুষকে বেছে নিতে হয় ভিক্ষাবৃত্তি।[৮২] এই ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দায়ী হতেই পারে। তবে নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের অনীহা গ্রহণের জন্যও ভিক্ষাবৃত্তির পেশা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তাত্ত্বিক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এ তো গেল একেবারে সাধারণ চিত্র তবে যত সময় এগিয়ে যাচ্ছে বিশেষত ৮০’র দশক থেকে ভিক্ষাবৃত্তির রূপ অনেকটাই বদলে যাচ্ছে, পাশাপাশি বদলাচ্ছে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে আরো অন্যান্য বৃত্তি।[৮৩]

উল্লেখ্য যে, ৮০’র দশকের মাঝামাঝি থেকে কল্যাণকামী অর্থনীতির (Welfare Economy) বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে কিছু কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করলো। যার মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচনের জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত প্রকল্পের জন্য ১০০ দিনের কাজের ঘোষণা হল।[৮৪] এই প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী পরিবার পিছু বাড়ীর যতজনের কার্ড ততজনেরই ১০০ দিনের কাজ বরাদ্দ ক’রে সেই মত পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা হল। প্রতিটি রাজ্যভিত্তিক শ্রমদিবসগুলি বন্টনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত পরিকাঠামোয়

কার্যকরী করার পরিকল্পনা চালু হয়েছিল। এর মাধ্যমে জলভর প্রকল্পে পুষ্করিণী সংস্কার, বিদ্যালয়গুলির মাঠের সংস্কারসাধন, নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষের বাস্তু ভরাটের প্রকল্প, রাস্তা নির্মান, বাঁধ নির্মান, বৃক্ষরোপনের মতো কাজগুলি শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি পূর্বের গৃহহীনকে গৃহদান-আবাসন যোজনার মাধ্যমে ৮০'র দশকের প্রথমার্ধে কার্যকরী রূপ পেল।[৮৫]

এই গৃহীত ব্যবস্থাগুলি থেকে আমরা এই ধারণা করতে পারি যে, ক্রমবর্ধমান ভিক্ষাবৃত্তিকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে একুশ শতকে হয়তো অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসবে।

৩.৪. পর্যালোচনা:

ভারতের যে চারটি মহানগর আছে তার মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। এই কলকাতা মহানগরীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানকার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সর্বভারতীয় আঙ্গিকের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই নিরিখে বিচার করলে কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করলে মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় স্তরে ঐ সমস্যাগুলির যা চিত্র, তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। দারিদ্র্যতা, তথা ভিক্ষাবৃত্তির যে একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এই ব্যাধি যে সমগ্র সমাজের পক্ষে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক বিষয়, তা কলকাতার ভিক্ষাবৃত্তির চিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। যদিও এটাও দেখা গেছে যে, এই ব্যাধি বা সমস্যা নিরসণে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথাপি সমস্যার গভীরতা এবং ব্যাপ্তি এতই প্রবল যে, সরকারের এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যে এই সমস্যাকে পুরোপুরি নিরসন করা যায়নি। বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই,

কিন্তু সেই উন্নয়ন অসম হওয়ায় গণদারিদ্র্য তথা ভিক্ষাবৃত্তির প্রাবল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকাংশে। এমনকি এই সমস্যাটি এমনই এক রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, একে ভারতের একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার প্রয়াস শুরু হয়েছে বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই। একটি জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যা যা করণীয় - যেমন, বিভিন্ন জনকল্যাণকর প্রকল্প চালু করা, জাতীয় কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ, জাতীয় আবাস প্রকল্প চালু করা, ইত্যাদি নানা উদ্যোগ দ্বারা সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে চলেছে। তাই আশা করা যেতে পারে একবিংশ শতাব্দীতে এই দেশ তথা কলকাতা মহানগর এই করাল ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সার্বিক উন্নয়নের ধারাটি অব্যাহত রাখবে।

তথ্যসূত্র:

১. Paul Mosley and Arjan Verschoor: ‘Risk Attitude and the Vicious Cycle of Poverty’, *The European Journal of Development Research, 17, No. 1, (2005),* পৃ.পৃ. ৫৯-৮৮।

২. *তদেব।*

৩. *তদেব।*

৪. Hans P. Binswange: ‘Attitude Towards Risk: Experimental Measurement in Rural India’, *American Journal of Agricultural Economics, 63, No. 3, (August 1980),* পৃ.পৃ. ৩৯৫-৪০৭।

৫. *তদেব।*

৬. H. Ahamdi: ‘A study of beggar’s characteristics and attitude of people towards the phenomenon of begging in the city of Shiraz’, *Journal of Applied Sociology, 39, No. 3, (2010),* পৃ.পৃ. ১৩৫-১৪৮।

৭. Habib Ahmadi: *Theories of Social Deviations,* (Shiraz, Zar, 1998).

৮. R. K. Merton: *Social Theory and Social Structure*, (London, Free Press of Glencoe, 1957).

৯. তদেব।

১০. Parviz Piran: 'Rapid and Heterogeneous Urbanization living in Shantytown in Tehran', *Political and Economic Information, 23, (1989)*, পৃ.পৃ. ৩-১৫।

১১. R. K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, প্রাগুক্ত।

১২. M. O. Mnitp Jelili: 'Street-Begging in Cities: Cultural, Political and Socio-Economic Questions', *Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture, 13, No. 5, (2013).*

১৩. J. C. Hotten: 'The book of Vagabonds and Beggars; with a vocabulary of their language'; edited by Martin Luther in the year 1528, (London, Hotten, 1860), পৃ.পৃ. ৬৩-৬৫।

১৪. Hartley Dean (ed.): *Begging Question: Street-level Economic Activity and Social policy failure*, (Bristol, The Policy Press, 1999), পৃ. ৩১।

১৫. J. Pound: *Poverty and Vagrancy in Tudor England*, (Harlow, Longman, 1986), পৃ. vii.

১৬. Hartley Dean (ed.): *Begging Question: Street-level Economic Activity and Social Policy Failure*, প্রাগুক্ত।

১৭. P. J. Thomas: 'The Beggar – A Serious Problem in India', *The New Review, (June 1944)*, পৃ.পৃ. ৪৩৯-৪৪৮।

১৮. C. N. Zutshi: 'Beggary in India', *The Indian Review* (November 1934), পৃ.পৃ. ৭৩৯-৭৪০।

১৯. P. Sen: 'The Leper Beggars in Calcutta', *Calcutta Municipal Gazette, XXIX. No. 23*, (Calcutta: Corporation of Calcutta, June 1943), পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩৬।

২০. B. Kuppaswamy: 'Concept of Begging in Ancient Thought', *The Indian Journal of Social Work, XXXIX, No. 2, (July, 1978)*, পৃ.পৃ. ১৮৭-১৯২।

২১. *তদেব।*

২২. Subrata Kumar Acharya: Evaluation of the Institution of beggary in Ancient India', *Bhandarkar Oriental Research Institute, 69, No. ¼ (1988),* পৃ. পৃ.২৬৯-২৭৭।

২৩. *তদেব।*

২৪. B. B. Pande: 'Rights of Beggars and Vagrants', *India International Centre Quarterly,* 13, No. ¾, (1986), পৃ.পৃ. ১১৫-১৩২। http://www.jstor.org/stable/23001440

২৫. Shireen Moosvi: 'Charity Objectives and Mechanisms in Mughal India (16th and 17th Centuries)', *Proceedings of the Indian History Congress, 73, (2012),* পৃ.পৃ. ৩৩৫-৩৪৬। http://www.jstor.org/stable/44156223.

২৬. W.W Hunter: *Annals of Rural Bengal,* (London, Indian Studies, 1868) এবং *Statistical Accounts of Bengal, 11* (London, Trubner & Co., 1877).

২৭. Kali Charan Ghosh: *Famines in Bengal 1770-1943,* (Calcutta, National Council of Education, Bengal, 1944), পৃ.পৃ. ১-৩২।

২৮. *তদেব।*

২৯. N. K. Sinha: *The Economic History of Bengal, 1793-1848,* (Calcutta, Farma KLM Private Limited, 1956), পৃ. ৬৪।

৩০. J. H. Broomfield: *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-century Bengal,* (California, University of California Press, 1968), পৃ.পৃ. ২০-২১।

৩১. *আজকাল,* ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৯০।

৩২. *পুরশ্রী,* জুন সংখ্যা, ১৯৮৯।

৩৩. *পুরশ্রী,* জুন সংখ্যা, ১৯৮৯।

৩৪. *আজকাল,* ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।

৩৫. Census of India, 1876: *Report on the Census of the Town of Calcutta, 1876. Part IB, CXV* (Calcutta, Census of India, 1878).

৩৬. Jogesh C. Bagal: ‘The Beggar Problem of Calcutta: How They Tried to Solve it a Century Ago’, *Calcutta Municipal Gazette, 17,* (Calcutta, Calcutta Muninipal Corporation, 1941).

৩৭. Chunilal Bose: ‘Professional Beggary in Calcutta’, *Modern Review, XXV, No. 4 (1919),* পৃ.পৃ. ৩৮৫-৩৮৭।

৩৮. *Report of the Mendicancy Committee,* (Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1920)

৩৯. S. K. Ray: *Census of India, 1901 Vol. VII: Calcutta, Town and Suburbs, Part I* (Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1902).

৪০. L. S. S. O’Malley: *Census of India, 1911: City of Calcutta. Part I, Volume VI,* (Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1913).

৪১. *Calcutta Municipal Gazette III, No. 3,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 28 November, 1925).

৪২. A. E. Porter: Census of India, 1931: *City of Calcutta. Part I & II, Volume VI,* (Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1933).

৪৩. *Report of The Municipal Administration of Calcutta for The Year 1942-43, Part III’,* Health Officer's Report. (Calcutta, Corporation of Calcutta, 1943).

৪৪. L. S. S. O’Malley: *Census of India, 1911: City of Calcutta. Part I, Volume VI,* *প্রাগুক্ত*।

৪৫. J. C. Forrester: ‘The Beggar Problem in Calcutta’, *Calcutta Municipal Gazette, XIII,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 November, 1930), পৃ.পৃ. ৬০-৬৩।

৪৬. ‘Beggar Lepers in Calcutta, Growing Peril’, *Calcutta Municipal Gazette, X, No. 6,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 June 1929).

৪৭. E. Muir: ‘Beggar in Calcutta: A Survey’, *The Calcutta Municipal Gazetteer, XIX, No. 17, (4 March, 1934),* পৃ.পৃ. ২৫-২৮।

৪৮. A. C. Uril: ‘The Beggar Problem’, *Calcutta Municipal Gazette, XXVIII, No. 21,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 29 October 1938).

৪৯. Memorandum of the Bangiya Pradeshik Kishan Sabha: *Report of the Land Revenue Commission VI* (1944), পৃ. ৩৯।

৫০. Bengal Short of Food for One Third of Her Population: *Calcutta Municipal Gazette, XXVIII,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 May 1943).

৫১. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

৫২. W.R. Ackroaid: *The Conquest of Femine,* (London, Chatterje and Windans, 1974), পৃ. ৭৭।

৫৩. *স্বাধীনতা পত্রিকা,* ১৬ ই এপ্রিল, ১৯৪৭।

৫৪. Bhabani Bhattacharya: *So Many Hungers,* (Bombay, Joyko, 1968), পৃ. ১৭৭।

৫৫. *তদেব*।

৫৬. বিনতা রায়চৌধুরী: *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য,* (কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭), ১৮৮। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বিজন ভট্টাচার্য্য রচিত নাটক ‘নবান্ন’ (১৯৪৪)।

৫৭. *তদেব*।

৫৮. তদেব।

৫৯. *The Statesman,* 16th October, 1943.

৬০. Amartya Sen: *Poverty and Famine,* (London, Oxford University Press, 1981), পৃ. ১৯৬।

৬১. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৪৩।

৬২. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৪৩।

৬৩. *স্বাধীনতা পত্রিকা,* ১৬ ই আগস্ট, ১৯৪৬।

৬৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৭ ই জুলাই, ১৯৯৩।

৬৫. Ram Ahuja: Social Problem in India, (Jaipur, Rawat Publications, 2019), পৃ.পৃ. ৩০-৪০।

৬৬. A. Kumar: “The Welfare State System in India”, In B. Vivekanandan, N. Kurian, (eds.): *Welfare States and the Future*, (London, Palgrave Macmillan, 2005), পৃ.পৃ. ৩৬-৩৭।

৬৭. নির্মাল্যকুমার মুখোপাধ্যায়: *বাংলার ভূমিব্যবস্থা, জরিপ ও রাজস্বের আইনগত বিবর্তন,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২১), পৃ. ১৬৬।

৬৮. Saroj Kumar Basu and S. K. Bhattacharya (eds.): *Land Reforms in West Bengal: A Study on Implementation*, (London, Oxford Book Company, 1963), পৃ.পৃ. ৫৬-৫৭, ৮৮।

৬৯. Hindu Marriage Act, 1955, (May 18, 1955).

৭০. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়: ‘চল্লিশ থেকে সত্তর’, *শারদীয় অনুষ্টুপ, (কলকাতা, ১৯৮১),* পৃ. ৮১।

৭১. Moni Nag: ‘Beggar Problem in Calcutta and Its Solution’, *The Indian Journal of Social Work, 16, No. 3, (1965),* পৃ.পৃ. ২৪৩-২৫২।

৭২. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়: ‘চল্লিশ থেকে সত্তর’, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮১।

৭৩. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১।

৭৪. *তদেব*।

৭৫. অসীম মুখোপাধ্যায়: *ফুটপাতের বাসিন্দা,* (কলিকাতা, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮১ ব.), পৃ. ৩৭।

৭৬. *তদেব,* পৃ. ৪৬।

৭৭. তদেব, পৃ. ৫০।

৭৮. Editorial: ‘Forty Years Ago: 20 Point Programme’, *The Indian Express, (January 15, 2022).* https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/forty-years-ago-gandhi-thatcher-makar-sankranti-7723803/.

৭৯. অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.): *বিশ্বায়ন: ভাবনা-দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খণ্ড,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬), পৃ.পৃ. ১২১-১২২।

৮০. *তদেব,* পৃ. ১২৩।

৮১. তদেব।

৮২. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়-গুহ: *নগরোন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়: সাম্প্রতিক ভারতের চালচিত্র*, (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ.পৃ. ৩-১৩।

৮৩. *তদেব*।

৮৪. অমর্ত্য সেন, 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি', *অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭* (কলকাতা: আনন্দ, ১৮২২ ব.), ৩৭-৩৯।

৮৫. *তদেব*।

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব

বর্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে ভিক্ষুক সমস্যা অন্যতম। ভিক্ষাবৃত্তির অস্তিত্ব ভারতে প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ করা গেলেও এটিকে কোনো প্রকার আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হত না।[১] কিন্তু ভিক্ষুক সমস্যাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা না হলেও এর সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলি অস্বীকার করার উপায় নেই। অনুরূপভাবে ভিক্ষাবৃত্তি হল ব্যক্তিগত সমস্যার একটি রূপ, যেখানে ব্যক্তি নিজেকে সামাজিক পরিবেশে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির পথকে বেছে নেয়। ভিক্ষাবৃত্তি ভারতীয় সমাজের একটি ক্ষতিকারক দিক। ভারতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জন সংখ্যার প্রায় ০.১২ শতাংশ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত।[২] ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় পাঁচ লক্ষ ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গণ্য করেন, যদিও এই ভিক্ষুকদের সঙ্গে আংশিক সময়ের ভিক্ষুকদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে সংখ্যাটি প্রায় পনেরো লক্ষের বেশি। এমনকি বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভিক্ষুকদের সম্পর্কে সংবাদগুলি বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়। যেমন, 'সামান্য কিছু টাকার জন্য কুকুরের মত লড়াই করছে', 'হোটেল ও রেস্তোঁরাগুলিতে খাবার পাবার আশায় ঘুরছে', 'ফুটপাথে শুয়ে থাকা নগ্ন মহিলারা' এবং 'শিশুদের কঙ্কালসার চেহারা'র ছবি চিত্রিত করা হয় সংবাদমাধ্যমগুলির দ্বারা।[৩] ভারতবর্ষে এই সকল দৃশ্যগুলিকে খুবই কৌতুকপূর্ণ বিষয় হিসাবে তুলে ধরা হয়।

ভিক্ষাবৃত্তি হল সমাজের দারিদ্র্যতার প্রতিচ্ছবি ও সামাজিক সমস্যার রূপ। প্রকৃতপক্ষে, ভিক্ষুকদের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন প্রকার রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সকল রোগগ্রস্থ

মানুষের দ্বারা সমাজে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পাড়ে। সমাজে ভিক্ষুকদের মধ্যে একটি অংশ বিভিন্ন প্রকার ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত (যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কর্কট/ক্যান্সার ইত্যাদি), ফলে সমাজে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ভিক্ষুকরা সমাজের সৌন্দর্য্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে, কারণ তারা রাস্তা এবং ফুটপাতগুলিতে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকা হিসাবে ব্যবহার করে, যার ফলে পরিচ্ছন্নতার সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে সমাজে বিভিন্ন প্রান্তের ভিক্ষুকদের সামগ্রিক চিত্র হিসাবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ, শারীরিকভাবে দুর্বল ইত্যাদি দৃশ্য লক্ষ করা যায়।[৪] ভিক্ষুক সমস্যা বর্তমানের সমস্যা নয়। এর প্রকৃত উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ করা যায়। বর্তমান সময়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিক্ষুক শ্রেণিকেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ ভিক্ষুক শ্রেণি সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে ভিক্ষাবৃত্তিকে একটি পেশা/জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে চলেছেন। একইভাবে উত্তর-আধুনিক যুগে সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যার নিরিখে ভিক্ষাবৃত্তির ধারণা ও রূপের প্রবর্তন ঘটছে এবং সমস্যাটি গভীরতর আকার ধারণ করেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে ভিক্ষাবৃত্তির সামাজিক এবং নৈতিক দিকগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সমাজে ভিক্ষুক শ্রেণির বিবর্তনের ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২. ভিক্ষুক সমস্যার প্রকৃত কারণ:

সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সেই সমস্যার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং মূল কারণগুলিকে অনুসন্ধানের দ্বারাই সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান করা সম্ভব। ভিক্ষুক বা ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও ব্যতিক্রম নয়। যদিও ভারতবর্ষে ভিক্ষাবৃত্তিকে বিভিন্ন ঐতিসাহিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাতব্য (Charity) বা ধর্মীয় বিষয় হিসাবে গণ্য করায়, ভিক্ষুক সমস্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনো প্রকার

কারণ বিশ্লেষণ করা হয় না।[৫] বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ভিক্ষুক বা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত শ্রেণি, সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠানের যেমন নির্দিষ্ট কারণ বা যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন। ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণগুলি হল দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা স্বল্প কর্মসংস্থান এবং কৃষিক্ষেত্রের ও শিল্পে কর্মী সংকোচন ইত্যাদি। এছাড়া সামাজিক কারণ হিসাবে বিশৃঙ্খলাবদ্ধ, পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন, গ্রাম্য সম্প্রদায় ও যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন, পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় বিষয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে অসুস্থতা, শারীরিক ও মানসিক ঘাটতি, শৈশবকালের মতো প্রাকৃতিক অসহায়ত্ব ও বৃদ্ধ বয়সে অবহেলার শিকার এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, কুষ্ঠ এবং অন্যান্য অসুস্থতার মতো দীর্ঘস্থায়ী ও অসাধ্য রোগগুলিও ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা/জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করে।[৬]

তবে, যে শক্তিগুলি ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তা হল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলি। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক হল আকর্ষক শক্তি (Pull Factor) এবং অর্থনৈতিক বিষয় হল বিকর্ষক শক্তি (Push Factor)। ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু সেই বিকাশ সুষম নয় ফলত একটি দরিদ্র্য শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে যার দরিদ্র্যতম অংশটি (Poorer of the Poorest) হল ভিক্ষুক।[৭]

ভিক্ষুকদের 'ভিক্ষাবৃত্তি'কে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে কোন 'সময়' ও 'স্থানে' তারা ভিক্ষা করছে।[৮] ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভিক্ষাবৃত্তির 'সময়' (Time) ও 'স্থান' (Space)।[৯] মারে (Murray) তাঁর "Time in the Streets" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, রাস্তার গৃহহীন মানুষেদের সময়ের চক্রীয় (Cyclical)

ধারার মধ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং এটি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের সূচির সঙ্গে যুক্ত।[১০]

সমাজে সকল ভিক্ষুক শ্রেণি তাঁর নির্দিষ্ট সময় (Time), সময়কাল (Duration), দিন (Day), অঞ্চল (Region), স্থান (Time) এবং ভিক্ষাবৃত্তির কৌশলগুলি (Techniques of Beggary) গ্রহণে ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞানী, কারণ এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভিক্ষুকরা অ-ভিক্ষুকদের অধিক সহানুভূতি অর্জনের সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন।[১১] সময়, সময়কাল, দিন, অঞ্চল, স্থান এবং ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভিক্ষুক শ্রেণির প্রধান উদ্দেশ্য হল অধিক পরিমাণে উপার্জন করা যা উপরের বিষয়গুলি সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

সময় (Time) ও সময়কাল (Duration) হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। কারণ কোনও ভিক্ষুক খুব কম সময়ে অধিক আয় করতে পারে; আবার কখনও কখনও লক্ষ করা যায় যে, দীর্ঘ সময় ধরে ভিক্ষারত কোনও ব্যক্তি কম আয়ও করে থাকেন।[১২] বিশেষত, সময় (Time) ও সময়কাল (Duration) কলকাতা শহর ও শহরতলির ভিক্ষুকদের জীবনযাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ভিক্ষুক শ্রেণি ভিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে চলাফেরা করলেও তাদের বেশিরভাগই নিজের পছন্দমতো কয়েকটি লোকালয়ে যেতে পছন্দ করে। কোন স্থানে ভিক্ষা করবে সেই বিষয়টি ভিক্ষুকদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। যা ভিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলির প্রত্যাশার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভিক্ষুক শ্রেণি বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান, ব্যস্ত ফুটপাত, বাজার, মেলা প্রাঙ্গন ও সামাজিক মিলন ক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানগুলিতে ভিক্ষারত থাকেন। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলির মধ্যে কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে অধিক মাত্রায় ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালের কালীঘাট মন্দিরের অছি পরিষদের

রিপোর্টে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রায় তিন হাজার মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] বর্তমানে সংখ্যাটি প্রায় পাঁচ হাজারের মতো। মন্দির প্রাঙ্গণে যে সকল ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মন্দির সংলগ্ন ফুটপাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, কিছু কিছু ভিক্ষুক কলকাতা ও কলকাতার সংলগ্ন অঞ্চলগুলি থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদনে কলকাতায় ১৭,০০০ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।[১৪] ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর প্রধান কারণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে বহু মানুষের বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা। ১৯৯১ সালে আদমশুমারির প্রতিবেদনে কলকাতায় ১৩,৮৭০ জন[১৫] মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত ছিলেন। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, কলকাতায় ১১,৬১২ জন[১৬] ভিক্ষুক ছিল। ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণি সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে, তার প্রধান কারণ ছিল দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ।

কালীঘাট মন্দির ছাড়াও দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ ও বেলুড়মঠ মন্দির প্রাঙ্গণেও অধিক সংখ্যায় ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়। কেবলমাত্রই হিন্দু মন্দিরগুলি নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানে ভিক্ষুকদের লক্ষ করা যায়। কলকাতায় ধর্মীয় স্থানগুলি ছাড়াও অধিক সংখ্যায় ভিক্ষুক শ্রেণি লক্ষ করা যায় হাওড়া ও শিয়ালদহ রেলস্টেশনে। কারণ এই দুই রেলস্টেশন শহরের যাতায়াতের মূলকেন্দ্র। এই দুই স্থান ছাড়া কলকাতার আরো বেশ কিছু অঞ্চলগুলিতে, যেমন - ধর্মতলা বাসস্ট্যাণ্ড, পার্কস্ট্রিট, গড়িয়াহাট, গড়িয়া মোড়, যাদবপুর, টালিগঞ্জে অধিকমাত্রায় ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়। এই সকল স্থানগুলি ছাড়াও কলকাতার শিয়ালদহ রেলস্টেশনের উত্তর

ও দক্ষিণ শাখার ট্রেনগুলিতে অধিক মাত্রায় ভিক্ষুকদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভিক্ষাবৃত্তির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জনবহুল স্থান।

ভারতের সামাজিক ইতিহাসের অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে প্রান্তিক মানুষের ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণের কয়েকটি সাধারণ কারণ উপলব্ধি করা যায়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হল, - মানুষের অর্থনৈতিক দীনতা; সামাজিক অবনমন; ধর্মীয় ভেদাভেদ ও ধর্মকে অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করা; জৈবিক বা শারীরিক ও মানসিক কারণ; রাজনৈতিক কারণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়; এবং অন্যান্য বিষয়গুলি।[১৭]

৪.৩. মানুষের অর্থনৈতিক দীনতা:

ভিক্ষুক শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিক বিষয় উঠে আসে। এটি কেবলমাত্র কোনও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সমস্যা নয়; এ সমস্যা একটি সার্বজনীন সমস্যা, যা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। যদিও ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি একটি সার্বজনীন সমস্যা, তথাপি এশীয় মহাদেশে ও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রে এই সমস্যার চারিত্রিক কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।[১৮] উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তির একটি নির্দিষ্ট শিল্পশৈলী চিহ্নিত করা যায়। বিশেষত, ভারতের মতো দেশে ভিক্ষাবৃত্তি নির্ভর করে অ-ভিক্ষুক শ্রেণির বদান্যতার উপর। ভারতে বিশেষত কলকাতায় দীর্ঘস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী দুই ধরনের ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায়। ভিক্ষুক শ্রেণি ভিক্ষাবৃত্তির জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে ভিক্ষুক শ্রেণিকে তাঁদের পেশাগত তারতম্যের কারণে দুইটি মূল অংশে বিভক্ত করা হয়েছে, (১) প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত (Marginal Worker by Economic Activity), (২) প্রান্তিক

শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয় (Marginal Worker by Non-Economic Activity)।[১৯] ভিক্ষাবৃত্তি সাহায্যে অর্থকষ্ট দূরীকরণের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে এই সকল প্রান্তিক মানুষজন তাঁদের জীবন নির্বাপিত করেন।

কোনও দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক সূচককে চিহ্নিত করতে হলে, সেই দেশের অর্থনীতির বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। বিশেষত, কোনও জাতিগোষ্ঠী বা সমাজের আত্মপরিচয়ের বিষয়টি মূলত গড়ে ওঠে তার চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই।[২০] তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্থিতিশীল অর্থনীতি ছাড়া সম্ভবপর নয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক মন্দা দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায়। আর এই মন্দা অর্থনীতি কারণে সমাজে ধনী (Rich) ও দরিদ্রের (Poor) মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে থাকে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে সমাজের দরিদ্র মানুষেরা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ[২১] (Economic Marginalisation)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সমাজের দরিদ্র মানুষেরা অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণের কারণে বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে থাকেন, এদের মধ্যে কেউ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা (State Benefits) গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ প্রান্তিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (Marginal Economic Activity) যেমন, - নৈমিত্তিক কাজ (Casual Work), বা দাতব্য (Charity) প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। দরিদ্র মানুষেরা জীবনধারণের জন্যে বিভিন্ন প্রান্তিক অর্থনৈতিক উপায় অবলম্বন করেন, যা তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নয়। দারিদ্র্য (Poverty), নির্ভরতা (Dependence) এবং লজ্জার অনুভূতি (Self Respect) হল অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণের দৈনন্দিন বিষয়। আর এই অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ[২২] (Economic Marginalisation)-এর মধ্যে ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তিকে ত্বরান্বিত করে। এই ভিক্ষুকরা হচ্ছে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর দরিদ্র্যতর অংশ।

১৯০১ থেকে ১৯৬১ সময় কালে আদমশুমারির প্রতিবেদনে ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও গণিকাবৃত্তিকে অন্যান্য পেশা হিসাবে বর্ণনা করা হলেও ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তির পেশাটিকে প্রান্তিক পেশা হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং প্রান্তিক পেশাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, (১) প্রান্তিক শ্রমিক (Marginal Worker) (২) প্রান্তিক অনুৎপাদনশীল শ্রমিক (Marginal Worker by Non-Productivity)।[২৩] প্রকৃতিগত দিক থেকে কলকাতা শহরে অনুৎপাদনশীল প্রান্তিক মানুষরা জীবিকা হিসাবে যে ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করে তার তিনটি দিক লক্ষ করা যায়, (ক) প্রান্তিক মানুষের একটি অংশ যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একচেটিয়া ভাবে গ্রহণ করেন, (সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত অংশ), (খ) প্রান্তিক মানুষজনের মধ্যে কিছু সংখ্যক যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেন অর্থাৎ কিছুসময় ভিক্ষাবৃত্তি ও কিছু সময় অন্যান্য প্রান্তিক জীবিকা তাদের মূল পেশা হিসাবে থাকে এবং (গ) প্রান্তিক জীবিকা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে একই সঙ্গে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়া অংশ।[২৪]

অর্থনৈতিক দীনতা হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা যা ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভবের মুখ্য কারণ হিসাবে গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে দুটি দিক লক্ষ করা যায়, যার একদিকে রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুষম বিকাশ না হওয়া, যার পরিণতি স্বরূপ কিছু মানুষ পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেয়। বেকারত্ব, কর্মচ্যুতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদিও সমাজে ভিক্ষুক সৃষ্টি করছে। এই দুই বিভাজনের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এটা মূলত সংঘবদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষাবৃত্তির অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, - দারিদ্র্যতা; কর্মহীন বা আংশিক কর্মসংস্থান; ভূমিহীনতা বা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক; এবং লাভজনক কার্যক্রম।[২৫]

৪.৩.১. দারিদ্র্যতা:

দারিদ্র্যতা হল এমন একটি সমস্যা যা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। কারণ ভারতের মোট জনসংখ্যার ২৬.১% মানুষ রয়েছে, যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।[২৬] বস্তুত বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান অনুযায়ী ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দরিদ্র, যাদের প্রাত্যহিক আয় ১.২৫ আমেরিকান ডলার (USD) বা ৬৫ টাকার মতো। এছাড়া ভারতে দারিদ্র্যতা ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তির জন্য আরো অনেক দিক লক্ষ করা যায়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১ বিলিয়নের উপর মানুষ দারিদ্র্যতার স্বীকার।[২৭] ভারতের দরিদ্র মানুষের মধ্যে দলিত, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও মুসলিম মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমান। শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা অনুযায়ী ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহতম দেশ।[২৮] অপরদিকে ভারতের মধ্যে কলকাতা হল এমন একটি শহর, যেখানে গৃহহীন, ভবঘুরে, ফুটপাতবাসী জনসংখ্যা অধিক লক্ষনীয়। এই সকল ফুটপাতবাসীদের মধ্যে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার মানুষেরা। ফলে সমাজের এই সকল দরিদ্র মানুষের কাছে শেষ সম্বল হয়ে ওঠে ভিক্ষাবৃত্তি।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম বিষয় হল দারিদ্র্যতা। দারিদ্র্যতার সমস্যাটি কেবলমাত্র কোনো একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত, স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির একটি সাধারণ সমস্যা। ২০১১ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনুসারে প্রায় দুই হাজার মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে, যা আর্থ-সামাজিক মন্দার ফলশ্রুতি। যদিও দারিদ্র্যতার সমস্যা কেবল আর্থ-সামাজিক নয়, এটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গেও যুক্ত। যা স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যতার বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। এটি কেবল দরিদ্র হওয়ায়

মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনই নয়, উপরন্তু এটি মানবিক মর্যাদার লঙ্ঘন বলা চলে এবং একইভাবে এটি সাম্যের অধিকার, সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার এবং খাদ্য, স্বাস্থ্য, আবাসন ও শিক্ষার মতো মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন।[২৯] স্বাধীনতার প্রায় সত্তর বছর পরেও দারিদ্র্যতার সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গড়ে তুলেও এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয়নি। সমাজে দারিদ্র্যতার বিভিন্ন সমস্যাগুলির মধ্যে ভিক্ষুক সমস্যাও একটি।

দারিদ্র্যতার ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে অসুস্থতা, ব্যক্তিগত সমস্যা, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্য দিয়ে। যে কোন দেশের দারিদ্র্যতার মাপকাঠি বিচার করা হয় সাধারণত জনগণের গড় মাথাপিছু আয়ের দ্বারা এবং ভারতবর্ষের জাতীয় গড় মাথাপিছু আয় বিশ্বের বেশ কিছু উন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে ধারাবাহিকভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ সত্ত্বেও দারিদ্র্যতার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩০] একইভাবে ভারতে ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার কারণেই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্যতার কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনও ঘটে চলেছে, এই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন, ভূমিহীন শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, অ-সংগঠিত শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক জীবিকায় যুক্ত মানুষেরা ক্রমশ কর্মহীন বা জীবিকা থেকে অপসারণের ফলে সমাজে দারিদ্র্যতা ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। অনুরূপভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের দ্বারা শহরাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ও জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার চিত্র সরকারি নথি ও সমাজবিজ্ঞানীদের লেখনীতে ফুটে ওঠে।[৩১] শিল্পায়নের দ্বারা গ্রামীন অর্থনীতিতেও ক্রমশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সমাজে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতার কারণে গ্রামাঞ্চলের

ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক শহরাঞ্চলে অভিগমন করে জীবন ও জীবিকার তাগিদে। ফলস্বরূপ শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত, শহরাঞ্চলের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের বেকারত্ব, আংশিক সময়ের কর্মসংস্থান, বার্ধক্য, রোগগ্রস্থ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের দ্বারা দ্রুত পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি কেবলমাত্র ধনী ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ। ফলস্বরূপ, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনাগুলি সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য তৈরি করে, যা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র্য জনগণের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ ও অপরাধীকরণের বিষয়টিকে উৎসাহিত করে।[৩২] স্বাভাবিক ভাবেই দারিদ্র্যতার পরিমান বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ভিক্ষুক শ্রেণির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে দারিদ্র্যতার কারণে উৎপাদনশীলতা এবং জীবিকা নির্বাহের নির্দিষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা বজায় রাখা প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র (Democracy) প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশও। ভারতে জনসংখ্যার অধিকমাত্রার কারণে জনসংখ্যার একটি বিশাল অনুপাত দরিদ্র (Poor) ও দারিদ্র্যসীমার (Porverty line) নীচে বসবাস করেন।[৩৩] ২০০২ সালে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের ৪০% জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন এবং তারা ন্যূনতম জীবিকা থেকেও বঞ্চিত। বাস্তবক্ষেত্রে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীগুলি তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তথাপি, ভারতবর্ষের শহরাঞ্চল গুলির জনসংখ্যার

ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের কারণে অন্যান্য সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন।[৩৪] সমাজের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিতে দারিদ্র্যতার অন্যান্য রূপগুলিতেও প্রকাশিত হয়। অতএব, গৃহহীন, ফুটপাতের বাসিন্দা, ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং সর্বোপরি সামাজিক বৈষম্য এবং দরিদ্র্য বা ভিক্ষুকদের জীবন ও জীবিকার মূল ধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। ফলে দারিদ্র্যতার কারণে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা উদ্ভূত হয়।[৩৫] ভিক্ষাবৃত্তি শব্দটিও প্রায়শই নিঃস্ব বা হস্তান্তরিত আয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে, কার্ল মার্কস ভবঘুরে, বেকার ও ভিক্ষুকদের থেকে কর্মহীনদের পৃথকীকরণ করেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন প্রকার প্রান্তিক পেশাগুলির থেকে ভিক্ষাবৃত্তি হল সবচেয়ে সাধারণ পেশা। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সমাজে হস্তান্তরিত উপার্জন হিসাবে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের সাথে জড়িত উপহারের যথাযথ বিষয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। দারিদ্র্য (Destitution), দারিদ্র্যতা (Poverty) এবং দরিদ্র (Poor) ইত্যাদি বিষয়গুলির চূড়ান্ত রূপ হল ভিক্ষাবৃত্তি। দরিদ্র (Poor) ও দারিদ্র্যতা (Poverty) শব্দ দুটি আন্তঃসম্পর্কিত ঘটনা এবং এইভাবে শব্দ দুটিকে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের প্রয়োজন।[৩৬]

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পর্যায়ে ভারতের নানা সমস্যার পাশাপাশি দারিদ্র্যতার সমস্যা মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যতা দূরীকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচি এবং প্রকল্প চালু করেছিল যেমন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। -ভারত সরকার ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে এবং একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতিতে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করেন। একইভাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধার্থে, ১৯৬২ সালে ১৪ টি ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭২ সালে কয়লাখনি জাতীয়করণের পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন বেসরকারী লোহা ও ইস্পাত সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ নেয়

এবং খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসাও সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।[৩৭] অনুরূপভাবে, ১৯৭৫-১৯৭৮ সময়কালে সমাজের দুর্বল অংশের অপসারণ ('গরিবি হঠাও') এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০ দফা কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। 'জওহর রোজগার যোজনা (JRY) ১৯৮৯', 'প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (PMRY), ১৯৯৩', 'পল্লী কর্মসংস্থান উৎপাদন প্রোগ্রাম (REGP), ১৯৯৫', 'প্রধানমন্ত্রীর গ্রামোদয় যোজনা (PMGY), ২০০০'-এর মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অন্যান্য কর্মসূচি ছিল। 'সম্পূর্ন গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY), ২০০১', 'ভালমাকী আম্বেদকর আবাস যোজনা (VAMBAY), ২০০১', 'জাতীয় খাদ্য কর্ম কর্মসূচী (NFWP), ২০০৪' এবং 'ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY), ২০০৪'-এর মতো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩৮] যদিও স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকণের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণের সত্ত্বেও স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ হিসাবে রয়ে গেছে। দারিদ্র্যতা দূরীকরণে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় প্রান্তিক মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে চলেছেন।

সুতরাং, সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ দ্বারা দারিদ্র্যতার প্রকৃত ব্যবস্থাপনামূলক ও কাঠামোগত কারণগুলির দূরীকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকায় যর্থাথ ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। ভারতে নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন রাজ্যের নয়া-উদারনীতিবাদের পুনর্গঠনের ফলে সমাজের ভবঘুরে ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল। এটি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, দীর্ঘকাল ধরে ভবঘুরেদের সম্মোহনের দ্বারা দারিদ্র্যতা ও শোষণের কাঠামোগত কারণগুলির সমাধান করা প্রয়োজন, ফলে রাজ্যকে তার অর্থনৈতিক নীতিগুলি এবং অগ্রাধিকারগুলিকে মৌলিকভাবে পুনরায় পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়।[৩৯] ঔপনিবেশিকতার প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তির ধারণাটির পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক অপরাধ

হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সামাজিক বৈধতা বজায় রাখার প্রয়োজনে প্রচলিত অর্থনৈতিক দর্শনের বিশ্লেষণ দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষতিকারক প্রভাবগুলির উপর দৃষ্টিপাত করা হয়ে থাকে। স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক নীতিগুলির আমূল পরিবর্তন দ্বারা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা রাষ্ট্রকে তার দমনমূলক নীতি অব্যাহত রাখতে বাধ্য করছে। যা উদারনৈতিক বাজার ব্যবস্থার প্রচলন দ্বারা অধিক মাত্রায় লক্ষনীয়। এটি বিশেষত অস্বাভাবিক যে, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণের দ্বারা রাষ্ট্রের লালিত মূল্যবোধ ও আদর্শকে মূলত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সাংবিধানিক উপায়ে বিভিন্ন অপরাধী, ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের সামাজিক বর্জনের শিকার হতে হচ্ছে। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরের সমস্যাটি মূলত বেকারত্ব এবং বৈষম্যের ফলাফল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।[৪০] সমস্যাটির মুখ্য কারণ কেবলমাত্র অপরাধ প্রবণতাই নয়, বরং এই সমস্যার কারণগুলিকে প্রতিরোধকল্পে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারগুলিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৪.৩.২. বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব:

ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভবের অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে দারিদ্র্যতার (Poverty) বিষয়টি যেমন যুক্ত, তেমনি ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাবও যথার্থ পরিমান দায়ী, কারণ দারিদ্র্যসীমার উপর যে সকল প্রান্তিক মানুষেরা জীবনযাপন করেন, তারা সকলেই ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত এমনটি নাও হতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার উপর বসবাসকারী মানুষেরা বেকারত্ব, স্বল্প কর্মসংস্থান ও প্রান্তিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়। বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের অভাব ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ প্রধানত কৃষি শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক,

প্রান্তিক কৃষক ও প্রান্তিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের দমনমূলক মজুরি কাঠামোর কারণে দীর্ঘ সময়কাল ধরে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ছিলেন।[৪১] এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা জীবিকা ও জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করেন অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। অনুরূপভাবে, এই সকল প্রান্তিক জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষের এক বৃহৎ অংশ গ্রামে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে শহরাঞ্চলে জীবিকার আশায় অভিবাসিত হয়ে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভারতবর্ষের বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন, “The numbers who have no other employment than agriculture are greatly in excess of what is really required for the thorough cultivation of land”.[৪২] ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের পর্যবেক্ষণটিকে ১৯৩১ সালে ভারতের শ্রম কমিশন দ্বারা পুনরুদ্ধার করে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, - “Over large parts of India, the number of persons on the land is much greater than the number required to cultivate it and appreciably in excess of the number it can comfortably support. In most areas pressure on the land has been increasing steadily for a long time and a rise in the general standard of living has made this pressure more acutely felt.”[৪৩] বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অভিজাত শ্রেণির বিকাশ সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের পক্ষে ক্ষতিকারক হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ার ফলে সমাজে সম্মিলিত উদ্যোগের অভাব দেখা দিয়েছে; এবং সরকারি সংরক্ষণের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে অসাম্যতা; গ্রামীণ কুটির শিল্পের ধ্বংসসাধন; অনিয়ন্ত্রিত জমি হস্তান্তরের মতো বিষয়গুলি ভারতীয় অর্থনীতির এক বাস্তবতা হিসেবে দেখা দিয়েছে।[৪৪]

শিল্প ও বাণিজ্যে কেন্দ্রের কর্মসংস্থানের উদ্দ্যেশ্যে ভারতীয় গ্রামীণ জনসংখ্যার বিপুল অংশ ক্রমশ গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে চলেছে। আর এই অভিবাসনের মূল ধারা গ্রামাঞ্চলে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অভিজাত শ্রেণির শোষণের হাত থেকে মুক্তির কারণে তৈরি হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দশকের সামাজিক চিত্রকে লক্ষ করলে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের অভিবাসনের বিষয়টি ফুটে ওঠে। একইভাবে শ্রম দপ্তরের প্রতিবেদনেও এই অভিবাসনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৭২-১৮৮১ এবং ১৮৯১-১৯০০ সালের জনগণনায় গ্রামাঞ্চলের অভিবাসনের বিষয়টিও লক্ষ করা যায়। ১৯৪৩ সালে শ্রম তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ১৮৭২-১৯৩৪ সালের মধ্যে কারখানায় শ্রমিক শ্রেণির জনসংখ্যা ৩১৬৮১৬ থেকে বেড়ে ২৪৩৬৩১২ হয়ে গিয়েছিল। শহরাঞ্চলের কারখানাগুলিতে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির সূচকটিকে সারণিতে দ্রষ্টব্য।[৪৫]

সারণি – ৪.১: কারখানা এবং শ্রমিকের পরিসংখ্যান (১৮৯২-১৯৪৩)

ক্রমিক নং	বর্ষ	কারখানার সংখ্যা	পুরুষ শ্রমিক	নারী শ্রমিক	শিশু শ্রমিক	মোট শ্রমিক
১	১৮৯২	৬৫৬	২৫৪৩৩৬	৪৩৫৯২	১৮৮৮৮	৩১৬৮১৬
২	১৯১২	২৭১০	৮৮৫৮২২	১৩০০২৫	৫৩৭৯৬	৮৬৯৬৪৩
৩	১৯২৩	৫৯৮৫	১১৩৫০৮	২২১০৪৫	৭৪৬২০	১৪০৯১৭৩
৪	১৯৩৩	৮৪৫২	১১৬৭২৮৪	২১৬৮১৭	১৯০৯১	১৪০৩২১২
৫	১৯৩৯	১০৪৬৬	১৪৯৮২১৮	২৪৩৫১৬	৯৪০৩	১৭৫১১৩৭
৬	১৯৪৩	১৩২০৯	২১৫৮৩১৯	২৬৫৫০৯	১২৪৮৪	২৪৩৬৩১২

সূত্র: Pravakar Sen: ‘Supply of Industrial Labour in India, 1892-1943’, *The Economic Weekly* (June 2, 1956), পৃ.পৃ. ৬৩৮-৬৪১।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ভারতে নগরায়ণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে। ফলত গ্রাম থেকে নগরে পরিযায়ী মানুষের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই নবনির্মিত নগরগুলি বাড়তি পরিযায়ী মানুষদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারছে না। এই পরিযায়ী মানুষগুলি নগরের কিছু আকর্ষিত কারণে (Pull Factor) নগর পরিত্যাগ করছে না এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাসের চেষ্টা করছে। তারা কর্মসংস্থানের জন্য ইতস্তত বিচরণ করছে ও বসতি নির্মান করছে।[৪৬] এর জন্য নগরে এক একটি আইনগত সমস্যা তৈরী হচ্ছে, যা নগরের অন্যান্য অধিবাসীদের পৌর সুযোগ-সুবিধার গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতেও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে। এবং এই উৎপাদন সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষে যাচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণির প্রতি বঞ্চনার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তারা সেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক কর্মচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। কার্ল মার্কস তাঁর 'Das Kapital: A Critique of Political Economy' গ্রন্থে বর্ণনায় ভিক্ষাবৃত্তি ও অনুরূপ সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন,--- "The proletariat created by breaking up of the bands of feudal retainers and by the forcible expropriation of the people from the soil, this "free" proletariat could not possibly be absorbed by the nascent manufacturers as fast as it was thrown upon the world. On the other hand, these men, suddenly dragged from their wonted mode of life, could not as suddenly adapt themselves to the discipline of their new condition. They were turned en masse into beggars, robbers, vagabonds."[৪৭]

মার্কস প্রান্তিকীকরণ ও শ্রমজীবী শ্রেণি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন যে, এই সকল শ্রেণির শেষ পর্যায় হল ভিক্ষুক ও অপরাধীদের দলে যোগ দেওয়া। ডেভিড গ্রিনবার্গের ভাষায়, - "Marx identifies four different forms of relative surplus population. The

"floating" form consists of workers who are hired and fired according to the requirements of business. Employees who lose their jobs when a factory is relocated would be an example. This category grows in number as capitalism expands, but not in proportion to the growth of production where there is an absolute reduction in the number of workers employed. There is the "latent" form. The transformation of agricultural population into an urban or manufacturing proletariat depends on the existence of a "latent surplus population" in the countryside- "latent" because it may only move when the alternative employment open up. The "stagnant" from consists of very low-paid and irregularly employed workers often in decaying sectors of the economy. Unskilled day labourers are an example. This form is "self-reproaching and self-perpetuating" in part because of an extra-ordinary high birth rate, but also because it recruits, redundant workers from other sectors of the economy. Lastly, there are the paupers. This form includes those who are unable to work (the elderly, the disabled, the sick, and the orphan), those who do not adapt to industrial labour discipline and a "dangerous class of criminals."[৪৮]

৪.৩.৩. ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক:

ভারতবর্ষে ভিক্ষাবৃত্তির অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে আরেকটি সাধারণ কারণ হল গ্রামাঞ্চলে কৃষিজ কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলগুলিতে কয়েক দশক ধরে ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ থেকে বঞ্চিত ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এই সকল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা সকল সময় বিভিন্ন প্রকারের শিল্পকর্মের সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন বা শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন

এমনটি নয়। ফলে এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে জীবিকার প্রয়োজনে অভিবাসিত হয়ে থাকেন, কিন্তু শহরাঞ্চলের জীবিকার সাথে নিজেদের নিয়োজিত করতে না পেরে তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রায়শই জীবিকা হিসাবে নির্বাহ করেন।

ভিক্ষাবৃত্তির অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ক্রমবর্ধমান ভূমি থেকে উচ্ছেদ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভূমি সংস্কার কর্মসূচিতে অগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গ। বিগত চার দশক ধরে এ রাজ্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত জন্ম নিয়ন্ত্রন আইন না থাকায় কৃষক পরিবারগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে বন্টিত জমি বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছে। ফলে কৃষি একটি অ-লাভজনক পেশায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এই কারণেই কৃষক পরিবারগুলির একটি বৃহৎ অংশ কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা বাধ্য হচ্ছে কর্মসংস্থানের তাগিদে নগরাঞ্চলে চলে আসতে।[৪৯] যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণের বিষয়টি শুধুমাত্র কলকাতাকে কেন্দ্র করেই, তাই এই সকল মানুষেরা কলকাতাতেই অভিবাসিত হচ্ছেন। ফলে এই নগরে এই সকল সামাজিক পরিবহণ ও জনবহুল স্থানগুলি (বাস, ট্রেন, ট্রাম এবং ট্রাফিক সিগন্যাল, বাজার ও মন্দির ইত্যাদি স্থান) অভিবাসিত মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির উপযুক্ত কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

৪.৩.৪. লাভজনক কার্যক্রম:

বিশ্বায়নের কারণে আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে ভিক্ষাবৃত্তিকে সমাজের কিছু অংশ লাভজনক জীবিকা বা কার্যক্রম এবং পর্যাপ্ত আয়ের কারণে কর্মসংস্থান বা কায়িক শ্রমের পরিবর্তে একে একটি পেশায় পরিণত করেছেন। বিশ্বায়ন (Globalization) ও নয়া উদারনীতিবাদের (Neo-liberalism) ফলে ভিক্ষাবৃত্তি বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে লাভজনক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে; ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যদিকে এই

কার্যক্রমের প্রয়োজনে সমাজের দরিদ্র্য (Poor) পরিবারের শিশুদের সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৫০] এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র্য পরিবারের শিশুদের পাচার (Trafficking) করে বিভিন্ন বড় শহরগুলিতে এই সকল শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়ে। এ সম্পর্কে ড. আর. কে. মুখার্জি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বিভিন্ন দুষ্ট চক্রগুলি শিশুদের প্রশিক্ষণ দেয় কীভাবে এবং কোথায় ভিক্ষা করতে হবে, শিশুদের প্রতিপালক হিসাবে কাজ করে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তায় পথিকদের থেকে খুব সহজেই সহানুভূতি আদায় করতে পারে। পুঁজিবাদী এবং বিপুল সংখ্যক মধ্যস্থতাকারী (যারা আবার ঠিকাদারের ভূমিকাও পালন করতো) রয়েছে, যার ব্যবসা-বাণিজ্য বহু দূরবর্তী গ্রাম ও গ্রামে বিস্তৃত ছিল। তারা ভিক্ষুকদের কিছু বস্তি বা গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করে এবং প্রতিদিন তাদের খাবার, নগদ বা পুরনো কাপড় সরবরাহ করে। বিনিময়ে ভিক্ষুকদের দ্বারা সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশ ঠিকাদাররা নিজেদের মজুরি হিসেবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংগ্রহ করতো।[৫১]

S. Bahadur তাঁর 'Kidnapping of Children for the Purpose of Begging' প্রবন্ধে পাচারকৃত শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তির পেশাতে উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ ও অমানবিক অত্যাচারের বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। ভারতের সমস্ত রাজ্যে পেশাদার অপহরণকারী দল রয়েছে। যারা দরিদ্র পিতা-মাতার হাত থেকে বাচ্চাদের অপহরণ বা প্রলোভন দেখিয়ে, এমনকি তাদের প্রতি অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করে, যাতে তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। S. Bahadur আরও বলেছেন, - "A study made by the sub-committee disclosed a most disturbing state of affairs. It appeared that gangs of professional kidnappers existed practically in all states of India. They kidnap or entice away children from the possession of their parents and

then commit inhuman cruelties on them to make them into objects of pity so that they could be exploited for the purpose of beggary in public places. Many specific cases were mentioned by the sub-committee in its report and a typical case was a kidnapper, Karamat Ali, who with his associates lifted a 3 year old girl from Katihar Railway Station in Bihar, broke both her legs and arms and blinded her by poking fingers into eyes, thus converting her into an object of pity so that they could exploit the peoples sentiments and collect charities."[৫১]

৪.৪. সামাজিক অবনমন:

সামাজিক অবনমনকে ভিক্ষাবৃত্তির অন্যতম বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থনীতি হল এমন একটি দিকনির্দেশক যা সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করে। অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে সামাজিক বৈষম্য তথা সামাজিক বৈপরীত্যের জন্ম দেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একজন বিত্তশালী ব্যক্তির পরিবারে কোনো সদস্যকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে না হলেও, একটি নিম্নবিত্ত পরিবারে এইরকম সদস্যকে ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য হতে হয়। অনুরূপভাবে, সমাজে কুষ্ঠরোগী, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, এইডস্ আক্রান্ত প্রভৃতি মানুষদের ভিক্ষাবৃত্তি দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে। আর এই সামাজিক অবনমনের ক্ষেত্রে অসুস্থতা বা রোগগ্রস্থতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, শৈশব ও বার্ধক্য অবস্থার মতো অসহায়ত্বের বিষয়গুলি সমাজে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভবের পথকে প্রশস্ত করেছে।[৫২]

ভিক্ষুক বা ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের অর্থনৈতিক কারণের মতো সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলিও ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যাগুলি ক্রমশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জটিল আকার ধারণ করেছে। ফলে সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ দ্বারা প্রান্তিক মানুষের ভিক্ষুকে রূপান্তরিত

হওয়ার কারণ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন মতামতের অবতারণা করেছেন। সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের ক্ষেত্রে সামাজিক অবনমন হিসাবে বেশ কয়েকটি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল,- (ক) যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন, (খ) পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের বিকৃতি, (গ) সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য/বিকৃতি, (ঘ) সামাজিক অবক্ষয়, (ঙ) সামাজিক রীতি-নীতি, (চ) পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং (ছ) অনাথ ইত্যাদি।[৫৩]

সাধারণত, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সমাজের সামাজিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। ফলে সামাজিক কারণে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে সমাজের ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। -

৪.৪.১. যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন:

ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার পশ্চাতে যেমন সার্বিক অর্থনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পারিবারিক অর্থনৈতিক সংকটও তাঁর সদস্যদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙনের ফলে দেখা যায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা সদস্যদের অনেকেই বিভিন্ন প্রান্তিক পেশাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিচ্ছেন। সারণি-৪.২ থেকে আমরা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারবো। সারণিতে উল্লেখিত ভিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির তিন প্রজন্মের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বিষয়টি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙনের ফলে উত্তর প্রজন্ম ক্রমশই প্রান্তিক পেশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করছেন। অনেক সময় লক্ষ করা যায় যে, উত্তর-প্রজন্ম প্রান্তিক পেশার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। একই

সঙ্গে ভিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির পারিবারিক পেশাগত বিবর্তনের বিষয়টিও ওঠে আসে, কারণ পরিবার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার ভাঙ্গতে থাকে ও উত্তর-প্রজন্ম প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হতে থাকে, তাই ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে পেশাগত গতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৫৪]

সারণি-৪.২: ভিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তির তিন প্রজন্মের পেশা ও উত্তরদাতার পূর্বতন পেশা

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি	পরিবারের সংখ্যা	উত্তরদাতার পিতামহের পেশা	উত্তরদাতার পিতার পেশা	উত্তরদাতার পেশা
উত্তরদাতা ১	পৌন্ড্র	৪	কৃষক ও কৃষিশ্রমিক	কৃষক ও কৃষিশ্রমিক	রিকশা চালক ও হকারি
উত্তরদাতা ২	মুচি	৬	চর্মকার, কৃষিশ্রমিক	চর্মকার ও কৃষিশ্রমিক	চর্মকার ও রাজমিস্ত্রি
উত্তরদাতা ৩	বাগদি	৮	জেলে	জেলে ও কৃষিশ্রমিক	রিকশা চালক
উত্তরদাতা ৪	যাদব	৩	জানি না	কলকারখানার শ্রমিক	মুটে
উত্তরদাতা ৫	নমঃশূদ্র	৬	কৃষক	কৃষিশ্রমিক	হকারি
উত্তরদাতা ৬	ব্রাহ্মণ	১	পুরোহিত	পুরোহিত	পুরোহিত

সূত্র: প্রসেনজিৎ নস্কর: *কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্র সমীক্ষার থেকে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে সারণিটি তৈরি করা হয়েছে,* (কলকাতা, ১২.০৬.২০১৮ থেকে ২০.১০.২০২০ সময়কালীন পর্বের ক্ষেত্র সমীক্ষা)।

কলকাতা শহরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগণের কিছু অংশ ভিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি বিভিন্ন রকম প্রান্তিক জীবিকাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন যেমন, রিকশা চালক, মুটে, গৃহ পরিচারিকা, সবজি বিক্রেতা ইত্যাদি। গ্রাম থেকে দরিদ্র মানুষেরা কর্মসংস্থানের কারণে শহরাঞ্চলে আশায় প্রথমত জীবিকা অর্জনের কোনও বিকল্প পথ না থাকায় তারা প্রান্তিক পেশা ও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই সকল দরিদ্র মানুষের কিছু অংশ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত অর্থের

সাহায্যে বিভিন্ন প্রান্তিক জীবিকা গ্রহণ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে বিভিন্ন প্রান্তিক পেশাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়, কেউ কেউ আবার পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতেও ফিরে যায়।

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভিক্ষুক শ্রেণির মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক মানুষজনরা দীর্ঘ সময় ধরে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে লক্ষ করা যায়, ভিক্ষুক শ্রেণির বেশ কিছু অংশ যারা ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে সমাজের প্রান্তিক জীবিকাকে ‘পেশা’ হিসাবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু জন্মগত ভিক্ষুকদের মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কাজ কর্মের (চুরি ও কেপমারি ইত্যাদি) সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া পরিবার-পরিজনদের থেকে পরিত্যক্ত হয়ে মহিলা ভিক্ষুকদের একটা অংশকে কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য গণিকা বৃত্তি/দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষুক শ্রেণির কাছে প্রাথমিক জীবিকা হলেও সমাজের একটা বড় অংশ বিভিন্ন রকম প্রান্তিক জীবিকাকে জীবনধারণের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। আবার ভিক্ষুকদের একটা অংশ ভিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি বিভিন্ন রকম প্রান্তিক পেশার সঙ্গেও যুক্ত থাকেন। এক্ষেত্রে তারা দিনের কোনও এক সময় প্রান্তিক কাজে নিয়োজিত থাকেন, আর অবসর সময়ে অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য ভিক্ষা করেন। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতার যাদবপুর রেলস্টেশন ও ৮বি বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন এলাকায় সকালে চায়ের দোকানে কর্মরত ব্যক্তি অন্য সময়ে, বিশেষত দুপুর ও সন্ধ্যাবেলাতে ভিক্ষা করছে কেবলমাত্র পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য। সুতরাং ভিক্ষুক শ্রেণির পেশাগত বিবর্তনের বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে বলা যায় যে, ভিক্ষুক পরিবারের সকল সদস্যরা সর্বদা জীবিকার মাধ্যম হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে

অনুসরণ করেন, এমনটি নয়। এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা তাদের সঞ্চিত পুঁজির সাহায্যে বিকল্প পেশা গ্রহণের চেষ্টাও করে থাকে।

যে কোন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। ফলে সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনের মূল কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকে মুখ্য কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের দ্বারা মূলত সমাজ ব্যবস্থার এই পরিবর্তনগুলি আসতে শুরু করে। তাছাড়া যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন, পরিবারের কর্তৃত্বের পরিবর্তন, পরিবারে নারীর অবস্থান বদল, পরিবারের সদস্যদের স্বাধীনতা এবং পরিবারের দায়-দায়িত্ব হ্রাস ইত্যাদির মতো পারিবারিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী।[৫৫]

ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা সামাজিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা বা অন্যান্য কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে যৌথ পরিবার থেকে যথেষ্ট পরিমান সমর্থন পেয়ে থাকেন। যৌথ পরিবার ব্যবস্থার দ্বারা পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে যথাযথভাবে বিচার করা হয়, যার সাহায্যে পরিবারের সদস্যদের কোনো প্রকার সমস্যায় পড়তে হয় না। যদিও বর্তমান সময়ে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও নগরায়ণের জন্য সমাজের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলস্বরূপ অধিক মাত্রায় গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হওয়া, ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কাঠামোয় দুর্বলতা এবং স্বতন্ত্র পরিবার ব্যবস্থার উত্থানের কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গনের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। এই যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গনের দ্বারা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ

ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবনে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে গ্রহণ করে থাকেন। ফলে সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন ভিক্ষাবৃত্তির গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়।[৫৬] ভারতীয় সমাজের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯৯৩ সালে শ্রম তদন্ত কমিটি (Labour Investigation Committee) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে: "গ্রাম, যৌথ পরিবার, বর্ণ ও অন্যান্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান গুলি শ্রমজীবী মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষার অন্যতম কারণ ছিল, বর্তমান সময়ে এই ব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে ভেঙে পড়ছে। একইসঙ্গে, শহরাঞ্চলগুলিতে এই সকল প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যথার্থ প্রশ্নাতীত"।[৫৭]

অতীতে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্যদের সকল প্রকার সাহায্য করা হত, কিন্তু বর্তমান সময়ে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গনের কারণে এই জাতীয় ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের পরিবার থেকে কোনো প্রকার সহায়তা না পাওয়ার ফলে তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা বা জীবন ধারণের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে।

৪.৪.২. পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের বিকৃতি:

পরিবার হল সমাজের প্রাথমিক স্তম্ভ, যার ওপর নির্ভর করে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ আবর্তিত হয়। সেক্ষেত্রে অনেক সময়ই পরিবারের নানা আচার-অনুষ্ঠান মানুষের দারিদ্র্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায়, গৃহদেবতার পূজা, পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম, কন্যার বিবাহদান, ইত্যাদির নামে বহু মানুষ রাস্তা-ঘাটে, এমনকি বাড়ি-বাড়ি গিয়েও ভিক্ষা চাইতে থাকে। একইভাবে যেসকল শিশুরা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাদের বেশিরভাগেরই কোনো প্রকার পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই ধরণের ভিক্ষার কারণগুলি অনেকক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কারণগুলিকে ব্যবহার করে ভিক্ষাবৃত্তির কাজ দীর্ঘদিন

ধরে চালাতে থাকেন বহু কৃপাপ্রার্থী মানুষজন। যা সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যার অন্যতম একটি দিক।

৪.৪.৩. সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য:

নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কারণে শহরাঞ্চলগুলিতে জীবিকার প্রয়োজনে গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি শ্রমিক ও অ-সংগঠিত শ্রমিকের একটি বৃহৎ অংশ শহরে অভিবাসিত হয়ে থাকে, এই অভিবাসীদের নতুন স্থানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন জীবিকার উদ্বিগ্নতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং নগর জীবনের বৈপরীত্য ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বা বৈপরিত্যের সৃষ্টি করে। নগর জীবনের এই বৈপরীত্য গ্রাম থেকে অভিবাসিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির জীবিকার সংকটের ফলে তারা ভিক্ষাকে জীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে।[৫৮] অনুরূপভাবে সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে শহুরে বাণিজ্যিক জীবনযাত্রার অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যা এক সংকটপূর্ণ পরিবেশের জন্ম দেয়, ফলে 'গ্রামীণ অভিবাসী'দের সামনে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, যে কারণে তারা ভিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথকে বেছে নেয়।

৪.৪.৪. সামাজিক অবক্ষয়:

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ভিক্ষাবৃত্তির আরও একটি অন্যতম কারণ; শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও সামাজিক পরিবর্তন মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজের একটি অংশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যার ফলস্বরূপ ভবঘুরে, অসুস্থ, বৃদ্ধ, কুষ্ঠরোগী, রোগগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন এবং অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ সম্পর্কিত সংস্থাগুলির জন্য যথাযথ আইন ও নীতি না থাকায় এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা জীবিকার অনিশ্চয়তার কারণে ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।[৫৯]

এই সামাজিক অবক্ষয়ের দ্বারা সমাজে ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্য আর একটি দিক লক্ষ করা যায়। সাধারণত, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন রক্ষণশীল ও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে সমাজে নারীদের স্বাধীনতা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। যেমন, বিধবা মহিলাদের সকল সময় পুনরায় বিবাহের অনুমতি না দেওয়ায় তাদেরকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উপরন্তু তাদের শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনা না থাকায় তারা গণিকাবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।

৪.৪.৫. সামাজিক রীতি-নীতি:

সমাজে নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি-নীতিগুলির কারণে এক ধরণের ভিক্ষুক শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়, যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে তাদের বংশগত পেশা বা প্রথা হিসাবে বিবেচনা করে। যেমন, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের উপনয়ন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ফকির ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে এই ভিক্ষাবৃত্তি সামাজিক রীতি-নীতি হিসাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। তারা এই পেশা বা প্রথাকে কোনও সামাজিক কলঙ্ক বা কুফল বলে মনে করে না এবং তারা এটিকে শৈশবকাল থেকে গ্রহণ করে না।[৬০] একইভাবে বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরাও ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। বিশেষত সামাজিক কিছু রীতি-নীতির কারণে তাদেরকে ভিক্ষা করতে হয়।

৪.৪.৬. পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের অভাব:

বর্তমান সময়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে শহরাঞ্চলগুলিতে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে শহরের প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে নানান বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাচ্ছে। শহরাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের অধিকাংশই অ-সংগঠিত কর্মে নিযুক্ত থাকাই

পরিবারের অবিভাবকদের প্রায়শই সকলকে জীবিকার কারণে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র, কলকারখানা, অ-সংগঠিত বা প্রান্তিক জীবিকা ইত্যাদি কর্মের প্রয়োজনে পরিবারের শিশুদের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না।[৬১] ফলস্বরূপ এই সকল শিশুরা বিভিন্ন সময় অ-সামাজিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে বা ভিক্ষাবৃত্তির দিকে পরিচালিত হয়। তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়ায় এবং খাবার বা অর্থের জন্য ভিক্ষা করে। ফলে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির বিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক কারণ হিসাবে পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণের অভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.৪.৭. অনাথ:

অভিভাবকহীন, নিরাশ্রয়, অসহায় শিশুদেরকে সহজেই ভিক্ষাবৃত্তির পেশাতে যুক্ত করা যায়। পিতা-মাতা না থাকার কারণে শিশুদের ভিক্ষা করে জীবন নির্বাপিত করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুষ্টচক্রের দ্বারা অনাথ শিশুদের বিভিন্ন রকমের অপরাধমূলক কার্যে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি এই সকল শিশুদেরকে ভিক্ষার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমীক্ষাতে দেখা গেছে ভিক্ষারত মহিলারা বিভিন্ন সময় শিশুদের সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করছে, আদতে ওই সমস্ত শিশুরা সংশ্লিষ্ট মহিলারই নয়। তাদেরকে শুধুমাত্র ভিক্ষার কাজে ব্যবহার করার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। ভারতে শিশু ভিক্ষুকদের এক বৃহৎ অংশ অনাথ হওয়ায় সমাজে তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যক্তিরা অনাথ শিশুদেরকে ভিক্ষাবৃত্তির কাজে ব্যবহার করে, এমনকি যৌন ব্যবসার কাজেও ব্যবহার করে থাকে।[৬২]

৪.৫. জৈবিক বা শারীরিক ও মানসিক কারণ:

ভারতের মতো দেশে অধিক মাত্রায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অক্ষম। এক্ষেত্রে বলা যায়, ভারতে দৃষ্টিহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার

৩৭০ জন। ভারতে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মধ্যে ১৭২ জন দৃষ্টিহীন, ৬৬ জন বধির, ৪২ জন কুষ্ঠ রোগী এবং ৩৪ জন মানসিক ভারসাম্যহীন, যারা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত।[৬৩] ১৯৩১-এর জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে বধির মানুষের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৯৫ জন। অবশ্য ভারতের মতো অনুন্নত দেশে জনসংখ্যার বিচারে এই সকল শারীরিক ও মানসিক ভারসম্যহীন মানুষজন যারা গ্রামে বাস করে, তাদের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্যপথ নেই। এই সকল সমস্যার প্রধান ক্ষেত্র হল অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে উপার্জনের পথ হিসাবে বেছে নেয়।[৬৪]

ভারতবর্ষে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী যেমন, অন্ধ, বধির, শারীরিক অক্ষম, বিকলাঙ্গ মানসিক ভারসাম্যহীন রোগগ্রস্ত এবং শারীরিকভাবে দুর্বল ইত্যাদি, প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও সামাজিক পুনর্বাসনের পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা নেই। অনুরূপভাবে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ও যথাযথ সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির অন্যান্য কারণের সঙ্গে জৈবিক, শারীরিক বা মানসিক কারণে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দায়ী কারণগুলি হল: (ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী, (খ) রোগাক্রান্ত বা রোগগ্রস্ত, (গ) মানসিক দুর্বলতা এবং (ঘ) বার্ধক্যজনিত সমস্যা ইত্যাদি।[৬৫] উল্লেখ্য, ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭০,৫০৬ জন।

৪.৫.১. শারীরিক প্রতিবন্ধী:

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের অক্ষমতা ভিক্ষাবৃত্তির কারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তবে বাস্তবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা রয়েছে, তারাই কেবলমাত্র ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বহু অঞ্চলে সীমিত ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে অনেকাংশেই শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষরা উন্নতমানের চিকিৎসা লাভ

করতে পারে না। তাছাড়া শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের বৃহৎ অংশ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানোর মতো অবস্থানেও নেই। তাই প্রায়শই তারা দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থতা, অনাহার ও কর্মহীন থাকার কারণে নিরুপায় হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে।

৪.৫.২. রোগাক্রান্ত বা রোগগ্রস্ত:

সাধারণত সমাজে যে সকল ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়, তাদের একটি বৃহৎ অংশ বিভিন্ন প্রকার শারীরিক অসুস্থতা এবং বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেওয়ার প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রধানত কারণ হিসাবে কুষ্ঠরোগকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, - "কুষ্ঠরোগ ও তদজনিত অক্ষমতা এবং সামাজিক পৃথকীকরণ ও বিরোধিতা ভারতে এই রোগে আক্রান্তদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ...।"[৬৬]

৪.৫.৩. মানসিক ভারসাম্যহীনতা:

মানসিকভাবে দুর্বল বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিরা পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে ভবঘুরে জীবন অতিবাহিত করে। এই সকল মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষরা ভিক্ষার দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন নির্বাহ করে।[৬৭] যখন কোনও ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে দুরারোগ্য রোগে ভোগেন, তাঁরা বাকি লোকের কাছে অতিরিক্ত বোঝাস্বরূপ প্রতিপন্ন হয়ে অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিরা উপার্জন করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবন ধারণের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এমনকি দারিদ্র্যতার কারণে অনেক সময় এই সকল মানুষদের পরিবারের সদস্যরাও মাঝে মাঝে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে থাকেন। ফলে তাদের জীবন ও জীবিকার সংকট দেখা দেয় এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন

হওয়ায় তাদের পক্ষে জনসমাজে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, ফলস্বরূপ ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

৪.৫.৪. বার্ধক্যজনিত বা বয়ঃবৃদ্ধ:

ভিক্ষাবৃত্তির সামাজিক কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ হল বার্ধক্যজনিত। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের বৃহৎ সংখ্যক মানুষ কৃষি ও অ-সংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত থাকার ফলে এই সকল মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ এই সকল প্রান্তিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বার্ধক্যজনিত কারণে কর্মহীন হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা ও জীবন ধারণের মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করেন। সমাজের এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা শারীরিকভাবে দুর্বল ও প্রবীণ হয়ে থাকেন। আর প্রবীণ ভিক্ষুকদের উন্নতিকল্পে নির্দিষ্ট সরকারি নীতি এবং পরিকল্পনার দ্বারা তাদের যত্ন ও সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই সকল প্রবীণ মানুষদের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত। ভারত সরকার কর্তৃক ২০০৭ সালে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য সিনিয়র সিটিজেন অ্যাক্ট (Senior Citizens Act, 2007) প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও প্রকল্পের সূচনা করেন। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৭ সালের সিনিয়র সিটিজেন অ্যাক্ট-এর অনুকরণে নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে ২০১১ সালে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষাকল্পে আইন প্রণয়ন করে। এই আইন প্রণয়নের দ্বারা সমাজের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। যদিও সরকারের এই প্রকল্প থাকার সত্ত্বেও সমাজে বার্ধক্যজনিত কারণে ভিক্ষাবৃত্তির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৬৮]

৪.৬. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ভেদাভেদ, ধর্মাশ্রয়ী জীবিকা নির্বাহ:

ভিক্ষাবৃত্তি উদ্ভবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার পূণ্যভুমি হিসাবে যুগ যুগ ধরে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ও গুরুদ্বারগুলির নাম উঠে এসেছে। ঈশ্বরের বাসস্থান হিসাবে একদিকে যেমন এগুলি আমাদের চিত্তাকর্ষক করে, তেমনি ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের পশ্চাতেও এই ধর্মীয় উপাশনালয়গুলির বড় ভূমিকা রয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলিতে ভিক্ষারত ভিক্ষুক শ্রেণির জীবনযাপন পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ভিক্ষুকদের একটি বিশাল অংশ ধর্মীয় স্থানগুলির উপর নির্ভরশীল। মূলত এইসব স্থানে আগত পুণ্যার্থীদের করুণার উপর নির্ভর করে তাদের প্রাত্যহিক উপার্জন।[৬৯] সারণি ৪.৩-এর মাধ্যমে এবিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সারণি - ৪.৩: বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	সম্প্রদায়	ভিক্ষুক জনসংখ্যার	ভিক্ষুক জনসংখ্যার শতাংশ	ভারতের জনসংখ্যার শতাংশ
১	হিন্দু	২৬৮৮৩৭	৭২.২%	৭৯.৮০%
২	মুসলিম	৯২৭৬০	২৪.৯%	১৪.২৩%
৩	খ্রিষ্টান	৩৩০৩	০.৮৮%	২.৩০
৪	শিখ	১৬৭৭	০.৪৫%	১.৭২%
৫	বৌদ্ধ	১৯৬৩	০.৫২%	০.৭০%
৬	জৈন	২৪১	০.০৬%	০.৩৭%
৭	অন্যান্য	১১২৬	০.৩%	০.৬৬%
৮	অপরিচিত (জানা যায়নি এমন)	২৩১০	০.৬২%	০.২৪%

সূত্র: "Census of India, 2011," *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5.*, (New Delhi: Registrar General and Census Commissioner, Government of India, 2013)

ভারতের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা উল্লেখ করা যায় যে, ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ধর্মীয় ভিক্ষাবৃত্তিকে কেবলমাত্র হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সহ্য করেন না ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে সমর্থন করেন। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পে রাষ্ট্রীয় আইনের থেকে ধর্মীয় ভিক্ষুকদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তিকে এক ধরণের ধর্মীয় পবিত্রতা হিসাবে গণ্য করা হয়। বিশেষত, তীর্থস্থানগুলিতে ভিক্ষুকদের অধিক সংখ্যার উপস্থিতির কারণ হল ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ ভিক্ষা দেওয়াকে পবিত্র কার্য বা দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করেন।[৭০]

ভিক্ষাবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তিকে বিভিন্ন আলোকে চিত্রিত করা হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্তব্যের মধ্যে দান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একইভাবে ইসলাম ধর্মে পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে বাধ্যতামূলক ভিক্ষা প্রদান বা *জাকাত* হল একটি। সকল ইসলামে বিশ্বাসীরা এই ভাবাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে *জাকাত* ধনী (Rich) ও দরিদ্রের (Poor) মধ্যে ব্যবধানকে কমিয়ে দেয় এবং দরিদ্র্যদের পুনর্বাসিত করে। ইসলাম ও খ্রিস্টান সংস্কৃতিতে ভিক্ষা প্রদানের রীতি বহুকালের, অনুরূপভাবে বৌদ্ধ ধর্মেও এর অনুসরণ এবং ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তিকে মর্যাদাসম্পন্ন কর্ম হিসাবে পরিগণিত করা হয়।[৭১] হিন্দু ধর্মে কোনও মন্দিরে বা কোনও পুরোহিতকে ভিক্ষা প্রদানকে ভক্তির নৈবেদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষাবৃত্তিকে সমাজে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রথা হিসাবে বিবেচিত হয়। একইভাবে ধর্মীয় ভাবাদর্শে ভিক্ষাবৃত্তিকে আধ্যাত্মিক এবং নম্র জীবনের প্রতীক সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।

ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মীয় সহানুভূতির কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে ১৯১৯ সালে বোম্বাই-এর প্রাদেশিক সরকার সংবেদনশীল ধর্মীয় ভাবাদর্শের কারণে ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা সম্পর্কে কমিটি গড়ে তোলেন। কমিটি বিশেষত ভিক্ষার প্রতি ধর্মীয় সহায়তার বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিল এবং স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিল যে, - "There is a consensus of opinion amongst religious heads of recognized denomination of Hinduism that although begging is permissible among those who renounce the world, the present mode of going a-begging in public streets is unjustifiable."[৭২]

একইভাবে ১৯৪৩ সালে মহীশূরে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণকল্পের জন্য একটি বিশেষ কমিটি দ্বারা তদন্ত শুরু করেছিল। তদন্ত কমিটি স্পষ্টভাবে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন যে, হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ভিক্ষাবৃত্তির অনুমতি দেয়, বিশেষত গৃহকর্তার সামাজিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য। তদন্ত কমিটি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের এই আদর্শকে সমর্থন করেছিল।[৭৩] যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মীয় ভিক্ষাবৃত্তির নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।

৪.৭. রাজনৈতিক কারণ:

দৈনন্দিন সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভিক্ষুকদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীল মানসিকতাও হ্রাস পেতে শুরু করে। সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের জন্য ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণার্থে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিসরের পথ

তৈরি করেছে।[৭৪] ভিক্ষুকদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে গঠনমূলক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করলেও সে সব অনেকক্ষেত্রেই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল না।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকরা বিভিন্ন প্রকারের অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে। কারণ প্রতিটি সমাজের কাঠামোগত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্থান হতে থাকে, যা রাষ্ট্রের নীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি যথার্থভাবে তালিকাভুক্ত হলে ভিক্ষুকদের প্রতি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটবে।[৭৫] যা স্বাভাবিকভাবেই ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে পরিণত হবে।

ভিক্ষুকদের জনসমাজে গ্রহণ করা হয়েছিল বেশ কিছু নিয়ামানুবর্তিতার কারণে। বিশেষত, সমাজে তাদের গ্রহণ করা হয়ে থাকে ধর্মীয় বিষয়ের উদ্দেশ্যে কিংবা সামাজিক রীতি-নীতির প্রয়োজনে। তাছাড়া সমাজে তাদের উপস্থিতি মূলত পরজীবী প্রবণতা এবং ইচ্ছাকৃত অলসতার সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক কাঠামোর এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন কারণে এসেছে। কর্ম থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রাথমিকভাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের মধ্যে বৈষম্যের ফলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা ওঠানামা করে। শ্রমের চাহিদা-সরবরাহের স্তরে এই বৈষম্যগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কারণে উদ্ভূত হয়। এই বৈষম্যের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহামারি এবং জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি দায়ী হয়ে থাকে।[৭৬] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি এবং সরবরাহে ঘাটতির ফলে শ্রমিক শ্রেণি তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় এবং উন্নত কর্মক্ষম অবস্থার অবনমনের দ্বারা কিছুটা রাজনৈতিকভাবে শিকার হতে হয় তাদের। অন্যদিকে নিয়োগকর্তা এবং জমির মালিকরা শ্রমিকদের অগ্রিম মজুরি প্রদানে খুব একটা

উৎসুক ছিল না। যে কারণে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনকল্পে এবং ভবঘুরে রোধকল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন প্রণয়নের বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। লক্ষনীয় যে, ঔপনিবেশিক সময়কালে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিষয়টি খুব একটা স্পষ্ট ছিল না, তাই স্থানীয় স্তরে জমিদার শ্রেণির নিয়ন্ত্রনাধীনে শ্রমিকদের থাকতে হতো। ফলস্বরূপ ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে জমিদার শ্রেণির শ্রমিক সংক্রান্ত অন্যায্য দাবীর কাছে অনেকাংশেই নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। এবং ঔপনিবেশিক সরকারকে এই অভিজাত শ্রেণির চাহিদা মেটাতে রাষ্ট্রীয় নীতির প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে, সরকারি নীতির দ্বারা অনেকাংশে শ্রমিকদের কম মজুরিতে শ্রমদান করতে বাধ্য করা হত। আর এই নীতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে বহু শ্রমিক নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই ধরণের শ্রমিক শ্রেণির একাংশ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে ভিক্ষুক ও ভবঘুরের পরিচয়ে পরিচিত হতে হয়।[৭৭]

৪.৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণ:

ভূমিকম্প, বন্যা, সুনামি ও খরা ইত্যাদির মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষকে অনেক সময় বাস্তুচ্যুত হতে হয়। আর এরকম তাৎক্ষণিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে বহু মানুষ জীবিকাহীন হয়ে অনাহার ও মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে থাকেন, এই অভিবাসন প্রক্রিয়া মূলত জীবিকার সন্ধানে হয়। আর তারা শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার প্রান্তিক জীবিকা কিংবা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক কারণের ফলে উদ্ভূত অভিবাসন প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অঞ্চল বা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এই প্রক্রিয়াটি রাজ্য ও আন্তঃরাজ্যে চলতে থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা এবং বোম্বাই-এর মতো বৃহৎ শহরগুলিতে এই ধরণের অভিবাসন অধিকমাত্রায়

থাকে। এই সকল অভিবাসিত ভিক্ষুকদের বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য কোনো প্রকার খরচ বহন করতে হয় না।

৪.৯. অন্যান্য কারণ:

ভিক্ষাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেওয়ার পশ্চাতে আরও বেশকিছু কারণ রয়েছে। এক্ষেত্রে ড: রূপ কুমার বর্মনের *'সংকট জনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা'* প্রবন্ধে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নিজস্ব জগতের চেনা গণ্ডি থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া বা অভিগমন মানব সমাজের এক সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম, জেলা থেকে রাজধানী, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য, এক দেশ থেকে অন্য দেশে বর্হিগমনের দুটো ভাগ আছে। প্রথমটি হল স্বেচ্ছায় নিজের স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র থেকে অন্য স্থানে যাওয়া (Voluntary Migration)। এর পেছনে ভেতরের বা বাইরের কোনো শক্তির ভয় বা বল কাজ করে না। দ্বিতীয়টি হল নিজের জন্মস্থান, চেনা জগত বা জীবিকার ক্ষেত্র ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হওয়া (Forced Migration)। অভিগমনকারীর নিজস্ব ক্ষেত্রের আভ্যন্তরীন চাপ এই বাধ্যবাধকতার শক্তির প্রধান যোগানদার। এটা হতে পারে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের অস্থিরতার ফল।[৭৮] এই চিরাচরিত কারণগুলি ছাড়াও মানুষ দেশান্তরী হতে বাধ্য হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জীবিকার উৎসস্থলের সংকটের জন্য। জীবিকার সংকট, ব্যক্তি ও পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সম্পূর্ণ গ্রাম বা সম্প্রদায়কে (জীবিকার সন্ধানে) অন্য স্থানে যেতে বাধ্য করে। এই ধরণের প্রক্রিয়াকে আমরা বলি সংকটজনিত অভিগমন (Crisis Migration)। সংকটজনিত কারণে যখন কোনো ব্যক্তি বা পরিবার বা জনগোষ্ঠী নিজের দেশের সীমানা অতিক্রম করেন, তখন তারা হয়ে যান

'সংকটজনিত উদ্বাস্তু' (Crisis-induced Refugees)। যদি তারা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম না করেন তাহলে তারা থেকে যান 'আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত মানুষ' (Internally Displaced Persons বা IDPs) হিসাবে।[৭৯] যাইহোক এই বাস্তুচ্যুত মানুষেরা জীবন ধারণের জন্য অন্য কোনো পন্থা না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তির মত প্রান্তিক পেশাকে বেছে নিতেও বাধ্য হন বলে উল্লেখ্য।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। এর মধ্যে বিপর্যয় জনিত উদ্বাস্তুদের বাধ্যবাধকতার কথা বলা যেতে পারে। মূলত চারটি কারণের জন্য বিপর্যয় জনিত উদ্বাস্তুদের (Environment-induced Internally Displaced Persons বা EIDPs) সৃষ্টি হয়। এগুলি হল (১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, (২) মানব সৃষ্ট বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা, (৩) প্রকৃতির উপর যুদ্ধ ও উন্নয়নের প্রভাব; ও (৪) প্রাকৃতিক অবক্ষয়। বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামী, ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুফান, খরা, ইত্যাদি কিভাবে মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে সে ব্যাপারে আমরা সকলেই কমবেশী অবগত।[৮০] প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমগ্র বিশ্বের একটি সার্বজনীন সমস্যা যার জন্য দুর্যোগের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো নতুনভাবে বাচার জন্য নতুন স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি ভয়ংকর শিল্প দুর্ঘটনা অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার স্থানটিকে করে তোলে মানুষের বেঁচে থাকার অনুপযোগী। গত অর্ধ শতকে বিশ্ববাসী এরকম বহু দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শেভোসো শিল্প দুর্ঘটনা (ইতালী, ১৯৭৬), তিনমাইল দ্বীপ পারমানবিক দুর্ঘটনা (পেনসিলভেনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৭৯), ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (ভারত, ১৯৮৪), চেরনোবিল পারমানবিক দুর্যোগ (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৮৬), ফুকুসীমা দাইচি পারমানবিক দুর্যোগ (জাপান, ২০১১), ইত্যাদি। যুদ্ধ ও উন্নয়ন অনেকক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে পরিবর্তন ঘটায় যে সেখানে মানুষের বসবাস হয়ে পড়ে

অনিশ্চিত। সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ, স্বাভাবিক উৎপাদন পদ্ধতি, উর্বরতা শক্তি, ইত্যাদি; হয়ে যায় মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে সেখান থেকে মানুষের বাধ্যতামূলক বহির্গমন স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হন। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ১৯৯০-এর দশকের উপসাগরীয় যুদ্ধের কথা। লক্ষ করলে দেখা যাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিজমিতে গাড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপিত হওয়ায় সেখানে আর কৃষি উৎপাদন সম্ভব হয় না। ফলে যাদের জমি প্রকল্প অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত তারা সেখানে আর কৃষিকাজ করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ অন্যস্থানে যেতে বাধ্য হন অথবা জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য কৃষিজমির গুণগত পরিবর্তন হওয়ায় জীবন সংকট কৃষককে বাধ্য করে অন্যস্থানে চলে যেতে যা সংকটজনিত উদ্বাস্তু সৃষ্টির পথ তৈরী করে।[৮১]

প্রকৃতি ও মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগ, যুদ্ধ, উন্নয়ন, ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্ট EIDPs রা ছাড়াও যারা প্রকৃতির অকস্মাৎ বা ধীরগতিতে পরিবর্তনের জন্য তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান পরিত্যাগ করে তারা সংকটজনিত বাস্তুত্যাগের ধারা সৃষ্টি করতে পারে। এই সংকট হতে পারে অর্থনৈতিক কারণে, হতে পারে তার জীবনের গুণগত পরিবর্তনের জন্য। এটা কখনও হতে পারে সাময়িক, কখনও বা চিরদিনের। সংকটজনিত বাস্তুত্যাগীরা নিজ দেশের গণ্ডি অতিক্রম করলে আন্তর্জাতিক পরিভাষায় উদ্বাস্তু বা শরণার্থী (Asylum Seekers) হতে পারেন। কিন্তু নিজ দেশের গণ্ডির মধ্যে থাকলে তারা IDPs হিসাবে চিহ্নিত হন না। কারণ সংকটজনিত বাস্তুত্যাগের ঘটনা ঘটে ধীরগতিতে যা আন্তর্জাতিক বা জাতীয় বা আঞ্চলিক স্থায়ী বাসিন্দাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ধরা যাক বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের কথা, এখানে সামুদ্রিক ঝড় প্রতিবছরের স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আইলার মত ভয়ংকর ঝড়, নদীপথের গতিপথ

পরিবর্তন করায় বা বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ায় বা কৃষিজমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় সুন্দরবনের মানুষরা তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ছেড়ে ধীর গতিতে শহর বা অন্য গ্রাম বা অন্য দেশে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অনুরূপভাবে মানুষ অনাহার ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।[৮২]

৪.১০. ভিক্ষা দেওয়ার কারণ:

রিচার্ড বার্ণ ১৭৬৪ সালে তাঁর 'History of Poor Law' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে, ভিক্ষা দেওয়ার পশ্চাতে নানাবিধ প্রেক্ষিত থাকতে পারে। এবং তদ্জনিত নানান সমস্যাও উপনীত হতে পারে, সেক্ষেত্রে তার সমাধানের বিভিন্ন উপায়ও রয়েছে। সমাজে কেউ যদি ভিক্ষা না দেয়, সেক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যেত না। সামাজিক রীতি-নীতির দ্বারা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কে সামাজিক মেল বন্ধনের সূচনা হয়।[৮৩] ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ট্র তাঁর "Psychology of Aims Giving" মনোবিজ্ঞানের একটি আকর্ষণীয় গবেষণায় সাধারণ মানুষের ভিক্ষা বা দাতব্যের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত কারণগুলি হল, - (ক) ধর্মীয় কারণ, (খ) সামাজিক রীতি-নীতি, (গ) ব্যক্তিগত কারণ, (ঘ) সমবেদনা এবং (ঙ) দাতব্য ইত্যাদি বিষয়।[৮৪]

৪.১০.১. ধর্মীয় কারণ:

সমাজের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট রীতি-নীতি অনুসারে ভিক্ষা প্রদানের রীতি প্রচলিত আছে। যেমন, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় আচরণের জন্য ভিক্ষা প্রদান করে থাকেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন দিক থাকলেও ধর্মের ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে ভিক্ষার জন্য।

৪.১০.২. সামাজিক রীতি-নীতি:

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত ছিল। ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি করা উচ্চতর ‘শ্রেণির’ সাথে জড়িত এবং তাই এতে কোনও কলঙ্ক যুক্ত হয় না। ভিক্ষা ও করুণার গুণ হল হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিষয়। মুসলিম সমাজের সামাজিক রীতির মধ্যে ভিক্ষা প্রদানের প্রথা থাকায় ফকির শ্রেণি দাতব্যের দাবী করেন।

৪.১০.৩. ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভাবাবেগ জনিত কারণ:

ভিক্ষা দেওয়ার কিছু ব্যক্তিগত কারণ আছে যেমন, - (ক) কোনো অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে সেই ব্যক্তির থেকে আশীর্বাদ পেতে ভিক্ষা প্রদান করা হয়। (খ) ব্যক্তিগত লাভের আশায়। যেমন, শেয়ারবাজার বা রেসে অর্থ জয়ের আনন্দে ভিক্ষা দেওয়া। শিশু অসুস্থ হলে মা সন্তানের সুস্থতার জন্য ভিক্ষা করে থাকেন। আবার কিছু ব্যক্তি পুণ্যার্জনের জন্য দরিদ্রদের ভিক্ষা প্রদান করে থাকেন। (গ) ভিক্ষুকদের আশীর্বাদে মানবিক ইচ্ছার আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য ভিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া পারিবারিক মঙ্গল কামনার্থে অনেক সময় দরিদ্র মানুষদের সাহায্য প্রদান ও ভিক্ষা দেওয়া হয়।[৮৫] সমাজে অনেক ভিক্ষুক আছেন যারা ভিক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে থাকেন, যাতে ঈশ্বরের অভিশাপের ভয়ে ভিক্ষা প্রদান করে।

৪.১০.৪. সমবেদনা:

ভিক্ষা দেওয়ার দিকগুলির মধ্যে সমবেদনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বিমুগ্ধ শিশু, বিকৃত দেহ, কুষ্ঠরোগ ও প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সমবেদনা স্বরূপ ভিক্ষা প্রদান করা হয়।

এছাড়া সমাজের নানাধরণের সমস্যায় জড়িত মানুষের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪.১০.৫. দাতব্য:

সমাজে অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে দাতব্যের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১১. পর্যবেক্ষণ:

ভিক্ষুক শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা য়ায়, ভিক্ষুকদের জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলতে হয়। প্রথমত, ভিক্ষুক শ্রেণিকে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য উপযুক্ত স্থানস্বরূপ জনবহুল স্থান, মন্দির, মসজিদ, রেলস্টেশন, ফেরিঘাট প্রভৃতি স্থানকে বেছে নিতে হয়। একই সাথে অর্থ উপার্জনের জন্য ভিক্ষুকরা নানাবিধ কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। প্রকৃত অর্থে মানুষের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর ভিক্ষুক শ্রেণির উপার্জন নির্ভর করে। আলোচনায় দেখা গেছে অল্পবয়সী বা নাবালক ভিক্ষুকরা তাঁদের উপার্জিত অংশের বেশিরভাগটাই অপব্যবহার করেন। তবে বয়ঃবৃদ্ধরা ভবিষ্যৎ-এর কথা চিন্তা করে অনেকসময় অর্থ নিজেদের কাছে বা পরিচিতের কাছে সঞ্চিত রাখেন। তবে সঞ্চয়ের এই পরিমাণ খুবই কম হয়। এক কথায় বলা যায় ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট নয়। মূলত ভিক্ষুক শ্রেণির অস্তিত্বের সংকট জনিত কারণে বেঁচে থাকার প্রশ্নে এই পেশাকে একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। সেখানে তাদের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি অলীক ছাড়া কিছুই নয়।

তথ্যসূত্র:

১. Dennis J. Baker: 'A Critical Evaluation of the Historical and Contemporary Justifications for Criminalising Begging', *The Journal of Criminal Law, 73, No. 3, (June, 2009),* পৃ.পৃ. ২১২-২৪০। https://doi.org/10.1350/jcla.2009.73.3.570.

২. S. R. Myneni: *Sociology for Law Students,* (Faridabad, Allahabad Law Agency, 2006), পৃ. ৫৩৫।

৩. *তদেব,* পৃ. ৫৩৭।

৪. S. K. Battacharyya: 'Beggars and the Law', *Journal of Indian Law Institute, 19 (1977),* পৃ. ৪৯৮।

৫. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ.পৃ. ১৯-২২।

৬. N. Anderson: *The Hobo: The Sociology of the Homeless Man,* (Chicago, University of Chicago Press, 1961), e-Book.

৭. G. R. Madan: *India of Tomorrow,* (Calcutta, Allied Publication Private Limited, 1986), পৃ. ৩৪৪।

৮. Katyun H. Cama: "Types of Beggars", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ১।

৯. Hartley Dean (ed.): *Begging Questions: Street Level Economic Activity and Social Policy Failure,* (Bristol Policy Press, 1999), পৃ. ১০৬।

১০. *তদেব.*, পৃ. ১০৭।

১১. *তদেব.*, পৃ. ১০৮।

১২. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It, প্রাগুক্ত*।

১৩. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat Calcutta,* (Kolkata, Anthropological Survey of India, 1987), পৃ. ১৩।

১৪. Moni Nag: 'Beggars Problem in Calcutta, and Its Solution', *The Indian Journal of Social Work, XXVI, No 4, (October 1965*), পৃ. ২৪৩।

১৫. Census of India, 1991: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5* (New Delhi, Registrar General and Census Commissioner, Government of India, 1993).

১৬. Census of India, 2001: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5* (New Delhi, Registrar General and Census Commissioner, Government of India, 2003).

১৭. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It, প্রাগুক্ত*।

১৮. Woubishet Demewozu: *Begging as a Survival Strategy: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa,* (Diss., Addis Ababa University, 2003). http://www.begging-as-a-survival-strategy-confeferring-with-the-poor-at-the-orthodox-religious-cermonial-days-in-addis-ababa.html.com.

১৯. Census of India, 1981: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5,* (New Delhi, Registrar General and Census Commissioner, Government of India, 1983).

২০. A. A. Adedibu: 'Begging and Poverty in Third World Cities: A Case Study of Ilorin, Nigeria', *Ilorin Journal Business and Social Science, (1989),* পৃ.পৃ. ২৫-২৭।

২১. Cyndy Baskin: "Structural Social Work as Seen form an Indigenous Perspective", in W. Shera (ed.): *Emerging Perspectives on Anti-Oppressive Practices,* (Canada, Canadian Scholars Press, 2003), পৃ.পৃ. ৬৫-৮০।

২২. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৬৯-৮০।

২৩. Census of India, 1981: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5, প্রাগুক্ত*।

২৪. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat Calcutta, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩।

২৫. Sonia Malik and Sanjoy Roy: 'A Study on Begging: A Social Stigma - An Indian Perspective', *Journal of Human Values, 18, No. 2, (2012),* পৃ.পৃ. ১৮৭-১৯৯। https://doi.org/10.1177/0971685812454486.

২৬. World Bank: “*Poverty and Equity Brief, South Asia, India*”, (2011). https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Archives-2019/Global_POVEQ_IND.pdf.

[Last Accessed: 12.08.2019].

২৭. Lisa Schlein and Sven Krüger: “*Urban poor worse off than rural poor but good policies can reduce slums: A report by UN-Habitat with additional reporting”, (18 June 2006),* http://www.citymayors.com/society/urban_poor.html. [Last Accessed: 09.12.2019]

২৮. Global Hunger Index Report: *International Food Policy Research Institute (2011).* http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf. [Last Accessed: 09.12.2019]

২৯. *তদেব*।

৩০. Sumita Sarkar: ‘Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development’, *Social Action, 57, (January-March 2007),* পৃ.পৃ. ৪৪-৫০।

৩১. Amartya Sen: *Poverty and Famine,* (London, Oxford University Press, 1981), পৃ. ১৯৬।

৩২. Sumita Sarkar: ‘*Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development*’, *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪৪-৫০।

৩৩. *তদেব*।

৩৪. *তদেব*।

৩৫. Radhakamal Mukherjee: “Causes of Beggary,” in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১।

৩৬. Sumita Sarkar: ‘*Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development*’, *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪৪-৫০।

৩৭. Kusum W. Ketkar and Suhas L. Ketkar: ‘Bank Nationalization, Financial Savings, and Economic Development: A Case Study of India’, *The Journal of Developing Areas, 27, No. 1, (1992),* পৃ.পৃ. ৬৯-৮৪।
http://www.jstor.org/stable/4192167.

৩৮. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৬৯-৮৪।

৩৯. C. Gonsalves, V. Naidoo, P. Kumar and R. Bhat (eds.): *A Right To Food, Volume 1,* (New Delhi, Socio-Legal Information Centre, Human Rights Law Network, 2004), পৃ.পৃ. ৮০-৯০।

৪০. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০৬-১২৩।

৪১. Woubishet Demewozu: *Begging as a Survival Strategy: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa, প্রাগুক্ত*।

৪২. Famine Inquiry Commission: "Report of the Indian Famine Commission, 1880-1885". (Agricole Publishing Academy, 1989).

৪৩. *"Royal Commission on Labour in India, 1929-1931",* (Calcutta, Central Publication Branch, Government of India, 1931), পৃ.পৃ. ১-১৭। https://indianlabourarchives.org/xmlui/handle/20.500.14121/58.

৪৪. *তদেব*।

৪৫. Pravakar Sen: 'Supply of Industrial Labour in India, 1892-1943', *The Economic Weekly, (June 2, 1956),* পৃ.পৃ. ৬৩৮-৬৪১।

৪৬. Upinder Baxi (ed.): *Law and Poverty, Critical Essays,* (Bombay, N. M. Ttapathi Private Ltd, 1988), পৃ. ২৬১।

৪৭. Karl Marx: *Das Kapital: A Critique of Political Economy,* (Germany, Penguin Books Ltd., 1990), পৃ. ৫৬৫।

৪৮. David F. Greenberg: *Crime and Capitalism: Readings in Marxist Crimonology* (Temple University, 1982), eBook.

৪৯. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat Calcutta, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২০-৩২।

৫০. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১।

৫১. S. Bahadur: 'Kidnapping of Children for the purpose of Begging', *Social Defence, 53, (1965).*

৫২. Maharashtra Government Statistics: *Begging is a very lucrative business in Mumbai (pop. 14 million) India's Commercial Capital*, 1980.

৫৩. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ২১-২২।

৫৪. প্রসেনজিৎ নস্কর: কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত (কলকাতা, ১২.০৬.২০১৮ থেকে ২০.১০.২০২০ সময়কালীন পর্বের ক্ষেত্র সমীক্ষা)।

৫৫. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary," in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, *প্রাগুক্ত*, ২১-২২।

৫৬. S. K. Battacharyya: '*Beggars and the Law*', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৮।

৫৭. D. V. Rege: *The Labour Investigation Committee Report Government of India* (Manager of Publications, Government of India, 1994), পৃ.পৃ. ৮-৯।

৫৮. Upinder Baxi, (ed.): *Law and Poverty, Critical Essays*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১।

৫৯. *তদেব*, পৃ. ২৬২।

৬০. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ২০-২১।

৬১. *তদেব*।

৬২. Gurumukh Ram Das: *Indian Social Problems: Social Disorganization and Reconstruction*, (Allied Publishers Ltd., 1976). পৃ. ২৩১।

৬৩. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ২১-২২।

৬৪. Census of India, 1931: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5, (New Delhi, Registrar General and Census Commissioner, Government of India, 1933).

৬৫. Census of India, 1981: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5, (New Delhi, Registrar General and Census Commissioner, Government of India, 1983).

৬৬. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary", in J. M. Kumarappa (ed): *Our Beggar Problem: How To Tackle It*, প্রাগুক্ত।

৬৭. তদেব।

৬৮. Katayun H. Cama: 'The Juvenile Court and Magistrate', *Indian Journal of Social Work (IJSW) Online.*

৬৯. M. Badgeri and S. Dolare: 'Their Only Religion Is Money', *The Times of India*, (April 18, 2003). https://timesofindia.indiatimes.com/their-only-religion-is-money/articleshow/43724231.cms.

৭০. তদেব।

৭১. Amiya Rao: 'Poverty and Power: The Anti-Begging Act', *Economic and Political Weekly, 16 (1981),* পৃ.পৃ. ২৬৯-২৭০।

৭২. 'The Report of the Enquiry Committee on Professional Begging in the Bombay Presidency, 1919'.

৭৩. 'The Mysore Prohibition of Beggary Act, 1944, and the Rules for the Prohibition of Beggary, 1947', (Government of Mysore, Law Department, 1959).

৭৪. Vijay Kumar: *'The Destitutes and Their Problems: A Study with Special Reference to the Destitute Depending on the Begging from the Worshipers Near the Various Temples of the City of Bangalore'*, (September 20, 2011). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2423506.

৭৫. Great Britain Working Party on Vagrancy and Street Offences: *Report of the Working Party on Vagrancy and Street Offences*, (London, H.M. Stationery Off., 1976).

৭৬. Catherine Kennedy and Suzanne Fitzpatrick: 'Begging, Rough Sleeping and Social Exclusion: Implications for Social Policy', *Urban Studies, 38, No. 11, (October 2001)*. https://doi.org/10.1080/00420980120080907.

৭৭. Rachel Vorspan: 'Vagrancy and the New Poor Law in Late-Victorian and Edwardian England', *The English Historical Review, 92, No. 362, (1977),* পৃ.পৃ. ৫৯-৮১। http://www.jstor.org/stable/566301.

৭৮. রূপ কুমার বর্মণ: ‘সংকট জনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা’, *অন্তর্মুখ* (২০১৩)।

৭৯. Rup Kumar Barman: *Migration, State Policies and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan* (Delhi, Aayu Publication, 2021), পৃ.পৃ. ২-৫।

৮০. *তদেব*।

৮১. *আজকাল*, ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৯০।

৮২. Rup Kumar Barman: *Migration, State Policies and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ২-৩।

৮৩. John Barnabas: “Legislation Relating to Beggary,” in J. M. Kumarappa (ed): Our Beggar Problem: How To Tackle It, (Bombay, Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ১৫৯-১৬৩।

৮৪. *তদেব*, পৃ.পৃ. ১৬১-১৬২।

৮৫. *তদেব*., পৃ.পৃ. ১৬৩-১৬৪।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণিবিভাগ

সাম্প্রতিককালে ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। A. M. Biswas (কলকাতার ভিক্ষুক আবাসনের তত্ত্বাবধায়ক) ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এর গুরুত্ব, কারণ ও তাৎপর্যের যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, - "The status of a place can best be judged by the number of its beggars."[১] এটি কেবলমাত্র কোনো একটি সামাজিক গোষ্ঠীর তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা নয়, এই সমস্যাটি গভীরে প্রোথিত একটি সার্বিক সামাজিক সমস্যা। এক্ষেত্রে বলা যায়, ভিক্ষাবৃত্তির ধারণাটি সাধারণত একটি জটিল সামাজিক সমস্যা, যা দারিদ্র্য, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে দুর্বল (অনাহার ক্লিষ্ট) যারা সহায়তা বা দাতব্যের (Charitable) সন্ধান করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।[২] অপরদিকে সমাজতাত্ত্বিকগণ এই সকল সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেন যে, এই সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং, বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ দ্বারা উল্লেখ করা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে ভিক্ষুককে পরিণত হওয়ার জন্য বাধ্য করা বা প্ররোচিত করা হয়েছে কি না। একইভাবে ভিক্ষুককে কোনো প্রকার চারিত্রিক শ্রেণিবিন্যাস করা যায় কি না, সে বিষয় সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভারতবর্ষে ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে ভিক্ষুকদের বিভিন্ন ধরনের রূপ লক্ষ করা যায়, যা ভিক্ষার ধরন বা প্রকার হিসাবে বর্ণিত হয়।

৫.২. ইউরোপীয় ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ:

ভিক্ষুক শ্রেণির অস্তিত্ব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ করা গেলেও অঞ্চল ও স্থানভেদে ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক তারতম্য বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবেই এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলির ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে Irwin St. John Tucker ইউরোপীয় দেশগুলির ভিক্ষুকদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, - (ক) Hoboes, (খ) Tramps এবং (গ) Bums। তাঁর মতে ‘Hobo’ হল একজন ভবঘুরে কর্মী (A migratory Worker)। ‘Tramp’ একজন ভবঘুরে অকর্মণ্য (A Migratory non-worker)। ‘Bum’ হল একজন স্থায়ীভাবে অবস্থিত অকর্মণ্য (A Stationary non-worker)।[৩] Tucker প্রবর্তিত ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক বিশ্লেষণ থেকে কিছুটা আলাদাভাবে ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন নেলস্ অ্যান্ডারসন। তাঁর মতানুসারে ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক বিন্যাসগুলি হল, - (ক) মরশুমি শ্রমিক (Seasonal Labourers), (খ) প্রবাসী অনিয়মিত শ্রমিক (Migratory casual labourers), (গ) প্রবাসী অকর্মন্য (Migratory non-worker) (ঘ) অ-অভিবাসী অনিয়মিত শ্রমিক (Non-migratory casual labourers) (ঙ) Bums (The lowest of all the type of homeless men)। Tucker এর মতে ‘Bums’-দের অবস্থান হল সমস্ত গৃহহীন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নীচে। এরা হল মদ্যপ, নেশাগ্রস্থ, অলস ও বেকার মানুষ। যারা মাঝে মধ্যেই অপরাধজনিত কারণে কারাগারে অবস্থান করেন। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় ‘Bums’-রা মূলত গৃহহীন।[৪]

গৃহহীনদের অবনতির কারণগুলি হল, - (ক) নিয়মিত কাজ খোঁজার অক্ষমতা, (খ) দীর্ঘকালীন বেকারত্ব, (গ) কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো, (ঘ) একটা সময় বেশি পরিমান কাজ করা ও পরবর্তীকালে ঘুরে বেড়ানো, (ঙ) কোনোরকম কাজ না করে ঘুরে বেড়ানো। এগুলির

প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই সকল দিকগুলির শেষ পর্যায় হল ভিক্ষাবৃত্তি। তাই Hoboes থেকে Tramps এবং Tramps থেকে Bums-এ পরিণত হওয়া মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভিক্ষাবৃত্তির সবচেয়ে নিম্নতম পন্থা। ইংল্যান্ডের এই সকল গৃহহীন মানুষদেরকে সংবিধানে দস্যু, ভবঘুরে, যাযাবর বলা হয়েছে।[৫] ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই সমস্ত ভিক্ষুকরা রাস্তায়, গলিতে বা সাধারণ জায়গায় শিশুদেরকে নিয়ে সাহায্যের জন্য অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়। আবার দেখা যায় কিছু মানুষ শরীরের কিছু 'ক্ষত' অংশ বা 'অচল অংশ' দেখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

৫.৩. ভারতীয় ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ:

ভারতবর্ষে ভিক্ষুকদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ দ্বারা সমাজবিজ্ঞানীরা ভিক্ষুকদের শ্রেণি বিভাজন করেছেন। ভিক্ষুকদের শ্রেণি বিভাজনের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদ প্রবর্তন করেছেন। এক্ষেত্রে Cama H Katayun তাঁর *'Type of Beggars'* (১৯৪৫) প্রবন্ধে ভিক্ষুকদের ১৫ টি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা: (ক) শিশু ভিক্ষুক, (খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী, (গ) মানসিকভাবে অসুস্থ, (ঘ) রোগগ্রস্ত, (ঙ) সমর্থ ভিক্ষুক, (চ) ধর্মীয় ভিক্ষুক, (ছ) বিভিন্ন ছদ্মবেশধারী ভিক্ষুক, (জ) উপজাতীয় ভিক্ষুক, (ঝ) কর্মরত ভিক্ষুক, (ঞ) ছোট ব্যবসায়ী ভিক্ষুক, (ট) সাময়িকভাবে বেকার, (ঠ) কর্মযোগ্য স্থায়ী বেকার, (ড) কর্মে অক্ষম স্থায়ী বেকার, (ণ) কর্মে অনিহাপ্রবণ স্থায়ী বেকার এবং (ত) কর্ম করতে অনিচ্ছুক স্থায়ী বেকার। এটাই হল দারিদ্রের শ্রেণিবিভাজনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা।[৬]

B. C. D. Gupta তাঁর '*Beggars-A Menace to Public Health*' (১৯৪৫) প্রবন্ধে শহরাঞ্চল ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে অবস্থিত ভিক্ষুকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণিকে ৮ টি ভাগে ভাগ করেছেন, - "(a) The destitute, (b) The homeless aged (c) The Crippled, the maimed, the blind, etc., (d) Religious mendicants (e) The lepers and the

diseased persons suffering from infectious diseases, with sores and ulcers covered with plasters on which myriads of flies settle and feed, (f) Children trained by organised bodies or by unscrupulous parents into the profession of begging, (g) Able-bodied but lazy people who roam about in the cities, beg by day, and turn into thieves and robbers by night and become a menace to society, (h) Professional orphans."[৭] ভিক্ষুক শ্রেণির বিভাগ দ্বারা তিনি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই ক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেন।

M. V. Moorthy তাঁর '*Beggar Problem in Greater Bombay*' (১৯৫৯) গবেষণা প্রকল্পটিতে ভিক্ষুকদের চারিত্রিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করার সুবিধার্থে তিনটি বিস্তৃত ভাগে ভাগ করেছেন, - "(ক) Able-bodies (খ) Physically disabled or diseased, (গ) Mentally defective."[৮] P. Varma তাঁর 'Beggars and Vagrants' (১৯৭০) প্রবন্ধে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ভিক্ষুকদের চারিত্রিক বিষয়টিকে ৪ টি ভাগে ভাগ করেছেন, - (ক) Religious (খ) Professional who serve part time as mendicants and beggars, the pull rickshaws and work in factories and aurgument their income by begging, (গ) The diseased and disabled, the support less and orphans, (ঘ) The professional, lethargic, idle, criminal beggar who runs the trade either in organized form or individually.[৯]

সুমিতা চৌধুরী তাঁর '*Beggars of Kalighat Calcutta'* (১৯৮৭) গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের কালীঘাট মন্দিরের ভিক্ষুকদের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি, বয়স এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃতি গত দিকটিকে (ক) Regular এবং (খ) Casual - এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একইভাবে বয়স অনুসারে, - (ক) শিশু ভিক্ষুক, যাদের বয়স (০-১৫), (খ) যুবক

ভিক্ষুক (১৬-৩৫), (গ) মধ্য বয়সী ভিক্ষুক (৩৬-৫৫) এবং (ঘ) বৃদ্ধ ভিক্ষুক (৫৬+) - এই চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। অনুরূপভাবে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে (ক) প্রতিবন্ধী ও (খ) রোগগ্রস্ত, - এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন।[১০]

ভারতবর্ষে ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে পর্যালোচনার দ্বারা সমাজবিজ্ঞানীরা ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। উপরিউক্ত ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ গুলিকে লক্ষ করলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের ভিক্ষুকের অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায়। ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ভিক্ষাবৃত্তির অবস্থান লক্ষ করা যায়। অনুরূপভাবে এই সকল ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগগুলিকে পর্যালোচনা করে বলা যায়, ভিক্ষুকরা দুই ধরনের, যথা: (ক) অ-পেশাদার ভিক্ষুক এবং (খ) পেশাদার ভিক্ষুক।[১১]

'অ-পেশাদার ভিক্ষুক'রা হল প্রকৃত দরিদ্র এবং এই পেশা অবলম্বন ছাড়া তাদের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব। এই সকল ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য সাধারণ মানুষকে কোনো প্রকার ব্যতিব্যস্ত করে না, একইভাবে তারা দরিদ্র হলেও নিজেদের সামাজিক সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। ফলে এই সকল অ-পেশাদারী ভিক্ষুকদের জন্য বিভিন্ন সময় বেশ কিছু সংগঠন ও সরকারী সংস্থা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাছাড়া এই সকল দরিদ্র মানুষদের জন্য বিভিন্ন সংগঠনগুলিতে এদের জন্য দান সামগ্রিক মজুত করা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, অ-পেশাদারী ভিক্ষুকরা সামাজিক পরিস্থিতির শিকার।

অপরদিকে 'পেশাদার ভিক্ষুক'রা বিভিন্ন প্রকার কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, কিন্তু এই সকল মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তিকেও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে এই সকল ভিক্ষুকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মহিলা ও শিশুদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পেশাদার ভিক্ষুকরা অনেক সময় নানা

অপরাধমূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই সকল পেশাদার ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি জনসাধারণের জন্যও ক্ষতিকর।

শহরাঞ্চলগুলিতে ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিভাগ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে আসে। ভিক্ষুকদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ধরন ও তাদের প্রতিবন্ধকতা এবং বিশেষত্বগুলিকে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়, ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিন্যাস প্রকৃতই তাদের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। এটি ঘটনাক্রমে সংশোধনের বা কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং কেন ও কীভাবে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সে বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক। –

উপরোক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রদত্ত ভিক্ষুকদের শ্রেণিবিন্যাসগুলিকে পর্যালোচনা দ্বারা ভিক্ষুক শ্রেণির বিশেষত্বের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসটি হল, - (ক) শিশু ভিক্ষুক (The Child Beggars), (খ) ধর্মীয় ভিক্ষুক (The Religious Beggars), (গ) মানসিক রোগগ্রস্ত ভিক্ষুক (The Mentally Handicapped Beggars), (ঘ) শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক (The Physical Handicapped Beggars), (ঙ) নারী ভিক্ষুক (Women Beggars), (চ) জনজাতি ভিক্ষুক (The Tribal Beggars), (ছ) শারীরিক সক্ষম ভিক্ষুক (The Able-bodied Beggars), (জ) সংগঠিত ভিক্ষুক (Organized Beggars), (ঝ) অভিবাসিত ভিক্ষুক (Migrant Beggars), (ঞ) সাময়িক বা অনিয়মিত ভিক্ষুক (Casual Beggars), (ট) রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক (The Diseased Beggars, (ঠ) বহুরূপী ভিক্ষুক (Polymorphous Beggar), (ড) পেশাদার ভিক্ষুক (Professional/Hereditary Beggars), (ঢ) কর্মে নিযুক্ত ভিক্ষুক (The Employed Beggars), (ণ) অস্থায়ীভাবে বেকার কিন্তু কর্মযোগ্য ভিক্ষুক (The Temporarily

Unemployed but Employable Beggar), (ত) অস্থায়ীভাবে বেকার ভিক্ষুক, যারা কর্মযোগ্য নয় (The Temporarily Unemployed who are Unemployable Beggar), (থ) কর্মযোগ্য ভিক্ষুক, তবে আংশিক স্থায়ী বেকার (The somewhat Permanently Unemployed who are Employable Beggar), (দ) স্থায়ী বেকার ও কর্মযোগ্য নয়, এমন ভিক্ষুক (The Permanently Unemployed and Unemployable Beggar), (ধ) স্থায়ী কর্মক্ষম বেকার ভিক্ষুক, যারা কর্ম করতে অনিচ্ছুক (The Permanently Unemployed who are viciously and incorrigibly Unwilling to work, Employable Beggar) ইত্যাদি।[১২] আবার এই সকল শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগের কিছু কিছু উপ-বিভাগ লক্ষ করা যায়। তাই এই শ্রেণিবিভাগগুলির সাহায্যে ভিক্ষুকদের সম্পর্কে সাময়িক ধারণা পাওয়া যায়।

ভিক্ষুকদের বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রেণিবিভাগের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ভিক্ষুকদের সহজেই নির্দিষ্ট ধরনের বা প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। ভিক্ষুকদের সুসংহত শ্রেণিবন্যাসের মাধ্যমে সারণি - ৫.১-এ একটি রূপরেখা প্রদান করা হল।

সারণি - ৫.১: ভিক্ষুক শ্রেণির সুসংহত শ্রেণিবিন্যাস।

ক্রমিক নং	শ্রেণি	ধরন
১.	জনতাত্ত্বিক বিন্যাস (Demographic Variables)	a) নারী ভিক্ষুক (Women Beggars) b) পুরুষ ভিক্ষুক (Men Beggars) c) শিশু ভিক্ষুক (Child Beggars)
২.	প্রতিবন্ধকতা (Disability)	a) মানসিক রোগগ্রস্ত ভিক্ষুক (Mentally Handicapped Beggars) b) শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক (Physical Beggars) c) শারীরিক সক্ষম ভিক্ষুক (Able-bodied Beggars)

		d) অন্যান্য রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক (Diseased Beggars)
৩.	কর্মসংস্থান (Employment)	a) কর্মে নিযুক্ত ভিক্ষুক (Employed Beggars) b) অস্থায়ীভাবে বেকার কিন্তু কর্মযোগ্য ভিক্ষুক (Temporarily Unemployed but Employable Beggar) c) অস্থায়ীভাবে বেকার ভিক্ষুক, যারা কর্মযোগ্য নয় (Temporarily Unemployed who are Unemployable Beggar) d) কর্মযোগ্য ভিক্ষুক, তবে আংশিক স্থায়ী বেকার (Somewhat Permanently Unemployed who are Employable) e) স্থায়ী বেকার ও কর্মযোগ্য নয়, এমন ভিক্ষুক (Permanently Unemployed and Unemployable) f) স্থায়ী কর্মক্ষম বেকার ভিক্ষুক, যারা কর্ম করতে অনিচ্ছুক (Permanently Unemployed who are viciously and incorrigibly Unwilling to work, employable)
৪.	আচরণগত (Attitude)	a) সংগঠিত ভিক্ষুক (Organized Beggars) b) সাময়িক বা অনিয়মিত ভিক্ষুক (Casual Beggars) c) পেশাদার ভিক্ষুক (Professional/Hereditary Beggars) d) বহুরূপী ভিক্ষুক (Polymorphous Beggar)
৫.	সামাজিক-সাংস্কৃতিক (Socio-Cultural)	a) ধর্মীয় ভিক্ষুক (Religious Beggars) b) জনজাতি ভিক্ষুক (Tribal Beggars)
৬.	অভিবাসন (Migration)	a) সর্বস্বান্ত/নিঃস্ব ভিক্ষুক (Destitute Beggars) b) গৃহহীন ভিক্ষুক (Lost Home Beggars) c) অভিবাসিত ভিক্ষুক (Migrant Beggars)

সূত্র: Census of India, 2011: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population: Table A-5,* (New Delhi: Registrar General and Census Commissioner, Government of India).

৫.৩.১. নারী ভিক্ষুক:

ভারতবর্ষে অন্যান্য ভিক্ষুকদের ন্যায় নারীরা অধিকমাত্রায় ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত হন। নারীদের ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ লক্ষ করা যায়, যেমন - বৃদ্ধা, বিধবা এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি। এই সকল নারীরা সমাজে বিকল্প কর্ম সংস্থান করতে না পারায় ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।[১৩] ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা ও সুযোগ না থাকাই তাদের বিভিন্ন প্রান্তিক জীবিকা ও

পতিতাবৃত্তিতে যুক্ত হতে হয়। এই সকল কর্ম থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলে বিকল্প কর্ম হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি তাদের প্রধান জীবিকাতে পরিণত হয়। এবং তাঁরা পুরুষ ভিক্ষুকদের তুলনায় অধিক উপার্জন করেন। অনুরূপভাবে শিশু ও কিশোরী ভিক্ষুকদের ক্ষেত্রে এই পেশা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। M. S. Gore ১৯৫৯ সালে Delhi School of Social Work-এর সঙ্গে যৌথ পরিচালনায় দিল্লির ভিক্ষুকদের উপর একটি সমীক্ষার সাহায্যে উল্লেখ করেন, - দিল্লিতে প্রায় ১৮,০০০ নারী ভিক্ষুকের অবস্থান।[১৪] ১৯৭১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ১০,১১,৬১৯ জন। যার মধ্যে ৪,২০,১১৮ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১৫] ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭,৫০,৩০৭ জনের মধ্যে ২,৯৯,৮৮৮ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১৬] ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে ২,১০,৩১৯ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১৭] ২০০১ সালে সংখ্যাটি ৬,৩০,৯৪০ জন। যার মধ্যে ৩,০৫,৯৯৪ জন মহিলা ভিক্ষুক।[১৮] অনুরূপভাবে ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতবর্ষে ১,৯১,৯৯৭ জন নারী ভিক্ষুক[১৯] এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৮,১৫৮ (৫৯.২৮ শতাংশ) জন নারী ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত।[২০] পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ ভিক্ষুকদের তুলনায় নারী ভিক্ষুক অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায়, কারণ পুরুষদের তুলনায় নারী ভিক্ষুকদের আয় অধিক পরিমানে হয়ে থাকে এবং নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকাও এই সমস্যার কারণ।

৫.৩.২. পুরুষ ভিক্ষুক:

ভারতে ১৯৭১-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়পর্বে পুরুষ ভিক্ষুকদের সামগ্রিক চিত্রকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, পুরুষদের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। এক্ষেত্রে পুরুষ ভিক্ষুকদের সামাগ্রিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, - ১৯৭১ সালের আদমশুমারির

প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ১০,১১,৬১৯ জন। যার মধ্যে ৫,৯১,৫০১, জন পুরুষ ভিক্ষুক।[২১] ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭,৫০,৩০৭ জনের মধ্যে ৪,৫০,৪১৯ জন পুরুষ ভিক্ষুক।[২২] ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে ৩,৩২,৫৫৬ জন পুরুষ ভিক্ষুক।[২৩] ২০০১ সালে সংখ্যাটি ৬,৩০,৯৪০ জন। যার মধ্যে ৩,২১,৬৯৪ জন পুরুষ ভিক্ষুক।[২৪] এবং ২০১১ সালে সংখ্যাটি ৪,১৩,৬৭০ তে নেমে আসে। এর মধ্যে ২.২ লক্ষ পুরুষ।[২৫] তবে ভিক্ষুকের এই সংখ্যাটি কোনো অংশে কম নয়। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৮১,২৪৪ জন এর মধ্যে ৩৩,০৮৬ (৪০.৭২ শতাংশ) জন পুরুষ।[২৬]

৫.৩.৩. শিশু ভিক্ষুক:

ভিক্ষুকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবনমিত অবস্থান হল শিশুদের। প্রাথমিকভাবে শিশুরা একটি প্রাপ্তবয়স্ক ভিক্ষুকদের সাহায্যকারী হিসাবে এই পথে অগ্রসর হয়। সেটা তার পিতা, মাতা, আত্মীয় বা অপরিচিতও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুদেরকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সকল শিশুরা রাস্তায় ভিক্ষা করতে থাকে ততক্ষন, যতক্ষন না তাদের কোনোরকম অনাথ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতে বিশেষত কলকাতায় এই ধরনের খুব একটা প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে এই সকল শিশুরা পেশাদারী ভিক্ষুকদের সঙ্গে মিশে ক্রমশ পরিণত ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হন। পিতা-মাতার জ্ঞানত বা অজ্ঞনতায় ক্রমশ এরা বিকলাঙ্গতার শিকার হয়ে পড়েন। এই সকল শিশুদের পা অথবা হাত অক্ষম করে দেওয়া হয়, যাতে ভিক্ষার সময় মানুষের সহানুভূতি অর্জন করে বেশী উপার্জন করতে পারে। অনেকে যত্নের অভাবে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় যা প্রকারান্তরে তাদের উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রায়শই এই সমস্ত শিশুদের পিতা-মাতারা উপকৃত হন যদি তাদের সন্তান বিকলাঙ্গ হন।

কারণ এটি পরোক্ষভাবে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি করে। অপরক্ষেত্রে কিছু কিছু শিশু দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় তাদের উপার্জন কম হয়। আবার যারা স্বাভাবিক বুদ্ধিমান শিশু তারা রাস্তায়, ট্রেনে, ট্রামে, রেলস্টেশনে ভিক্ষা করে। গান গায় অথবা অন্ধ সাজার ভান করে। অন্যরা আবার জুতো পালিস করে জনগনের কাছে সাহায্য চায়।

M. K. Munshi (১৯৪০) বোম্বাইয়ের শিশুভিক্ষুকদের একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, – "Beggary would not be a preferable trade if there were no children to attract the customer's attention. The bagger child, therefore, he is the most valuable asset in the trade; and as such is sold, bartered or mortgaged. The ordinary price at which a blind child can be bought is Rs 5, that of a crippled one is Rs 3 - What about the poor child? It is beaten, thrashed, branded into learning the art of attracting your sympathy. Near the general post office, a little boy…. After hour of crime the boy would get tired; the guardian who sad a little farther away branded the child's hand by a lighted *biri* whenever the child's strength to whine failed. The man has got red handed. Crippled children are also parked out in the city to beg so called upcountry orphanages also bring stray children and train them to beg in the city to collect arms for their institutions."[২৭]

তিনি আরও দেখিয়েছে, গণিকালয়গুলিতে শিশুরা ভৃত্য হিসাবে কাজ করে। রাতে তারা বিভিন্ন রকম জিনিস পত্র বিক্রি করে। বম্বে সিটি পুলিশ এই সকল স্থান থেকে প্রচুর শিশু উদ্ধার করে হোমে নিয়ে যায়। শহরের শিশু ব্যবসার অন্যরূপটি হল 'Champiwalas' পেশাভিত্তিক অঙ্গমর্দক। এই শিশুগুলিকে বেশীরভাগ উত্তর ভারত থেকে নিয়ে আসে তাদের মালিকরা তাদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য। অন্যভাবে বলা যায় সমকামী বাসনার শিকার হতো এই শিশুরা। বোম্বাইতে আরো এক ধরনের শিশু কর্মী দেখা যায়, যাদের গোয়া,

ব্যাঙ্গালোর এবং কিছু দক্ষিণ ভারত থেকে আমদানি করা হয় মুম্বাইয়ে। এই সমস্ত শিশুদের বয়স ৭ থেকে ১০ বছর। এই শিশুগুলির সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করে চলে বিভিন্ন পরিবারে। এদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। যদি সেই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কাজ না করতে পারে তাকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।[২৮] বোম্বের Children Aids Society-এর তথ্য থেকে Mr. Munshi সাত বা আট ধরনের শিশু ভিক্ষুকের কথা বলেছেন এবং পশ্চিমি দেশগুলির সাথে তুলনা করেছেন।

ভারতের প্রতিটি শহরগুলিতে অধিকমাত্রায় শিশু ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিক কালে ভারতে প্রায় তিন লক্ষ শিশু ভিক্ষুক আছে। অনুরূপভাবে কিছু কিছু সংগঠন এই সংখ্যাটি প্রায় ১ মিলিয়ন বলে অভিহিত করেন।[২৯] ভারতের প্রতি বছর প্রায় ৪৪ হাজারের বেশি শিশু বিভিন্ন অপরাধমূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৩০] এবিষয়ে বেশ কিছু সংগঠন, যেমন - All India Citizen Alliance for Progress and Development (AICAPD), Innovation Mobile Schools এবং J. K. Business School ইত্যাদি শিশু পাচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরগাঁও বিভিন্ন শহরগুলিতে সমীক্ষা করেন। এই সংগঠনগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরের শিশু ভিক্ষুকদের গড় বয়স কত? সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে শিশুদের গড় বয়স ৬ থেকে ১৬ বছর (এখানে একটি বিষয় স্পষ্ঠ যে ভারতের সংবিধান স্বীকৃত সাবালকের বয়ক্রমের নিম্নে অবস্থান করেও তারা এই ধরনের কাজে যুক্ত হচ্ছে)। এই সমীক্ষাটি হয়েছিল ২৫ শে জানুয়ারী থেকে ৫ ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪। এটি মূলত গুরগাঁওয়ের মেট্রো স্টেশন, শপিং মল, ট্রাফিক সিগন্যাল, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৪ হাজার মেয়ে ও ২ হাজার ছেলে শিশুদের উপর। অনুরূপভাবে, সমীক্ষাটিতে দেখা যায় প্রায় ৯৫ শতাংশ শিশু যারা কোনোদিন স্কুলেই যায় নি এবং ৮০ শতাংশ শিশু যারা তাদের ভিক্ষাস্থান সংলগ্ন কোনো ব্রিজের নীচে বসবাস করে। এছাড়া ২০ শতাংশ যারা গ্রাম থেকে রুটি-রোজগারের জন্য

শহরে আসে ভিক্ষার জন্য। সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় আমরা এই ঘটনাকে Crisis Migration ও Daily Migration-এর পর্যায়ে ফেলতে পারি। সমীক্ষা থেকে জানা যায় এদের মাসে প্রায় ৫০০০ থেকে ১২০০০ টাকা উপার্জন হয়। এক্ষেত্রে ছেলেদের উপার্জন কম হয় বলেও দেখা গেছে। মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে এরা এখানে সামিল হন বলে জানা গেছে।[৩১]

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে Hyderabad Council for Human Welfare হায়দ্রাবাদ শহরে ১১ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুভিক্ষুকদের উপর একটি সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৮৫ শতাংশ ভিক্ষুক তাদের নিজেদের ইচ্ছায় এই পেশায় যুক্ত হয়েছে, ১২ শতাংশ আছে যারা তাদের বাবা মায়ের দ্বারা এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ শারীরিক সক্ষম (Able-Bodied Person)। ১০৪৪৬ জন ভিক্ষুকের মধ্যে আনুমানিক ২১ শতাংশের মাসিক আয় ২০০০ টাকার বেশি, যেখানে ৪৭ শতাংশের আয় ৯০০-২০০০ টাকার মধ্যে। আবার ৩০ শতাংশের আয় ৯০০ টাকার নীচে। এই সমীক্ষা থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে যে, এই সকল ভিক্ষুকদের মধ্যে ৬০ শতাংশ গৃহহীন। এছাড়া ৯২ শতাংশ ভিক্ষুক আছে, যারা তাদের আয়ের অংশ খাদ্য, বাসস্থান, নেশা এবং বিনোদনের জন্য ব্যয় করেন।[৩২]

সমগ্র পৃথিবীতে শিশু ভিক্ষুকদের জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত করাকে সমাজবিজ্ঞানের গবেষক Emily Delap দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন, - পিতামাতা ও অভিভাবকদের দ্বারা বাধ্য হওয়া শিশু ভিক্ষুক এবং ‘তৃতীয় পক্ষ’ দ্বারা বাধ্য হওয়া শিশু ভিক্ষুক। প্রথম ক্ষেত্রে সামাজিক শিষ্টাচারকে অতিক্রম করে শিশুদেরকে বাধ্য করা হয় বা

মানসিকভাবে ভয় দেখানো হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবক ব্যতীত পরিবার বহির্ভূত আত্মীয় বা অপরাধকারী গোষ্ঠীর দ্বারা শিশুরা এই পথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়।[৩৩]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, কলকাতার পথশিশুদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য হল, - (১) স্বাধীনচেতা; (২) প্রখর, কঠোর এবং অত্যন্ত সচল জীবনযাপনের প্রয়াসী; (৩) নেতা হবার গুণ আছে; (৪) অপরকে বিশ্বাস করে না; (৫) প্রায়শই অপরের দ্বারা শোষিত হয়; (৬) সমাজে এদের কোনো স্থান নেই।[৩৪] অচ্ছুৎ-বহির্ভূত করে রেখেছে। কলকাতার ফুটপাথে থাকে এরা। ১৪ বছরের নীচে এদের বয়স। ফুটপথ ও বস্তি মিলে মোট ৭ লাখ ১৩ হাজার ৫৩১ জন শিশুর অস্তিত্ব দেখা যায়। এর মধ্যে ফুটপাতে আছে ৭০ হাজার। কলকাতা পুরসভার ১৪১ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১ টি ওয়ার্ডে ডেমোগ্রাফিক্যাল সার্ভে চালিয়ে সি.এম.ডি-এ দেখেছে গড়ে ৫০০ জন শিশু এক একটি ওয়ার্ডের রাস্তায় 'ফুটে' বাসস্থান গড়ে তুলেছে। সংখ্যাটা প্রায় ৭০ হাজারের বেশিই হবে।[৩৫]

তবে পথ শিশুদের সংজ্ঞা নিয়ে তাত্ত্বিক মহলে কিছুটা বিতর্ক লক্ষ করা যায়। ইউনিসেফ'র সংজ্ঞা অনুযায়ী, এই ৭০ হাজার শিশুই অবহেলিত, পরিচর্যাহীন, যারা বেঁচে থাকতেই সংগ্রাম চালায় নিরন্তর। এরা ব্যাপক অর্থে ফুটপাথ এবং বস্তির শিশুদের থেকে আলাদা। ইউনিসেফ-এর তথ্য অনুযায়ী, এরা - (১) কোনো পরিবারের সঙ্গে কোনো রকমভাবে যুক্ত নয়। সুযোগ থাকলেও বাসস্থান হিসাবে বেছে নেয় ফুটপাত ও রাস্তা; (২) অসহায় পরিবেশে বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তায় চলে আসে এবং সেখানেই থেকে যায়। সেখানেই জীবনযাপন, রোজগার বেঁচে থাকার সব উপকরণ খুঁজে নেয়; (৩) একেবারে সহায়-সম্বলহীন ও পরিবার পরিত্যক্ত এরা। আর্থিক বা মানসিকভাবে সাহায্য করারও কেউ নেই এদের।[৩৬]

পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখলে প্রায় ৭০ হাজার পথ শিশুর কথা জানা যায়, যাদের কোনো পরিচয় নেই। এরা প্রকৃত অর্থে 'কেউ নেই' পরিচয়ে পরিচিত। যাদের বাসস্থান বলতে ফুটপাত। এরা পৃথিবীর সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। এদের নেই স্কুল, নেই বই-খাতা-পেন্সিল। নাগরিক সমাজের সমস্ত সুযোগ থেকেই এরা বঞ্চিত। আজ এই অবহেলিত পথ শিশুদের নেই চকলেট-বিস্কুট-টিফিন, বক্স-জলের ফ্লাস্ক এবং জীবনধারণ বা বেঁচে থাকার নিশ্চিত পথ পরিক্রমা। আজ তারা সমাজ ব্যবস্থার এই নিষ্ঠুর নিয়মে খেলনা পিস্তলের বদলে হাতে তুলে নিয়েছে সত্যিকারের ছুরি, রোবো নেই, অথচ আছে কোদাল-শাবল। খেলনা গাড়ি নেই, অথচ আছে বাসে, ট্রেনে, ট্রামে, ফুটপাতের রাস্তায় প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি।[৩৭]

প্রাত্যহিক শহুরে জীবন যখন থেকে সচল হয়, তখন থেকেই শুরু হয় এদেরও জীবন যুদ্ধ। হাতিয়ার, ছোট ছোট পা, হাত, গোটা শরীর। বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় কাজই করে এরা। এরা পথ শিশু। ছোট চুরি, ওস্তাদের ফাই-ফরমাশ খাটা, চায়ের দোকানে গ্লাস ধোয়া, হোটেলের থালা ধোয়া, নোংরা কুড়ানো, চুল্লুর ঠেকে নানারকম কাজ, 'যৌনকর্মী' দিদি, মাসীর কাজ, জল এনে দেওয়া, দালালের ফাই-ফরমাশ খাটা, দাদার ফরমাশ খাটা, ভিক্ষে করা, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করা, কাগজ কুড়নো, বাবুর বাড়ি কাজ করা ও জুতো পালিশ ইত্যাদি, এ সবই হল পথ শিশুদের কাজ। জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট, ১৯৮৬ অনুযায়ী, ছেলেদের ১৬ এবং মেয়েদের ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৮] এই সমস্ত শিশুরা অপরাধ করলে জুভেনাইল কোর্টে এবং বোর্ডে এদের বিচার হয়। এই শিশুদের, মূলত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যথা, (১) উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশু; (২) মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু; (৩) নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু এবং (৪) ফুটপাতের অনাথ শিশু।[৩৯]

৫.৩.৪. মানসিক রোগগ্রস্ত ভিক্ষুক:

এই ধরনের ভিক্ষুকদের মধ্যে দুর্বল মস্তিষ্ক এবং মানসিক রোগগ্রস্তরা অন্তর্ভুক্ত। এই দুর্বল মস্তিস্কের মানুষদের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায় বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে। Davice-এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন মানসিক এবং সামাজিক উপাদানকে নির্দেশ করে যা নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে নিম্ন গুণসম্পন্ন বুদ্ধ্যঙ্ককে নির্দেশ করে। এবং মানসিক রোগ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। নার্ভের সমস্যা এবং শরীরের অন্যান্য অংশের সমস্যার জন্য দুর্বল মস্তিষ্ক সম্পন্নদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, - (ক) The Micro Cephalic (যাদের মাথার খুলি অস্বাভাবিক ছোট); (খ) The Hydro Cephalic (যাদের মাথার খুলি অস্বাভাবিক বড় এবং মনে করা হয় যে জল জমেছে); (গ) The Paralytic (পক্ষাঘাত গ্রস্থ) এবং (ঘ) The Traumatic (আঘাত মূলক)।[৪০]

শিক্ষা সংক্রান্ত সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে দুর্বল মানুষদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, - (ক) Asylum Care; (খ) Custodial Life and Perpetual guardianship; (গ) Long apprenticeship and colony life under protection (ঘ) Training for a vacation।[৪১]

অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে মানসিক প্রতিবন্ধীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: Idiots, Imbeciles এবং Morons।[৪২] ভারতে এইসকল মানসিক প্রতিবন্ধীদের কোনো হিসেব রাখা হয়নি। অথবা তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়নি। এই সকল শ্রেণির সমস্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে সরকারিভাবে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে। এই ধরনের মানসিক রোগীরা বিভিন্ন অপরাধ করে থাকে। তবুও আমাদের সমাজ তাদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। অবশ্যই এই সকল মানুষের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞাত। যদি সমাজ

এই সকল মানুষের বিষয়ে অজ্ঞাত বা উদাসীন থাকে তাহলে সমস্যা আরো বাড়বে। এই ধরনের মানুষ রাস্তায় অদ্ভুত আচরণ করলে তাদেরকে উন্মাদ মনে করা হয়। অনেক ভিক্ষুক এরকম রাস্তায় পশুদের মতো জীবনযাপন করে। এই ধরনের ভিক্ষুকরা এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকে এবং বিভিন্ন প্রাত্যহিক কাজ করে, ফলে সেখানে জীবানু, মশা, মাছি তাকে আবৃত করে যতক্ষণ না কাক তাদেরকে ঠুকরে খায়, ততক্ষন তারা ওই স্থান ত্যাগ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে চলে যায়। এমনকি এদের জন্য কোনো রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না।

৫.৩.৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক:

ভারতবর্ষে ভিক্ষুক জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়, এই সকল প্রতিবন্ধী মানুষের অধিক সংখ্যা জন্মগত কারণে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যেমন অন্ধত্ব, মূক-বধিরতা, অঙ্গ বা শারীরিক বিকলাঙ্গ ইত্যাদি মানুষের একটি বড় অংশ কোনো প্রকার কর্মসংস্থান করতে না পারার কারণে বিভিন্ন দাতব্য বা ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে জীবন ধারণ করে। প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের মধ্যে একটি বড় অংশ অন্ধত্বের শিকার। অন্যান্য ভিক্ষুকদের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের প্রতি সাধারণ জনগনের সহানুভূতি সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল সমাজে অন্যান্য ভিক্ষুকদের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের আয় অধিক।[৪৩] ফলে অন্যান্য ভিক্ষুকদের দ্বারা শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকরা অনেক সময় অ-মানবিক এবং নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে থাকেন। এই সকল প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকরা সহজেই জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য পেতে সক্ষম।

মূক-বধির ভিক্ষুকরা বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম বা কৃষিকাজ করতে পারলেও তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয়। যেহেতু অন্ধ-মূক-বধিররা প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হয়, তাই এদের প্রতিকারের কোনো চিন্তাভাবনা করা হয় না। অনেকেই আছেন যারা শুনতে পায় কিন্তু বলতে পারে না, অনেকে আবার বলতে পারে না, তবুও তারা 'প্রতিবন্ধী' বলে বিবেচিত হয়। তাই তারা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৪৪] এই দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহ দান করে যে অনেক ছদ্মবেশী ভিক্ষুক হিসাবে নিজেদের 'অন্ধ-মূক-বধির' বলে পরিচয় দেয়।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা অন্ধ-মূক-বধিরদের তুলনায় ভিক্ষাবৃত্তিতে সমাজে বেশিরভাগ অংশের সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হন। বিকলাঙ্গ যারা তারা অধিকমাত্রায় মানুষের সহানুভূতি পায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় কোনো একজন দুর্ঘটনার ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তার কিছু করার থাকে না। এই প্রতিবন্ধীরা বিভিন্নভাবে একে অপরের চেয়ে আলাদা। বেশিরভাগ শিশুদের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি বিভিন্ন রোগের কারণে। সেগুলি সঠিক সময়ে প্রতিরোধ না করার জন্য Infantile Paralysis, T.B of the Bone, Spastic Paralysis, Cardiac Defects, Rickets, Amputations, Congenital defects, Sleeping Sickness, Accidents প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।[৪৫]

শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার প্রয়োজন। সংবিধানে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হলেও এই সকল মানুষের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না, বা তাদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন করা হয় না। এই সকল মানুষদের প্রতিবন্ধী আইন, ১৯৯৫ (Persons with Disabilities Act, 1995) অনুসারে, সমান সুযোগ (Equal Opportunities), সংরক্ষণের অধিকার (Protection of Rights) এবং পূর্ণ অংশগ্রহণের (Full Participation) কথা বলা হয়েছে।[৪৬] শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের জন্য

বিভিন্ন অধিকারের কথা বলা হলেও সে বিষয়গুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করা হয় না, ফলে সমাজে এই সকল দুঃস্থ মানুষজনের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি প্রধান জীবিকায় রূপান্তরিত হয়।

৫.৩.৬. শারীরিক সক্ষম ভিক্ষুক:

এই ধরনের ভিক্ষুকরা সাহায্যের জন্য মানুষকে বিরক্ত করে তোলেন। ভিক্ষাবৃত্তিটা তাদের জন্মগত অধিকার বলে জানাতে চায়। যদি কোনো লোক তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেন কাজ না করে ভিক্ষা করে। তখন প্রত্যুত্তরে এমনভাবে গালিগালাজ করে যে প্রশ্নকারী অসম্মানিত বোধ করবে। এদেরকে কোনো কাজে যুক্ত করলেও এরা নানা অজুহাত দেখিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষার কাজে ফিরে যায়। যদি তাদেরকে কোনোভাবে আটকে রাখা হয় কোনো হোমে বা কাজের জায়গায়, তখন তারা চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না থেকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা বলে। আবার তাদের লোভনীয় বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও, তা অস্বীকার করবে কাজ করতে।[৪৭]

৫.৩.৭. অন্যান্য রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক:

মানসিক রোগী ভিক্ষুকদের থেকে বিভিন্ন রোগের পীড়িত ভিক্ষুকদের অবস্থা আরও খারাপ। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল তাদেরকে স্বাধীনভাবে রাস্তা, হোটেল এবং রেলে ভিক্ষা করতে দেওয়া হয় না তাদের রোগের সংক্রামণের কথা মাথায় রেখে। ভারতে সমাজতাত্ত্বিকরা প্রায়শই নৈতিকতার কথা বলেন, কিন্তু তারা দূরারোগ্য রোগী থেকে শুরু করে মৃত ভিক্ষুক মানুষের কথা ভাবেন না। যদি দেশের সর্বত্র এই রোগগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা আর কোথাও সাহায্যের জন্য ঘুরবে না। আর রোগের সংক্রামনও ছড়াবে না।[৪৮]

৫.৩.৮. কর্মে নিযুক্ত ভিক্ষুক:

এটি শর্তাদিতে একটি বৈপরীত্য বলে মনে হতে পারে তবে ভারতে এমন অনেক পুরুষ ও মহিলা রয়েছেন যারা কলকারখানায় রাতের শিফটে কাজ করেন এবং দিনের বেলা ভিক্ষাবৃত্তি করেন। প্রায়শই তাঁরা দিনের বেলা ভিক্ষা করে এবং রাতে কারখানায় বা বিভিন্ন প্রান্তিক জীবিকার দ্বারা অধিক উপার্জন করেন। কাজেই তাদের উপস্থিতি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া কাজের অস্থিতিশীল প্রকৃতি এবং চূড়ান্ত দরিদ্র মজুরি প্রায়শই ভিক্ষা করার প্ররোচনা হিসাবে কাজ করে।[৪৯] এভাবে রাতের মজুর দিন দিন ভিক্ষুক হয়ে ওঠার কৌতূহলী ঘটনাটি আমাদের কাছে রয়েছে। তারা তাদের দেহকে বিকৃত বা ভূপতিত করে ভেজানোর ভান করে এবং ধর্মীয় সংশোধনকারীর পোশাক পরিয়ে দেয় এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে যেন তারা পেশাদার ভিক্ষুক শ্রেণির অন্তর্গত। কখনও কখনও তারা জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার 'শিল্পে' এতটাই দক্ষ হয় যে, তারা পেশাদার ভিক্ষুককে ছাড়িয়ে যায় এবং তাদের চেয়ে বেশি উপার্জন করে।

৫.৩.৯. অস্থায়ীভাবে বেকার কিন্তু কর্মযোগ্য ভিক্ষুক:

প্রান্তিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত অদক্ষ শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ও বিভিন্ন কল-কারখানায় অনিয়মিত ও সাময়িক চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী হিসেবে যোগ দেওয়ায় এই সকল শ্রমিক শ্রেণির জীবনধারণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়।[৫০] এই সকল প্রান্তিক শ্রমিক শ্রেণিকে পূর্বাবস্থায় কর্মসংস্থানগুলিতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। কর্মসংস্থান অনিয়মিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ছুটির দিনগুলির মতো শ্রমবিমুখতা অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে কর্মসংস্থানে অনিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অদূরদর্শিতা নেমে আসে। কর্মসংস্থানের অনিয়মিত হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ লক্ষ করা যায়, যেমন - ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যা, প্রান্তিক জীবিকা থেকে বিচ্যুতি, শারীরিক অসুস্থতা ও

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। কর্মসংস্থানের অনিয়মিতের কারণগুলি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে উদ্বেগ নিয়ে আসে এবং যখন তারা যথাযথ জীবিকা অর্জন করতে পারে না, ফলে ধীরে ধীরে তারা অভ্যাসগতভাবে ভিক্ষুকে পরিনত হয়। এই ধরনের সামাজিক সমস্যার জন্য যথোপযুক্তভাবে কর্মসংস্থান এবং অস্থায়ী বেকার কর্মযোগ্য ভিক্ষুকদের বিভিন্ন প্রান্তিক জীবিকার সাথে যুক্ত করা যায়, তাহলে এই সকল অস্থায়ী বেকারত্বের মানুষদের ভিক্ষাবৃত্তির থেকে বিরত করা যেতে পারে।[৫১]

৫.৩.১০. অস্থায়ীভাবে বেকার ভিক্ষুক, যারা কর্মযোগ্য নয়:

এই শ্রেণির বেকারগণ ব্যবসা অথবা বাজারে তাদের কোনো ক্ষতির কারণে জীবিকাহীন হয়ে পড়েন। তারা বিকল্প কর্মসংস্থান বা অন্য কোনো ব্যবসায় যুক্ত হতে না পেরে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। যদিও নির্দিষ্ট সময়ে তারা বিকল্প জীবিকা বা কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে পারেন তাহলে এই শ্রেণির জীবিকাহীন মানুষজন ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকেন।[৫২]

৫.৩.১১. কর্মযোগ্য ভিক্ষুক, তবে আংশিক স্থায়ী বেকার:

কিছু ভিক্ষুক রয়েছে, যারা অস্থায়ীভাবে বেকার কিন্তু কর্মযোগ্য ভিক্ষুকদের থেকে আলাদা। এই ধরনের জীবিকাহীন অস্থায়ী বেকাররা কিছু সময়কালের পরে তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। তারা স্বল্প মজুরি, অদক্ষ শ্রমিক এবং শিল্প ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে অনিয়মিত ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে তারা অবিচ্ছিন্ন কর্মসংস্থান গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে। এই সকল প্রান্তিক মানুষজন শিল্পাঞ্চল বা শহরাঞ্চলগুলিতে যে অবস্থায় জীবন ও জীবিকা পরিচালন করেন, তার ফলে তাদের স্ব-সম্মান এবং ব্যক্তিগত আত্মাভিমান ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে। এই সকল অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অধিক জনবহুল, গোপনীয়তার অভাব এবং অশালীন জীবনযাত্রার জন্য প্রায় সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এই প্রান্তিক শ্রমিক শ্রেণির শ্রমের কঠোরতা, শ্রমের নির্দিষ্ট সময় না থাকা এবং কর্মস্থানে অ-সহযোগীতা ইত্যাদি ঘটনা তাদের কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে নিয়মিত পেশাদার ভিক্ষুকে পরিণত করছে।[৫৩]

৫.৩.১২. স্থায়ী বেকার ও কর্মযোগ্য নয়, এমন ভিক্ষুক:

এই শ্রেণির জীবিকাহীন মানুষজন স্থায়ীভাবেই কর্মহীন, কারণ তারা অদক্ষ কর্মচারী ও কর্মে অক্ষম। যদিও এই শ্রেণির মানুষজন ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করেন এবং খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য তাঁরা কোনো প্রকার জীবিকা গ্রহণ করেন না। সাধারণত এই শ্রেণির মধ্যে মানসিক রোগগ্রস্ত, দুর্বলচেতা, বিভিন্ন রোগগ্রস্ত, স্থায়ীভাবে জীবিকাহীন এবং বেকার মানুষজন কর্মের পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন।[৫৪] সাধারণভাবে এই শ্রেণির মানুষজন শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কর্মে অক্ষম। ফলে তারা নিয়মিত জীবিকা অর্জনের পরিবর্তে বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করে থাকেন।

৫.৩.১৩. স্থায়ী কর্মক্ষম বেকার ভিক্ষুক, যারা কর্ম করতে অনিচ্ছুক:

এক ধরনের স্থায়ী বেকার দেখতে পাওয়া যায়, যারা অলস, মানসিক রোগগ্রস্ত, এবং যাযাবর প্রকৃতির। এরা মূলত কর্ম করতে অনিচ্ছুক। অর্ধ-অপরাধী, অলস এই ব্যাক্তিরা ভিক্ষাবৃত্তি ও দানের ওপর নির্ভর করে এবং পুরো গোষ্ঠীর উপর প্রভাব পড়ে। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তাদের নৈতিকতার অবনমনের কারণে তারা জীবনের গতিপথ হারিয়ে ফেলে। কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা এদের সঙ্গে কথা বলে না। একমাত্র সরকারি পদক্ষেপে ‘Penal Labour Colony’-র মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। তাদের অপরাধী ভাবা উচিত নয়। পরিবর্তে তাদেরকে সহনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তাদেরকে বিনোদনমূলক বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা উচিত, যা তারা মানসিকভাবে গ্রহণ করতে

পারে।[৫৫] বস্তুত জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার সাহস না থাকায় তাদের এই অবস্থা। তারা জীবনের কোনো এক দুর্ভাগ্যের কারণে অন্য জীবন বেছে নেয় এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ করতে থাকে।

এই ধরনের দুর্বৃত্ত ও বিশৃঙ্খল ব্যক্তিরা ভবঘুরে হয়ে অর্ধ-অপরাধীর মতো জীবনযাপন করে এবং অভ্যাসগতভাবে দান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে এবং অবশেষে পুরো সম্প্রদায়ের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। ফলত এরা সমাজের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তাই এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।[৫৬] এই ধরনের সমস্যার সমাধানের দ্বারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি তখনই সাধিত হবে, যখন সরকার কর্তৃক শ্রম উপনিবেশ বা পেনাল লেবার কলোনি স্থাপন করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এর দ্বারা কোনোভাবেই বোঝায় না যে, তাদের সঙ্গে অপরাধীদের মতো আচরণ করা হচ্ছে। এর জন্য তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে যত্ন নিতে হবে। পেনাল কলোনিগুলি 'Psychiatric Sanitary'-র মতো হওয়া উচিত, যেখানে চিকিৎসা কর্মসূচির কাজ ও স্বাস্থ্যকর বিনোদনের একটি সুষম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে সর্বাধিক সুস্থ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সরবরাহ করা যায়।[৫৭]

৫.৩.১৪. সংগঠিত ভিক্ষুক:

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরাঞ্চলে বেশ কিছু ধর্মীয় স্থান ও জনবহুল অঞ্চলগুলিতে সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তির চিত্র লক্ষ করা যায়। এই সকল ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তিকে অন্যান্য জীবিকার ও ব্যবসায়িক পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে তারা একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মোড়কে গড়ে তোলে। সংগঠিত ভিক্ষুকদের এই কার্যক্রম পরিচালনা করে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি, এছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত অর্থ ও অন্যান্য

সামগ্রিক ও সংগঠনের অন্যান্য ভিক্ষুকদের পরিচালনের দিকটিও সেই ব্যক্তিই পরিচালনা করে। সংগঠিত ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য শিশুদের অপহরণ করে ভিক্ষা ও অন্যান্য অসামাজিক কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করে এবং এই কর্মের পরিবর্তে তাদের সামান্য কিছু খাবার ও আশ্রয় দিয়ে থাকে। সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক অপরাধ, যার প্রধান ভুক্তভোগী শিশুরা।[৫৮] এই সকল সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য ১৮৬০ সালে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে'র ৩৬ নং ধারায় অপহরণের জন্য ১০ বছরের কারাবাস এবং শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ আইনে যথাযথ শাস্তির কথা বলা হয়েছে।[৫৯] অনুরূপভাবে সকল সংগঠিত ভিক্ষুকরা কিছু সময় দাতব্যের নামে ভিক্ষাবৃত্তি করে থাকেন। সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তিকে সমাজের একটি বৃহৎ সংখ্যক মানুষ পেশা হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই পেশার দ্বারা অধিক মাত্রায় অর্থ উপার্জন করে থাকেন।

৫.৩.১৫. সাময়িক বা অনিয়মিত ভিক্ষুক:

ভিক্ষুক শ্রেণির একটি বিরাট অংশ কর্মহীন বা বেকার এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা প্রান্তিক জীবিকা সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে চরম অর্থসঙ্কটের কারণে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৬০] এদের মধ্যে বেশির ভাগ গ্রামীণ অদক্ষ শ্রমিক, যারা সাধারণত শহরাঞ্চলে জীবিকার কারণে আসে, কিন্তু শহরের জীবিকার সঙ্গে নিজেদের সবসময় উপযুক্ত করে তুলতে পারে না, বা অনিয়মিত কর্মী অথবা ঠিকা শ্রমিক (Casual Worker or Part-Time Worker) হিসাবে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, তারা যখন জীবিকাচ্যুত হয় অথবা ঠিকা শ্রমিক হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমান উপার্জন করতে না পারার ফলে তাদেরকে নিজ নিজ পরিবার পরিচালনার

ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে তাদেরকে সমাজের বিভিন্ন দাতব্য বা অন্যের সাহায্যের উপর ভরসা করে বেঁচে থাকতে হয়।[৬১] যদিও এই ধরনের ভিক্ষুকরা অনিয়মিত কর্মী অথবা ঠিকা শ্রমিক হিসাবে নিজেদের জীবিকাকে নিরাপদ করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত ওই সময়কালীন পর্বের জন্য জীবিকা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত হতে হয়।

M. S. Gore ১৯৫৯ সালে Delhi School of Social Work-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দিল্লির ভিক্ষুকদের উপর একটি সমীক্ষায় সাহায্যে অনিয়মিত ভিক্ষুক অথবা সাময়িক ভিক্ষুকদের (Casual Beggars or Part-Time Beggars) Non-religious Part-Time Beggars এবং Religious Part-Time Beggars, - এই দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।[৬২] প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, Non-religious Part-Time Beggars হল, "Those who are normally self-employed in various small scale manual tread and the returns from these are neither are regular nor stable."[৬৩] কাজটি প্রায়শই অনিয়মিত ও সাময়িক প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলে যখনই জীবিকাটি থেকে এক দিনের উপার্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা ভিক্ষাবৃত্তি করতে শুরু করে। যদি এই অনিয়মিত ও সাময়িক ভিক্ষাবৃত্তিটি প্রায়শই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তাহলে এই পেশাটি কোনো একটি সময় পেশাদার ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিণত হয়।

সাধারণত, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলিতে নির্দিষ্ট দিনে যে সকল ভিক্ষুক অস্থায়ী এবং অনিয়মিত ও সাময়িক সময়ের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে বেঁচে থাকে, সেই সকল মানুষদের Religious Part-Time Beggars হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ধরনের ভিক্ষুকরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু প্রান্তিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তদসত্ত্বেও অতিরিক্ত সময়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করে।[৬৪] এই শ্রেণির ভিক্ষুকরা সৎ নাগরিক হিসাবে

নিজেদের সমস্ত সামাজিক দায়িত্বকে সংকুচিত করে ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে এই সকল ভিক্ষুকদের মধ্যে নারীরা শিশুদের ব্যবহার করে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য। কারণ দরিদ্র অভিভাবকহীন শিশুগুলির সাহায্যে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আদায় করা যায়। যদিও এই সকল মানুষজন বিভিন্ন জীবিকা অর্জনে সক্ষম তথাপি তারা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

৫.৩.১৬. পেশাদার ভিক্ষুক:

ভারতবর্ষে ভিক্ষাবৃত্তিকে কিছু সম্প্রদায় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক প্রথা বা কার্যকলাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। পেশাদার ভিক্ষুক হিসাবে সমাজে নির্দিষ্ট কিছু বর্ণ বা উপজাতি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এই সকল মানুষজন সাধারণত যাযাবরবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাপণ করেন। অনুরূপভাবে পেশাদারী ভিক্ষুক হিসাবে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে, ট্রেনে, বাসে বা ট্রামে গান পরিবেশন, নাচ বা কৌতুকের মাধ্যমে মানুষকে বিনোদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সকল পেশাদারী ভিক্ষুক গোষ্ঠীগুলি দাতব্য (Charity) বা দান গ্রহণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রকে কোনো প্রকার সমস্যা বা অসম্মানজনক পেশা হিসাবে বিবেচনা করেন না।[৬৫] যে সকল মানুষজন শারীরিকভাবে অক্ষম বা মানসিকভাবে কোনও কাজের প্রতিই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না এবং কেবল ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন তাদের পেশাদার ভিক্ষুক বলে গণ্য করা যায়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের বা জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতি-নীতির কারণে ভিক্ষাবৃত্তি সেই সকল সম্প্রদায়ের বংশগত পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সকল পেশাগুলি বংশগতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন - নাটস, বাজিগরস, সাইনস, জাগলার, ভাটস এবং কঞ্জার ইত্যাদি।[৬৬] এই পেশাগুলি আবার তাদের কাছে কোনও সামাজিক অবনমন হিসাবে বিবেচিত হয় না এবং তারা শৈশবকাল থেকেই এই পেশাগুলিকে গ্রহণ করে চলেছে। শিশুদের এই

পেশার সঙ্গে যুক্ত করা হয় কারণ তাদের সাহায্যে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করা যায় এবং অধিকমাত্রায় উপার্জন করতে পারে যা পরিবারে ক্ষেত্রে সদর্থক।

৫.৩.১৭. বহুরূপী ভিক্ষুক:

ভারতের মতো দেশে ধর্মীয় ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা অতীত কাল থেকেই চলে আসছে। বর্তমান সময়েও সমাজে বেশ কিছু মানুষ কায়িক শ্রমের পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়। কিন্তু এই সকল মানুষজন নিজেদের এমনভাবে তৈরি করে যে, সহজে তাদের প্রকৃত রূপ ও চরিত্র বোঝা যায় না। ফলে কে প্রকৃত ধর্মীয় ভিক্ষুক, তা বোঝা অসম্ভব।[৬৭] তাছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভিক্ষুকরা বিভিন্ন দেব-দেবী, মনীষীর রূপ ধারণ করে ভিক্ষাবৃত্তির কাজ চালিয়ে যায়। আর এরাই বহুরূপী ভিক্ষুক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫.৩.১৮. ধর্মীয় ভিক্ষুক:

ভারতের মতো দেশ যেখানে হিন্দু, মুসলিম শ্রেণির মানুষরা ধর্মীয় কারণে ভিক্ষা করে। ফলে এই সমস্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে এবং এই সমস্যা সমাধান করা দুর্বিসহ। ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যার সমাধান করা সম্ভব সরকার অ-সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়। যেমন সন্ন্যাসী, যোগী, সাধু, বৈরাগী, ফকির এবং দরবেশ এই সকল মানুষজন ভারতে এতই পরিচিত যে তাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।[৬৮]

৫.৩.১৯. জনজাতি ভিক্ষুক:

প্রকৃত ভিক্ষুক এবং নকল ভিক্ষুকদের চেয়ে এই সকল ভিক্ষুক অনেকটা আলাদা। এই উপজাতি ভিক্ষুকরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভিক্ষা করে গান গেয়ে বা কবিতা আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে ভারতের অনেক স্থানে খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করা হয়। এরা শহরের ভিক্ষুকদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা অপরাধী উপজাতি বা যাযাবরদের থেকে আলাদা। অপরাধীদের সহাবস্থানের খুব কম জায়গা রয়েছে ভারতে এবং এই সমস্ত ভিক্ষুক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘাঁটি বেধে ঘুরে বেড়ায়। ফলে এদের মধ্যে থাকা কিছু কর্মঠ মানুষের মধ্যেও হতাশা তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে তারা সঠিক সময়ে কাজ না পেয়ে তারা ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়।[৬৯]

৫.৩.২০. সর্বস্বান্ত/নিঃস্ব ভিক্ষুক:

ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেকেই থাকে, যাদের কোনোরূপ বাসস্থান কিংবা সহায়তা পাওয়ার মতো আস্থা পর্যন্ত থাকে না, অর্থাৎ একেবারেই সহায়-সম্বলহীন। এরা মূলত সর্বস্বান্ত বা নিঃস্ব অবস্থায় পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় এবং ভিক্ষা করে দিন যাপন করে। বেশির ভাগ সময়ই এরা অভুক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। রোদ-বৃষ্টি-খরায় খোলা আকাশের নিচে চরম যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনযাপন করতে হয় এদের।[৭০]

৫.৩.২১. গৃহহীন ভিক্ষুক:

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও গৃহহীন মানুষকে লক্ষ করা যায়, যারা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে পেট চালাতে বাধ্য হয়। এবং একটি সামাজিক সমস্যা যা প্রতিটি দেশকে মোকাবেলা করতে হয়। কখনও কখনও, আমরা যখন রাস্তায় হাঁটছি, তখন আমরা সবাই

ভিক্ষুক এবং গৃহহীন লোকদের দেখতে পাচ্ছি এবং তারা খাবার এবং পানীয় কেনার জন্য টাকা চাইছে। কিছু লোক তাদের অর্থ দেবে কারণ তারা দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি বোধ করে, কিন্তু কখনও কখনও, তারা অর্থ দেয় শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা একটি অভ্যন্তরীণ নৈতিকতায় বাধ্য হয় যে "মানুষের যত্ন নেওয়া উচিত, ভাগ করা উচিত এবং একে অপরকে সাহায্য করা উচিত" এবং কিছু লোক দিতে অস্বীকার করে এবং দিতে বা না দিতে অনিশ্চিত কারণ তারা ভাবছে যে ভিক্ষুকদের সত্যিই তাদের সাহায্যের দরকার আছে বা ভিক্ষুকরা তাদের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। যাইহোক, আমার মতে, দেওয়া বা না দেওয়া আপনার পছন্দের বিষয় এবং এটি সঠিক বা ভুল আপনার বিচারের উপর নির্ভর করে।[৭১]

৫.৩.২২. অভিবাসিত ভিক্ষুক:

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকার কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে চলেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষজন বিভিন্ন স্থানে অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভিক্ষাবৃত্তি করেন। অভিবাসী ভিক্ষুকদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় যথার্থ আলোচনা করা হয়নি। তথাপি ভারতবর্ষে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রান্তিক মানুষের অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভিক্ষাবৃত্তির সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উল্লেখ করেন, যথা: (ক) দরিদ্র্যতা, (খ) ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুর, (গ) কৃষিকাজের বিকল্প কর্মসংস্থানের অপ্রতূলতা এবং (ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ।[৭২]

অভিবাসী ভিক্ষুকরা দারিদ্র্যতার কারণে অনেক সকল সময় নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে অন্য স্থানে গমন করেন, ফলে অনেক সময় নতুন স্থানে কোনো প্রকার কর্মসংস্থান করতে না পারার ফলে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। অনুরূপভাবে দারিদ্র্যতার কারণ

ছাড়াও প্রান্তিক মানুষেরা গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য অভিবাসিত হয়। অভিবাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়গুলি হল, জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব, ভূমিহীনতা, ছোট জমির মালিক, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র চাষী, সেচ ব্যবস্থার অসম বিস্তার, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ভারতীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাযাবর হিসাবে জীবনযাপন করেন।[৭৩] ভারতবর্ষে কৃষি শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকার ফলে সমাজে কৃষি শ্রমিকরা বেকারত্বের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কৃষি শ্রমিকদের দারিদ্র্যতার বেশ কয়েকটি কারণ লক্ষ করা যায়। যেমন, - ভারতে কৃষি শ্রমিকরা নিরক্ষর এবং অ-সংগঠিত হওয়ার ফলে তারা ন্যায্য দাবি বা উপযুক্ত মজুরির থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষি শ্রমিকদের বেশির ভাগই বঞ্চিত বা নিম্নবর্ণের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারা সামাজিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। কৃষিকাজ মূলত নির্দিষ্ট মরশুমি (Seasonal) বা ঋতুতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় কৃষকরা মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal Unemployed) বা স্বল্প কর্মসংস্থানের সমস্যার মুখোমুখি হন।[৭৪] গ্রামাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুবিধা না থাকায় কৃষি শ্রমিকরা গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত (Migration) হচ্ছেন। ভারতবর্ষে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি খুবই কম হওয়ার কারণে তাদের জীবন-জীবিকায় সমস্যার ফলে তাঁরা ক্রমশ বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য শহরাঞ্চলে অভিবাসী হয়ে থাকেন।[৭৫] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অধিক মানুষ স্থানচ্যুত হয়ে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে অন্য স্থানে অভিবাসী হতে বাধ্য হন। ফলে এই সকল প্রান্তিক মানুষজন শহরাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থান করতে না পেরে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। যদিও অভিবাসী মানুষের কিছু অংশ ভিক্ষাবৃত্তিকে তাঁরা আজীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন, আবার কিছু অংশ সাময়িক সময়ে জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। এরা মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সময় গুলিতে ভিক্ষার কারণে অভিবাসন করেন।

অনুরূপভাবে, কৃষিকাজের যুক্ত থাকা বয়স্ক ব্যক্তিগণ কৃষিকর্মে অসমর্থ হয়ে অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেন। অভিবাসী ভিক্ষুকরা বাসস্থান হিসাবে ফুটপাত, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, স্কুল ভবন ইত্যাদি স্থানে রাত্রিবাস করেন এবং দিনে ভিক্ষাবৃত্তি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রান্তিক জীবিকা গ্রহণ করেন।[৭৬] এই সকল অভিবাসী ভিক্ষুকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রিক ও কিছু পরিমান নগদ টাকা সঙ্গে রাখেন। আর এভাবেই অভিবাসী ভিক্ষুক জনগোষ্ঠী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভিক্ষা করতে থাকেন।

৫.৪. ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল:

ভিক্ষাবৃত্তি একটি শিল্প (Art), যা দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করাও প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। সমাজের নানা স্থানে ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায় (অনাহার, বৃদ্ধ, শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি); এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিষয় হল একজন ভালো ভিক্ষুক কেবল একজন ভালো অভিনেতাই নয়, একজন ভালো পর্যবেক্ষক এবং বিচারকও। কারণ এই সকল মানুষেরা তাদের পেশাগত কৌশলের দ্বারা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তি লক্ষণীয়ভাবে এমন এক পেশা, যেখানে ভিক্ষুকরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং মানবিক অবস্থাকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে। ফলে ভিক্ষুকরা মানবিকতার অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক সংবেদনগুলির উপর নির্ভর করে থাকে।[৭৭] ভিক্ষুকরা একটি সংগঠিত অর্থনৈতিক সমাজে টিকে আছেন, কারণ তাদের মানবিক আবেদন সাধারণ মানুষের সহানুভূতির প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। যদিও এই জাতীয় সহানুভূতির বিষয়ে দার্শনিকরা যে নৈতিক বক্তব্য রাখেন এই বিষয় সম্পর্কে, তা সর্বদা অন্যের উপর নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে বলা যায়, ভিক্ষুকের আবেদন প্রায়শই তার নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একা অথবা অন্যের প্রতিক্রিয়ার

উপর জোর দেয়। ভিক্ষাবৃত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ সমাজে কিছু মানুষের সহানুভূতির জন্য বা কিছু মানুষ সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে পূণ্যার্জনের জন্য। ফলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন যে, পার্থিব জীবনে ভালো কিছু করা বা দরিদ্র মানুষের সাহায্যের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। এমনকি ভিক্ষুকরা যেভাবে সরল আবেদন-নিবেদন করে থাকেন, তা একটি নৈমিত্তিক পর্যবেক্ষণ। ভিক্ষুকরা সাধারণত ধর্মীয় স্থান, যেমন মন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং হোটেল, থিয়েটার, বাসস্টপ, রেল স্টেশন, ট্রাফিক সিগন্যাল, পর্যটন কেন্দ্র এবং জনবহুল রাস্তাঘাটে সংবেদনশীলভাবে তারা তাদের আবেদন করে থাকে।[৭৮] ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। এই কৌশলগুলির নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান দিক উল্লেখ করা যায়, যথা: (ক) সাধারণ কৌশল, (খ) শারীরিক প্রতিবন্ধীকরণ, (গ) ধর্মীয় আবেগজনিত কৌশল, (ঘ) জবরদস্তি পদ্ধতির ব্যবহার এবং (ঙ) অন্যান্য কৌশলের ব্যবহার।[৭৯]

৫.৪.১. সাধারণ কৌশল:

ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে ভিক্ষুকরা কৌশলগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, যাতে একদিকে সাধারণ মানুষের অনুভূতির প্রতি আকৃষ্ট করা ও সহানুভূতি সঞ্চয় করা যায় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে সামঞ্জস্য করে তোলা যায়। ভিক্ষুকরা তাদের এই পেশা দ্বারা অন্যের জীবনে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। ভিক্ষুকরা দাতব্যের জন্য দানকারীকে যে আশীর্বাদ করেন, তা বাস্তবে নিজ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যই। অন্যদিকে অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে প্রতিক্রিয়া আদায় করতে ব্যর্থ হলে তারা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের গল্প শোনাতে থাকে; এমনকি শারীরিক অসুস্থতা ও তদজনিত অসহায়ত্বের কথা শুনিয়ে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।[৮০]

আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নানা প্রতিবন্ধকতার চিত্রকে প্রদর্শন করা, কিংবা মুদ্রিত চিঠিতে নানা আবেগপ্রবণ গল্পের মাধ্যমেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

ড. এন. এন. সেনগুপ্ত তাঁর 'Mental Traits of Beggars' প্রবন্ধে ভিক্ষুকদের পেশার সাধারণ প্রবৃত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, ভিক্ষুকরা সাধারণত মানুষের অন্তর্নিহিত সংবেদনগুলির প্রতি মনোনিবেশ করে এবং ভিক্ষুক তার ব্যক্তিত্বকে সেই সকল মানুষের সংবেদনশীল সহানুভূতি স্পর্শ করার চেষ্টা করে। এছাড়া ভিক্ষুকরা তাদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আহ্বান জানান এবং ভিক্ষুকরা চিৎকার করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভরতার বোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। *"ঈশ্বর আপনাকে মঙ্গল করুক", "আপনার সন্তান-সন্ততি সুস্থ থাকুক"* - এইভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তারা অনাহারী পরিবারের জন্য আপনার সুরক্ষা চান, এবং তারা দারিদ্র্যতা, অসুস্থতা, অনাহার ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরেন।[৮১] ড. সেনগুপ্ত এই সকল ভিক্ষুকদের আবেদন ও নিবেদনকে মনো-শারীরিক কৌশল (Psycho-physical Techniques) হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির আবেদন ও নিবেদনের ক্ষেত্রে মনো-শারীরিক কৌশলটিকে তিনটি উপাদানে ভাগ করেছেন। এগুলি হল, (ক) মনোযোগ আকর্ষণ (Attract Attention), (খ) আবেগ দ্বারা আবেদন (Appeal to emotion), (গ) পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার আশায় অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ (Impress the need of Beggar upon the mind of his patrons)।[৮২] অর্থাৎ ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে মনো-শারীরিক কৌশল অবলম্বন করেন, কারণ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ, আবেগাপ্লুত আবেদন ও মনকে প্রভাবিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলি গ্রহণ করেন।

৫.৪.১.১. মনোযোগ আকর্ষণ:

ভিক্ষাবৃত্তির আবেদনের মাধ্যম হিসাবে ভিক্ষুক কিছু সহায়ক উপাদানের সাহায্যে ভিক্ষার মর্মটি তুলে ধরেন এবং যার দ্বারা সহানুভূতির দিকটি আরও কার্যকর হতে পারে। ফলে ভিক্ষুক সকল সময় তাঁর শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ও বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গিমার সাহায্যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল একজন সফল ভিক্ষুককে অবশ্যই একজন ভালো অভিনেতা হতে হয়, কারণ তাঁর স্বাভাবিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ত্যাগ করে নতুন নতুন পরিবর্তনগুলি তাকে গ্রহণ করতে হয় যেমন, তাঁর বক্তব্য, শারীরিক পরিবর্তন ও আচরণের পরিবর্তন করতে হয়। সুতরাং, দারিদ্র্যতা, অনাহার, উদ্বেগ, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে মুখের ভাব দ্বারা প্রকাশ করে ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন।[৮৩]

৫.৪.১.২. আবেগ দ্বারা আবেদনের কৌশল:

ভিক্ষাবৃত্তির আবেদনের ক্ষেত্রে ভিক্ষুকের নিদির্ষ্ট কিছু আবেগ ও পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। শৈশবকালে শোনা পুরানো কাহিনী, সমাজের প্রাচীন প্রথা, দেবতা এবং অন্যান্য রূপকথার কাহিনীগুলি যা মানবদেহের আকার ধারণ করে, এই সকল কাহিনী ও প্রথাগুলি আমাদের আলোড়িত করে যখন ভিক্ষুকরা আবেগাপ্লুতভাবে আবেদন করতে থাকেন। অনুরূপভাবে ভিক্ষুকরা ভিক্ষার ক্ষেত্রে নিদির্ষ্ট কিছু ছকের ব্যবহার করে থাকেন, অঙ্গভঙ্গি, মুখাভিনয়, ইত্যাদি বিষয়। ভিক্ষুক বেশিরভাগ সময় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিদির্ষ্ট কিছু ছকের ব্যবহার করে থাকেন। ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ভিক্ষুক বিভিন্ন আবেগ বা ছকের ব্যবহার করে থাকেন, কারণ ভিক্ষা পাওয়ার জন্য ভিক্ষুকদের সকল সময় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আদায় করতে হয়, এক্ষেত্রে ভিক্ষুক তাঁর আবেগপ্লুত কণ্ঠ ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গিমার

সাহায্য অবলম্বন করেন। ড. সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে এই সকল বিষয়গুলিকে মনো-শারীরিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে ভিক্ষুক তাঁর এই মনো-শারীরিক বিষয়ের সাহায্যে ভিক্ষাবৃত্তির আবেদনকে আবেগাপ্লুত ভাবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৮৪]

৫.৪.১.৩. পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার আশায় অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ:

যদিও ভিক্ষুকরা বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ভৌগোলিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে ধীর হয় না। এ বিষয় সম্পর্কে কলকাতার বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে ভিক্ষুকদের স্বাক্ষাৎকার গ্রহণকালীন একটা বিষয় লক্ষ করেছি, ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ভিক্ষুকরা বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবাদর্শের অবলম্বন করে থাকেন যেমন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মসজিদগুলিতে ভিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তেমনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও মন্দিরগুলিতে ভিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে ভিক্ষুকদের কোনো প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ লক্ষ করা যায় না। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জনবহুল স্থানে ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ধর্মীয় ভাবাদর্শের পরিবর্তে দারিদ্র্যতা, অনাহার, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও রোগগ্রস্ততা ইত্যাদি বিষয়গুলির সাহায্য অবলম্বন করে থাকেন। এই সকল কৌশল দ্বারা ভিক্ষুকরা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জন করে।[৮৫] সুতরাং, ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে মনো-শারীরিক কৌশল অবলম্বন করেন, কারণ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ, আবেগাপ্লুত আবেদন ও মনকে প্রভাবিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলি গ্রহণ করেন।

৫.৪.২. শারীরিক প্রতিবন্ধীকরণ:

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মানুষের কিছু অংশ দারিদ্র্যতার কারণে প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রতিবন্ধীদেরকে ভিক্ষাবৃত্তির 'অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার

করে থাকেন। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির শেষ পর্যায় হিসাবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার করা হয়।[৮৬] এক্ষেত্রে কিছু ভিক্ষুকদের বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে মাদ্রাজে যেখানে ভিক্ষুকদের সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, সেখানে দেখা গেছে যে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলি সাধারণ ছিল, ক্ষত প্রদর্শন করা, নবজাত শিশু জন্ম নেওয়া, ধর্মীয় সঙ্গীত প্রদর্শন ও মৃতদেহ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু সময় ভিক্ষুকরা বিভিন্ন ট্রাফিক ও জনবহুল রাস্তাগুলিতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অবলম্বনের দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি করে থাকেন।

৫.৪.৩. ধর্মীয় আবেগজনিত কৌশল:

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাধু, সন্ন্যাসী, এবং ফকিররা সাধারণত শস্য ও নগদ উভয়ভাবেই ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলিতে নিযুক্ত হন। যেমন - (ক) কিছু ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, (খ) সকল ধর্মীয় কেন্দ্রস্থলে তীর্থযাত্রা করা, (গ) মানুষকে আশীর্বাদ এবং সুখী জীবনের জন্য প্রার্থনা করা, (ঙ) মন্দির বা মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি।[৮৭] ফলে এই সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি সরাসরি জনসাধারণের কাছে আবেদন করে থাকেন।

৫.৪.৪. জবরদস্তি পদ্ধতির ব্যবহার:

সমাজে ভিক্ষাবৃত্তিকে দান সংগ্রহের বিনীত মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে থাকেন। ভিক্ষুক সর্বদা জনসাধারণের সহানুভূতির অর্জন করে থাকেন তেমনটি নয়, তাঁরা মাঝে মাঝে জনসাধারণের সহানুভূতির বাইরে আরও কিছু উপায় বা পন্থা অবলম্বন করেন যাতে সাধারণ মানুষ ভিক্ষা দিতে বাধ্য হয়। সমাজের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের পা ধরা ও অনাহারক্লিষ্ট, শারীরিক ক্ষত বা অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে যাতে কেউ তার

দৃষ্টি এড়াতে না পারে ও ভিক্ষা দিতে বাধ্য হয়।[৮৮] একইভাবে, কিছু সাধু যেমন, নাগা সাধু বা সন্ন্যাসী তাদের সঠিকভাবে সরবরাহ না করলে অনশন বা অভিশাপ প্রদানের হুমকি দিয়ে থাকেন।

৫.৪.৫. অন্যান্য কৌশলের ব্যবহার:

সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল হিসাবে সাধারণ কৌশল, মনো-শারীরিক কৌশল, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ধর্মীয় কৌশলগুলির পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কিছু ভিক্ষার কৌশল লক্ষ করা যায় যেমন, - কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির কারণে কিছু বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনা প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৮৯] এছাড়া শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন রকম খেলা প্রদর্শন করে থাকে ভিক্ষুকরা। তাছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির কৌশল হিসেবে ভিক্ষুকরা অনেকসময় ভেলকিবাজি (Jugglery) ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করে থাকে।

ভিক্ষাবৃত্তির কৌশলগুলিকে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ভিক্ষুক শ্রেণি তাদের জীবনধারণের কারণে বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। এই কৌশলগুলিকে যে সকল ভিক্ষুক যথাযথভাবে ব্যবহার করেন, তাদের উপার্জনের পরিমানও অধিক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণি তাদের জীবিকার কারণে দক্ষতা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। ভিক্ষুক শ্রেণি তার আবেদন, আচরণ, অভিব্যক্তি, মূকাভিনয় এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণির কৌশলগুলির কার্যকারিতা যত কম হয়, ভিক্ষুক শ্রেণির আয়ের পরিমাণও তত কম হয়। তাই জীবিকার কারণে ভিক্ষুক শ্রেণিকে এই ধরনের কৌশলগুলিকে অবলম্বন করতে হয়।[৯০]

ভিক্ষাবৃত্তি এমন একটি কৌশল বা পন্থা, যার দ্বারা ভিক্ষুকদের নির্দিষ্ট পারদর্শিতা লক্ষ করা যায়। ভিক্ষুক শ্রেণি তাদের পেশায় খুবই দক্ষ হন। কারণ সকল প্রকার নগর ও

মহানগরগুলিতে ভিক্ষুক শ্রেণির কৌশল বা পদ্ধতি একই রকমের হয়ে থাকে না। ভিক্ষাবৃত্তি এমন একটি শিল্প (Art), যা দাতব্য ও দানকারীর সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল। নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়ঃবৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি প্রকারভেদে সমাজে নানারকমের ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন অংশে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিচিত্র এই পেশায় বৈচিত্র্য অনেক।[৯১]

ভিক্ষুকরা বিভিন্ন রকম কৌশল দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি সম্পন্ন করেন। সমাজে বেশ কিছু মানুষ কায়িক শ্রমের পরিবর্তে উপার্জনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। আবার এটাও দেখা যায় যে, সুস্থ ও সক্ষম মানুষজন বিভিন্ন রকম অভিনয় বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করছেন, যেমন কেউ চিকিৎসার খরচের জন্য, কেউ আত্মীয়জনের পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য, কেউ কন্যার বিবাহের জন্য, অথবা কেউ মিথ্যা প্রতিবন্ধী বেশে ভিক্ষাবৃত্তি করে চলেছেন ভিক্ষার পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে। এক্ষেত্রে ভিক্ষাদানকারী ব্যক্তিবর্গের ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কেন-না তাদের সাহায্য ছাড়া ভিক্ষুক শ্রেণির জীবনধারণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, সমাজের সাহায্য ব্যতীত (বিশেষত দাতা ব্যক্তিবর্গ) ভিক্ষুক শ্রেণির অস্তিত্ব বজায় রাখা খুবই কঠিন।

৫.৫. পর্যবেক্ষণ:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা ভিক্ষুক শ্রেণির মধ্যে একাধিক ধরন লক্ষ করতে পারি। ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেখা হয় শিল্প আঙ্গিকের বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম হিসাবে। যদিও এক্ষেত্রে ভারতে ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে এবং ভিক্ষুকদের সুসংহত ছয়টি শ্রেণিতে বিভাজিত করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকদের

শ্রেণি চরিত্রেরও রদবদল ঘটছে। একইসঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য তারা বিভিন্ন সময়পোযোগী কৌশল অবলম্বনের মধ্যদিয়ে উপার্জনও বৃদ্ধি করছে।

তথ্যসূত্র:

১. Cama H. Katayun: “Types of Beggars,” *Indian Journal of Social Work,* IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It*, (Bombay: Padma Publications Ltd, 1945), পৃ. ১।

২. *Report of the Committee Appointed by The Government of Bombay to Consider and Formulated Proposals for the Purpose of Preventing Professional Beggary in the Bombay Presidency,* (Bombay, Printed at Government Central Press, 1920), পৃ.পৃ. ১-৬। G.P. 362.5(64.31) B 639.

৩. Nels Anderson: *The Hobo: The Sociology of the homeless man*, (Chicago, The University of Chicago Press, 1923), পৃ. ২৬৫।

৪. *তদেব,* পৃ.পৃ. ২৬৫-২৭০।

৫. *তদেব,* পৃ. ২৭০।

৬. Cama H. Katayun: “Types of Beggars,” *Indian Journal of Social Work,* IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত*।

৭. B. C. Das Gupta: “Beggars - A Menace to Public Health”, also published in J. M. Kumarappa (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd., 1945), পৃ.পৃ. ৪১-৫২।

৮. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study,* (Bombay, Indian Conference of Social Work, 1959), পৃ.পৃ. ২১-৩৯।

৯. K. L. Kamat: *The Begging Profession,* (Mallige Monthly First Online, 15.08.1997).

১০. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat, Calcutta,* (Calcutta, Anthropological Survey, 1987), পৃ.পৃ. ১৩-২৫।

১১. তদেব।

১২. Cama H. Katayun: "Types of Beggars," *Indian Journal of Social Work,* IV*, No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪।

১৩. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study,* প্রাগুক্ত*,* পৃ. ১৫। ১৪. M. S. Gore: 'Society and the Beggar', *Sociological Bulletin, 7, No. 1, (1958),* পৃ.পৃ. ২৩-৪৮। https://doi.org/10.1177/0038022919580102.

১৫. Census of India, 1971: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 1973).

১৬. Census of India, 1981: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 1983).

১৭. Census of India, 1991: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 1993).

১৮. Census of India, 2001: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5. Registrar General and Census Commissioner,* (New Delhi, Government of India, 2003).

১৯. Census of India, 2011: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5. Registrar General and Census Commissioner*, (New Delhi, Government of India, 2013).

২০. Lok Sabha: *Statement given on 08.03.2016, by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India,* (New Delhi, Government of India, 2016).

২১. Census of India, 1971: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5, প্রাগুক্ত*।

২২. Census of India, 1981: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5, প্রাগুক্ত*।

২৩. Census of India, 1991: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5, প্রাগুক্ত*।

২৪. Census of India, 2001: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5, প্রাগুক্ত*।

২৫. Census of India, 2011: *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: *Table A-5, প্রাগুক্ত*।

২৬. Lok Sabha: *Statement given on 08.03.2016, by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, প্রাগুক্ত*।

২৭. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬।

২৮. Cama H. Katayun: "Types of Beggars," *Indian Journal of Social Work,* IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত*।

২৯. K.L. Kamat: *The Begging Profession*, (Mallige Monthly First Online, 15.08.1997) www.kamat.com/thebegging (Last Accessed: 21.12.2018).

৩০. AICAPD. “Innovation Mobile School,” n.d. https://www.aicapd.org/Innovation-Mobile-School. (Last Accessed: 21/12/2018)

৩১. তদেব।

৩২. The Indian Institute of Economics, Hyderabad-Deccan India: *Report on a Socio-Economic and Health Survey of Street Beggars in Hyderabad-Secunderabad City Area*, (Hyderabad, 1959).

৩৩. Emily Delap: *Begging for Change: Research findings and recommendations on forced child begging in Albania/Greece, India and Senegal*, (2009).

৩৪. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৩৫. তদেব, পৃ.পৃ. ১৫-১৬।

৩৬. Lisa Schlein and Sven Krüger: “Urban Poor Worse Off than Rural Poor but Good Policies can Reduce Slums: A report by UN-Habitat with additional reporting,” (18 June 2006), http://www.citymayors.com/society/urban_poor.html. (Last Accessed: 09.12.2019)

৩৭. Central Bureau of Correctional Services Department of Social Welfare Report: *Begging by children; How many of them are Kidnapped*, (New Delhi, Government of India, 1971).

৩৮. Centre for Child and the Law: *Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986)*, (New Delhi, Government of India, 1986).

৩৯. তদেব।

৪০. B. C. Das Gupta: “Beggars - A Menace to Public Health”, also published in J. M. Kumarappa (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪১-৫০।

৪১. তদেব।

৪২. তদেব।

৪৩. Rajendar Kumar Sharma: *Urban Sociology*, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributers, 2004), পৃ. ২৫১।

৪৪. B. C. Das Gupta: "Beggars - A Menace to Public Health", also published in J. M. Kumarappa (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত।*

৪৫. Asuina Kartika: 'Statical Survey', *Social Defence, Vol. XXXV No. 44(118), (1994),* পৃ. ২১২।

৪৬. The Extraordinary Gazette of India: *Persons with Disabilities Act, 1995*, (New Delhi, Ministry of Law, Justice and Company Affairs Legislative Department, Government of India, 1st January, 1996).

৪৭. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৪৮. তদেব।

৪৯. Upinder Baxi (ed.): *Law and Poverty, Critical Essays*, (Bombay, N.M. Ttapathi Private Ltd, 1988), পৃ. ২৬১।

৫০. M. V. Moorthy: *Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৫১. তদেব।

৫২. Cama H. Katayun: "Types of Beggars," *Indian Journal of Social Work*, IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১।

৫৩. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat, Calcutta, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৩-২২।

৫৪. Cama H. Katayun: “Types of Beggars,” *Indian Journal of Social Work,* IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত।*

৫৫. Upinder Baxi (ed.): *Law and Poverty, Critical Essays, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৬১-২৬২।

৫৬. তদেব।

৫৭. Cama H. Katayun: “Types of Beggars,” *Indian Journal of Social Work,* IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১-৩।

৫৮. M. S. Gore: ‘Society and the Beggar’, *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৩-৪৮।

৫৯. তদেব।

৬০. *Report of the Committee Appointed by The Government of Bombay to Consider and Formulated Proposals for the Purpose of Preventing Professional Beggary in the Bombay Presidency, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৯-১৫।

৬১. A. Joshi & Y. P. Singh: Problems of Beggars and Begging Homes in Religious Centres, Lucknow, Giri Institute of Development Studies, 1999).

৬২. M. S. Gore: ‘Society and the Beggar’, *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৩-৪৮।

৬৩. তদেব।

৬৪. Upinder Baxi (ed.): *Law and Poverty, Critical Essays, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫৭।

৬৫. *Report of the Committee Appointed by The Government of Bombay to Consider and Formulated Proposals for the Purpose of Preventing Professional Beggary in the Bombay Presidency, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১-৪।

৬৬. S. R. Myneni: *Sociology for Law Students,* (Faridabad, Allahabad Law Agency, 2006), পৃ. ২৫৯।

৬৭. Sumita Choudhury: *Beggars of Kalighat, Calcutta, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৩-২৫।

৬৮. *Report of the Committee Appointed by The Government of Bombay to Consider and Formulated Proposals for the Purpose of Preventing Professional Beggary in the Bombay Presidency, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১-৬।

৬৯. Asuina Kartika: '*Statical Survey*', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।

৭০. Vijay Kumar: *'The Destitutes and Their Problems: A Study with Special Reference to the Destitute Depending on the Begging from the Worshipers Near the Various Temples of the City of Bangalore'*, (September 20, 2011). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2423506.

৭১. Arindam Roy, Mehedi Hasan Mandal, Krishna Pada Sahoo, and Giyasuddin Siddique: 'Investigating the Relationship between Begging and Homelessness: Experiences from the Street Beggars of Kolkata, West Bengal, India', *Human Arenas, (April, 2023).* https://doi.org/10.1007/s42087-023-00330-0.

৭২. Deeptima Massey, Abdur Rafique, and Janet Seeley: 'Begging in Rural India and Bangladesh', *Economic and Political Weekly 45, No. 14, (2010),* পৃ.পৃ. ৬৪-৭১। http://www.jstor.org/stable/25664307.

৭৩. *তদেব*।

৭৪. Manabendu Chattopadhyay: 'Some Aspects of Employment and Unemployment in Agriculture', *Economic and Political Weekly, 12, No. 39, (1977),* পৃ.পৃ. ৬৬-৭৬। http://www.jstor.org/stable/4365951.

৭৫. *তদেব*।

৭৬. Deeptima Massey, Abdur Rafique, and Janet Seeley: 'Begging in Rural India and Bangladesh', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৭৭. Sumita Sarkar: 'Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', *Indian Journal of Social Work, Vol. 68, No. 4, (October, 2007),* পৃ.পৃ. ৫৩১-৫৪৪।

৭৮. Asuina Kartika: '*Statical Survey*', *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১২।

৭৯. Radhakamal Mukherjee: "Causes of Beggary," in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd., 1945), পৃ.পৃ. ১৯-২৬।

৮০. Das Gupta, "Beggars: A Menace to Public Health," 41-57.

৮১. N. N. Sen Gupta: "Mental Traits of Beggars," in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It,* (Bombay, Padma Publications Ltd., 1945), পৃ.পৃ. ২৭-৪০।

৮২. *তদেব,* পৃ. ২৮।

৮৩. *তদেব,* পৃ. ২৮-৩২।

৮৪. S. R. Myneni: *Sociology for Law Students, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫৯।

৮৫. *তদেব,* পৃ.

৮৬. Sumita Sarkar: '*Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', প্রাগুক্ত*।

৮৭. *Report of the: Committee Appointed by The Government of Bombay to Consider and Formulated Proposals for the Purpose of Preventing Professional Beggary in the Bombay Presidency, প্রাগুক্ত*।

৮৮. Cama H. Katayun: "Types of Beggars," *Indian Journal of Social Work,* IV, *No. 1 (June 1943)* also published in J. M. Kumarappa, (ed.): *Our Beggar Problem: How to Tackle It, প্রাগুক্ত*।

৮৯. তদেব।

৯০. Sumita Sarkar: ‘*Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development’,* প্রাগুক্ত।

৯১. A. M. Dancus: “The Art of Begging”, in A. Dancus, M. Hyvönen and M. Karlsson (eds): *Vulnerability in Scandinavian Art and Culture*, (Palgrave Macmillan, Cham, 2020). পৃ. ২২৩-২৩০। https://doi.org/10.1007/978-3-030-37382-5_11

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

ভিক্ষুক শ্রেণির পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে যে সরকারি আইনগত নীতির আলোচনা হয়েছে সেটি কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে বা সেই নীতি রূপায়ণে সরকার কতখানি উদ্যোগী হয়েছে, সেটাই বর্তমান অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাংলার প্রেক্ষাপটে ভবঘুরে আইন ও তার ব্যাখ্যাকে। পাশাপাশি এই ব্যাপারে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ ও কার্যক্রমের আলোচনা করাও দরকার। সেক্ষেত্রে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন ও তার কার্যকারিতা নিয়ে এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক শ্রেণির পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.২. বাংলার প্রেক্ষাপটে ভবঘুরে আইন:

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য ১৯৪৩-এর 'বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন' প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি ১৮২৪ সালের 'ইউরোপীয় ভবঘুরে আইনে'র অনুরূপ। এতে ভিক্ষুকদের সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও এতে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনার কথা উল্লিখিত রয়েছে। 'বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন' প্রণয়নের এক সুবিস্তৃত ইতিহাস লক্ষ করা যায়, - ১৯৪৩-এর 'ভবঘুরে আইন' প্রণয়নের পূর্বে ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি দেশীয় রাজন্যবর্গের উদ্যোগে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে নির্মিত বিভিন্ন দাতব্য কেন্দ্রের কথা। দাতব্য কেন্দ্রগুলি শহরের ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় ভবঘুরে

ও ভিক্ষুকদের সাহায্য প্রদান করত। এক্ষেত্রে ১৮৩৩ সালে ২২ শে এপ্রিল কলকাতা শহরের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে 'Committee for the Relief of the Native Poor' নামে একটি দাতব্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী কালে 'Native Committee' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই দাতব্য কেন্দ্রটিতে ৭ জন ইউরোপীয়, ৩২ জন ভারতীয় এবং ১ জন পারসি ছিলেন। কমিটিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম কমল সেন, মতিলাল শীল, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রুস্তমজী কাউসজী প্রমুখ সদস্য ছিলেন।[১] কলকাতায় দাতব্য কেন্দ্রটির ১২ টি শাখা ছিল, যেগুলি শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ভিক্ষুকদের সাহায্য প্রদান করত।

১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে বহু মানুষ জীবিকার সন্ধানে কলকাতা শহরে ভিড় করতে থাকে। এই সকল মানুষজন কোনো রকম প্রান্তিক জীবিকা অর্জন করতে না পেরে ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করেন। দুর্ভিক্ষের কারণে শহরের বেশ কিছু অঞ্চলে 'কাঙালি ভোজনে'র ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক।[২] কিন্তু শহরাঞ্চল অপরিচ্ছন্নতার ফলে কাঙালি ভোজনের পরিবর্তে এক হাজার পীড়িত মানুষকে নগদ একশো টাকা করে দেওয়া হত।

১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর কলকাতায় ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কলকাতা পুলিশ আইনে ৪০, ৪০এ, ৭০ এবং ৭০এ ধারাগুলিকে সংযোজন করা হয়।[৩] প্রকৃতপক্ষে এই ধারাগুলি মূলত শহরাঞ্চলের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই আইনে বলা হয় যে, - কলকাতা শহর ও শহরাঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য সর্বাধিক ১ মাসের কারাবাস অন্যথায় সর্বাধিক ৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এই আইন দ্বারা ভিক্ষুকদের আবাসনে বন্দী করা ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। যার পরিমার্জিত রূপ ১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আইনে উল্লিখিত 'সরকারি ভবঘুরে আবাস' নির্মাণের পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষণীয়। কিন্তু ১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আবাস তৈরির পূর্বে

'নোটিফায়েড হোম' ছিল এর পূর্ববর্তী বিকল্প, যা ১২৫ নং বৌ-বাজার স্ট্রীটে আনন্দমোহন বিশ্বাসের উদ্যোগে বেসরকারিভাবে উদ্বাস্তুদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[৪] যেখানে প্রায় ২০০ জন ভবঘুরে থাকতে পারতেন। এছাড়া 'Indian Orphanage and Rescue Home', 'House of Detention for Juvenile' ও 'Leper Asylum' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অনাথ ও সাময়িক দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৬.২.১. মেন্ডিকেন্সি কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ:

কলকাতা ও কলকাতা শহরতলিতে ক্রমশ ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবাসগুলিতে ভিক্ষুকদের বন্দী করে রাখা সম্ভব ছিল না। ১৯১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কলকাতায় ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫,৬২৪ জন। এর মধ্যে কলকাতাতে জন্ম ১,২৮৩ জনের, চব্বিশ পরগনায় ৭৯৯ ও বাংলার অন্যান্য জেলায় ১,১৯৬ জন। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ২,২৩৪ জন কলকাতায় আসে; যার মধ্যে বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে ১,১৭৯ জন ও যুক্ত প্রদেশ থেকে ৮৬৯ জন কলকাতায় ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আসে।[৫] ফলে শহরের ভিক্ষুক সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করায় ১৯১৮-এর জুলাইয়ে স্যার হেনরী হুইলার বিধান পরিষদে শহরাঞ্চলের ভিক্ষুক সমস্যার প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য বক্তব্য পেশ করেন। একইভাবে ১৯১৮ সালের ৩রা জুলাই বাবু কিশোরী মোহন চৌধুরী কলকাতা ও বিভিন্ন পৌরসভার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভিক্ষুক বৃদ্ধির প্রসঙ্গে বিধান পরিষদে প্রস্তাব পেশ করেন।[৬] এই প্রস্তাবে ভিক্ষুকদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য 'The Mendicancy Committee' নামে একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এ. ডি. পিকফোর্ড।[৭] এছাড়া অন্যান্য সদস্যরা হলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, প্রিন্স আফসার-উল-মুল্‌ক মিরজা মহম্মদ, জি. পি. শেলটন, বাবু গোকুল চন্দ্র মণ্ডল, চুনীলাল বোস প্রমুখ। কমিটির সদস্যরা

সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধি, গণসংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত সরকারের কাছে পেশ করেন।

১৯১৯ সালে কমিটির রিপোর্ট থেকে কলকাতা শহরের বিভিন্ন ভিক্ষুক সম্পর্কে সরকারি তথ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনার শহরাঞ্চলের বিভিন্ন পেশা অবলম্বনকারী ভিক্ষুকদের সংখ্যার বিশ্লেষণ করেছেন, - "The Commissioner of Police forwarded to Government the numbers of Persons who were attended to at the feeding of the poor on the occasion of the peace celebrations. On the 14th December 1919; 9062 Hindus and 2064 Muhammadans were present, the numbers to the latter who attended being possibly affected by the Anti-Pace Celebration agitation. Of these number 9,197 were designed as able-bodied and 1,919 as infirm."[৮]

১৯১৯ সালে 'Mendicancy Committee' রিপোর্টে ভিক্ষুকদের বন্দী করার জন্য বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুপারিশ করেছিল, - 'Following the system introduced in Ceylon in 1913, the Committee recommends to Government the establishment of the following institutions': (a) Receiving Centre and Casual Ward, (b) Hospital for incurables and Curable, and (c) Industrial school.[৯]

সারণি - ৬.১: মেন্ডিক্যান্সি ইনস্টিটিউশন-এর (Mendicancy Institutions) কর্মী সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদমর্যাদা বা পদ	কর্মী সংখ্যা
১	সুপারিনটেনডেন্ট	২
২	অফিস স্টাফ	৬
৩	মেনিয়াল স্টাফ ফর হাসপাতাল	১৫
৪	রিসিভিং স্টাফ	৯
৫	ইনকারাবেল হসপিটাল অ্যান্ড কুরাবেল ওয়ার্ড স্টার্ফ	২০
৬	আলমসউস স্টাফ	১

৭	ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম স্টাফ	৩
৮	ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল স্টাফ	৬

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের বৈদ্যুতিন মাধ্যম। http//www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ০৬.০৫.২০১৯।

মেন্ডিক্যান্সি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সারণি - ৬.১-এ। মেন্ডিক্যান্সি দপ্তরের কর্মী সংখ্যা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে। Mendicancy Institution-এ সুপারিন্টেন্ডেন্সের অধীনে অন্যান্য ইউনিটগুলিকে আলাদাভাবে পরিচালনার দ্বারা একটি সুসংহত ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যার দ্বারা প্রকল্পটির সামগ্রিক ব্যয়ের পরিকল্পনা করা সম্ভবপর হয় এককালীন ২১,২৪,৫০০ টাকা ও বাৎসরিক ১,৫৫,২২০ টাকা ব্যয়ের মধ্যে দিয়ে।[১০]

৬.২.২. রোটারী ক্লাব অফ ক্যালকাটা প্রকল্প:

মেন্ডিক্যান্সি কমিটির সুপারিশ কার্যকর না হওয়ার ফলে শহরের ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়, যা Rotary Club of Calcutta Scheme বা ‘Calcutta’s Beggar Menace: a scheme prepared by the Rotary Club of Calcutta, 1936’ নামে পরিচিত।[১১] রোটারী ক্লাবের প্রকল্পের (Scheme) সঙ্গে মেন্ডিক্যান্সি কমিটির সুপারিশের মূলগত পার্থক্য ছিল না। এই প্রকল্পটি রূপান্তরিত করার জন্য **১৯৩৫** সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন এন. কে. বসু। তিনি সম্মেলনের চেয়ারম্যান হিসাবে কলকাতার নাগরিক সমাজের কাছে এই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মতামত চান এবং মতামতের বিষয়গুলি প্রকল্পটির সঙ্গে সংযুক্ত করেন।[১২] এছাড়া রোটারী ক্লাব দ্বারা গৃহীত প্রকল্পটিতে ‘ভিক্ষাবৃত্তিকে বেআইনি’ বলে ঘোষণা করা হয়।[১৩]

রোটারী ক্লাব দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে ‘বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি বিল’টিকে একটি আইনে রূপান্তরিত করা হয়। এই আইন দ্বারা অ-ইউরোপীয় ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের জন্য একটি

দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে তাদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপভাবে এই প্রকল্পটি কেবলমাত্র কলকাতা শহর ও কলকাতা শহরতলিতে কার্যকর করার কথা বলা হয়। এছাড়া ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের কুষ্ঠ, প্রতিবন্ধী, শিশু, কর্মহীন, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও পেশাদার ভিক্ষুক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভাজিত করা হয়।[১৪] এই সমস্যা সমাধানকল্পে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় প্রকল্পটিতে, - (ক) কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদের কুষ্ঠ কলোনিতে প্রেরণ করা, (খ) রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ ভিক্ষুকদের হাসপাতালে প্রেরণ করা, (গ) শিশু ভিক্ষুকদের স্কুলে প্রেরণ করা এবং (ঘ) শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করার মত আরও বেশ কিছু বিষয়কে অর্ন্তভূক্ত করা হয়।[১৫]

প্রকৃতিগত দিক থেকে ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে কুষ্ঠ কলোনি, হাসপাতাল, স্কুল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়গুলির সঙ্গে ভিক্ষুকদের যুক্ত করে। এছাড়া রোটারী ক্লাব বৌ-বাজারে অবস্থিত উদ্বাস্তু কেন্দ্রে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাস হিসাবে ব্যবহারের কথা ঘোষণা করে। আবাসটিতে সাময়িকভাবে ৫০০০ টাকা খরচের কথা বলা হয়, এছাড়া বার্ষিক ব্যয় হিসাবে ৭,২০০ টাকা অনুদান অনুমোদন করে। এই অনুদানের প্রেক্ষাপটে আবাস কেন্দ্রে ১০০ জন পুরুষ, নারী ও শিশু ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।[১৬] অপরাংশে সালভেশন আর্মি মেদিনীপুর গভর্মেন্ট গ্রাউন্ডের লেপার কলোনীতে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদের থাকার ব্যবস্থা এবং বার্ষিক ব্যয়ের জন্য অনুদান হিসাবে ৩০,০০০ টাকা ধার্য করা হয়। কলকাতা পৌরসভা অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদের জন্য একটি হাসপাতাল গড়ে তোলে মানিকতলা মেন রোডের কাছে। এই হসপিটালটিতে সাময়িকভাবে ১৫,০০০ টাকা এবং বার্ষিক ২০,০০০ অনুদানে প্রায় ২০০ জন অসুস্থ ভিক্ষুকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।[১৭] এছাড়া রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে 'The Society for Protection of Children' গঠিত হয়, যা শিশুদের শিক্ষা ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করে। বলাবাহুল্য,

রোটারী ক্লাব এই সমগ্র প্রকল্পটিতে বার্ষিক ১,২০,০০০ টাকা ও এককালীন ৭০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রায় ১,৫০০ জন ভিক্ষুকদের সাময়িক পরিষেবা প্রদান করেন।[১৮] আবার ১৯৩৬-এর ১৪ ই ফ্রেব্রুয়ারী বিধান পরিষদে এন. কে. বসুর নেতৃত্বে রোটারী ক্লাবের একটি দল গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনের কাছে ডেপুটেশন দেন ভিক্ষুক সমস্যা ও রোটারী প্রকল্পগুলির বিষয়ে।[১৯]

১৯৩৯ সালে কলকাতা শহর ও শহরাঞ্চলের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যার সমাধানকল্পে রোটারী ক্লাব কলকাতা পৌরসভার সঙ্গে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে একটি বিল তৈরির প্রস্তাব পেশ করে। এরপর ১৯৪২ সালে 'বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি অর্ডিন্যান্স' (Bengal Vagrancy Ordinance) জারি করা হয়, যা 'বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি অ্যাক্ট' (Bengal Vagrancy Act) নামে পরিচিত।[২০] ১৮২৪-এর 'ইউরোপীয় ভ্যাগরান্সি অ্যাক্টে'র অনুকরণে প্রণীত হয় 'দ্য বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি বিল'। ১৯৪৩ সালের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী এই বিল পেশ হয় 'প্রাদেশিক আইন সভা'য়। বিলটি সম্পর্কে বিধান পরিষদে বিতর্কের কোনো সুযোগ ছিল না, কারণ তৎকালীন 'প্রাদেশিক সরকারে'র (ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন সরকার) আকস্মিক পতনের ফলে বিলটি ২৪ শে সেপ্টেম্বর বিধান পরিষদে পাশ হয়ে যায়। যা ১৯৪৩-এর ২৫ শে অক্টোবর থেকে বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়।[২১]

১৯৪৩-এর ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ক্যালকাটা গেজেটে 'বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি বিলে'র মূল উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষিত করা হয়েছে এই বলে যে, - "There was long been a desire in Calcutta that some measures should be taken to deal with the 'Beggar Problem', not only out of compassion for the beggar themselves but also for the sake of the health and cleanliness' of the city. This desire has recently been accentuate by the conditions arising from the fact that Calcutta is now subject to air raids. Persons collects together in the close and crowded atmosphere of

an air raid shelter are exposed to a grave risk of infection through continue proximity to beggars suffering from leprosy or other contagious diseases. It would be dangerous to postpone action any longer; accordingly, in this bill Government propose to take powers to collect all genuine vagrants and place them in homes and in these homes to provide: (a) Food, shelter and clothing for all; (b) medical treatment for the sick; (c) Work for the able bodied; and (d) Education for the children and also for such adults as appear to be likely to benefit by it."[২২] - আইনটির মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভিক্ষুকদের প্রতি সহানুভূতিশীলতার কারণেই নয়, শহরের স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার কথাও বিবেচনা করা হয়েছিল। শহরের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আইনটিতে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যার সমাধানের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

৬.৩. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের বিশ্লেষণ:

১৯৩৯ সালে রোটারী ক্লাব ও কলকাতা পৌরসভার প্রস্তাবে ১৯৪৩ সালে 'বঙ্গীয় ভবঘুরে বিল'টি আইনে রূপান্তরিত হয়। এই বিলটি Bengal Act VII of 1943, The Bengal Vagrancy Act, 1943 আইনে পরিণত হয়।[২৩] প্রসঙ্গত, এই বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনটি ১৮২৪ সালে ইউরোপীয় ভবঘুরে আইনের অনুরূপ। ১৮২৪ সালে ইংল্যান্ডে ভবঘুরে আইন কার্যকর হলেও চতুর্দশ শতক থেকে ইংল্যান্ডে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৩৪৯ সালে তৃতীয় এডওয়ার্ড-এর রাজত্ব কালে 'Poor Law' দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত শারীরিক সুস্থ মানুষদের আবাসে বন্দী করে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হত।[২৪] কেবলমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হত। অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডে ১৮৯৬ সালে 'ওয়ার্ক হাউস অ্যাক্টে'র[২৫] মাধ্যমে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বন্দী করে পরিশ্রমসাধ্য কর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হত। ১৮৯৬ সালের 'ওয়ার্ক হাউস অ্যাক্ট' অনুকরণে বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের জন্য আবাস বা অন্যান্য প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। এই আইনটি ১৯৪৩-

এর ২৫ শে অক্টোবর হাওড়া, বালি, গোলাবাড়ি পুলিশ ষ্টেশন, টালিগঞ্জ, বেহালা, মেটিয়াব্রুজ, দমদম পুলিশ ষ্টেশন, কলকাতা এবং ২৪ পরগনা (নর্থ)-এ কার্যকর করা হয়েছিল।[২৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৩ সালের ভবঘুরে আইনটি কলকাতার ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। এই আইনের মূল বিষয়বস্তুগুলির বিশদ বিশ্লেষণ নিম্নরূপ। -

বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনটি চারটি অধ্যায়ে মোট ২৯ টি ধারায় বিভক্ত,[২৭] যার প্রতিটি অধ্যায় - (ক) Preliminary, (খ) Procedure, (গ) Receiving Centers and Vagrants Home, এবং (ঘ) Penalties and Miscellaneous অংশে বিভাজিত।

৬.৩.১. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের প্রথম অধ্যায়ের বিবরণ:

বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের প্রথম অধ্যায়ে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সম্পর্কে প্রাথমিক বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, - (ক) Short Title, Extent and Commencement, (খ) Definitions, (গ) Vagrancy Advisory Board, (ঘ) Appointment of Controller of Vagrancy and Assistants, এবং (ঙ) Special Magistrate.[২৮]

ভবঘুরে আইনে 'ভ্যাগ্রান্ট' বা 'ভবঘুরে' শব্দটির আইন নির্দেশিত অর্থ হল 'ভিক্ষুক'। 'বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি অ্যাক্টে'র ২(৯) ধারায় 'ভ্যাগ্রান্ট' শব্দটির সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, - "'Vagrant' means a person found asking for alms in any public place, or wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that such person exits by asking for alms but does not include a person collecting money or asking for food or gifts for a prescribed purpose."[২৯]

ভবঘুরে আইনে ভিক্ষুকদের সংজ্ঞায়ণের পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য ‘ভবঘুরে আবাস’-এর বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। ‘ভবঘুরে আবাস’গুলিতে ভিক্ষুকদের দৈনন্দিন চাহিদা ও বিভিন্ন কাজে জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার একটি পর্ষদ গঠন করেন যা ‘ভবঘুরে উপদেষ্টা পর্ষদ’ নামে পরিচিত। ভিক্ষুক সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলির পর্যবেক্ষনের জন্য পর্ষদটিতে মোট ১০ জন সদস্য নিযুক্ত করা হয়।[৩০]

ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বন্দী করার বিষয়টি বেশ জটিল। পুলিশ যে সকল ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বন্দী করেন তারা যথার্থই ভিক্ষুক কি না, তা বিচার্য বিষয়। অনুরূপভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো পুলিশ কর্মচারী ভিক্ষুকদের বন্দী করবেন কি না। অবশ্য এই বিষয়টি সম্পর্কে ভবঘুরে আইনের ৬ নং ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপ। -

“Any Police Officer authorized in this behalf by the Commissioner of Police in Calcutta and by the District Magistrate elsewhere may require any person who is apparently a vagrant to accompany him or any other police officer to, and to appear before, a Special Magistrate.”[৩১]

কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ-এ একটি নির্দিষ্ট পদ ছিল, যিনি ভিক্ষুক ও ভবঘুরে বন্দীর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন। এই পদটির নাম ও. সি. (বেগারি)। কিন্তু রেল স্টেশন থেকে ভিক্ষুকদের বন্দীর বিষয়টি জেনারেল রেলওয়ে পুলিশের বা জি.আর.পি’র অধীনে। রেল স্টেশনের ভিক্ষুকদের বন্দীর বিষয়টি ভবঘুরে আইনে গ্রেপ্তার হিসাবে উল্লিখিত করা হয়নি। ভবঘুরে আইনের ২(৯) ধারা অনুযায়ী পুলিশ বিনা পরোয়ানায় যে কোনো ভিক্ষুককে গ্রেপ্তার করে বন্দী করতে পারেন এবং তারা যদি গ্রেপ্তারে অসম্মত হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও শাস্তির বিধানের কথা বলা হয়েছে। ভবঘুরে আইনের ২০ নং ধারায়[৩২]

এক মাসের কারাবাস ও জরিমানা অথবা একই সঙ্গে কারাবাস ও জরিমানা উভয় প্রযোজ্য। ভিক্ষুকদের বন্দী করার পর স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট-এর দপ্তরে নিয়ে আসার পর বিচার প্রক্রিয়া শুরুর কথা বলা হয়েছে। বন্দী ভিক্ষুকদের বর্ণনা দিয়ে বিচার পর্ব শুরু হত এবং আইনি প্রক্রিয়ায় সেই ব্যক্তি যদি ভিক্ষুক হিসাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে 'ঢাকুরিয়ার রিসিভিং সেন্টারে' তাকে প্রেরণ করা হত। এছাড়া ভিক্ষুক সন্দেহে কাউকে বিনা বিচারে যাতে বন্দী না করা হয় সেক্ষেত্রে বিচারকের স্বাধিকার প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে যে,- "Government may empower any presidency Magistrate in Calcutta and any Magistrate of the first class elsewhere to act as a Special Magistrate."[৩৩]

সারণি - ৬.২: বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট এর বিচারক্ষেত্র ও বিচারাধীন অঞ্চল (Jurisdiction of the Special Magistrate)

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	জেলা	বিচার ক্ষেত্রের অধীন অঞ্চল
১	মিউনিসিপাল ম্যাজিস্ট্রেট, সেকেন্ড কোর্ট, কলকাতা।	কলকাতা	কলকাতা মিউনিসিপাল অঞ্চল।
২	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, থার্ড কোর্ট, হাওড়া।	হাওড়া	হাওড়া মিউনিসিপাল অঞ্চল।
৩	সাব-ডিভিশন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর নর্থ।	উত্তর ২৪ পরগনা	ব্যারাকপুর সাব-ডিভিশন

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের বৈদ্যুতিন মাধ্যম। http//www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২৫.০৭.২০১৯।

ভবঘুরে আইন অনুযায়ী মোট ৩ জন বিচারক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পদে রয়েছেন এবং ৩টি স্থানে বিচারালয় বা আদালতের ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হল,- (ক) ঢাকুরিয়ার 'নিউ ভ্যাগ্রান্ট হোম', (খ) আন্দুলের 'ক্যাজুয়াল ভ্যাগ্রান্ট হোম' এবং (গ) বারাসাত 'এস. ডি. জে.

এম. আদালত’ সারণি ৬.২-এ বিচারালয় ও বিচার ক্ষেত্রের অঞ্চলের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকুরিয়া ও আন্দুলে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার কার্য চালু হলেও বারাসাতে বিচার কার্য শুরু করা যায়নি। প্রতিটি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্ভিসের অধীনে ও ভবঘুরে সংক্রান্ত বিচার কার্যে ম্যাজিস্ট্রেটদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৪] কারণ ভবঘুরে আইন অনুসারে পুলিশ যদি কোনো ভিক্ষুককে বন্দী করে, তাহলে সেই সকল ভিক্ষুকদের বিশেষ বিচারকের (স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট) সামনে হাজির করতে হত, যতক্ষণ না তিনি ঐ ব্যক্তিকে বা ভিক্ষুকদের ‘ভ্যাগ্রান্ট’ বলে ঘোষণা করছেন, ততক্ষণ ঐ ব্যক্তি শুধুমাত্র ‘অ্যাপারেন্টলি’ অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যারা ভবঘুরে এবং তাদেরকে কোনো হোমে রাখা নিয়ম বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত করা হত। যেহেতু বন্দী ব্যক্তিদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত করা বাধ্যতা মূলক সেক্ষেত্রে পুলিশ সাধারণত ভিক্ষুক ধরার সময় এমনভাবে স্থির করতেন যাতে বন্দীদের ঐ দিন আদালতে হাজির করা যায়।

৬.৩.২. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবরণ:

ভিক্ষুকদের বন্দীর ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও বিচারকদের মধ্যে সমন্বয় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য এই সমন্বয়ের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন কন্ট্রোলার অফ ভ্যাগরান্সি বা সি. ভি. (Controller of Vagrancy or C.V)। এক্ষেত্রে পুলিশ ও বিচারকদের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে ভিক্ষুক বন্দীর ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে সি. ভি. পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। অবশ্য পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট যদি নিজেদের মধ্যে কোনো আলোচনা না করে ভিক্ষুকদের বন্দী এবং বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে থাকেন, সেক্ষেত্রে ভিক্ষুকদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় নির্মিত আবাসনগুলিতে বন্দী রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হত। কেন-না সরকারি তথ্য অনুযায়ী আবাসগুলির সম্মিলিত ধারণ ক্ষমতা ২৩৭৫ জন।[৩৫] প্রকৃত ধারণ ক্ষমতা আরও কম। শুধুমাত্র কলকাতার ভিক্ষুক সংখ্যা এই ধারণ ক্ষমতার কয়েকগুণ

বেশী। যদিও সারা পশ্চিমবঙ্গকে এই আইনের আওতায় আনা হয়নি। এক্ষেত্রে ভবঘুরে আইনের ১(২) উপধারাতে 'জুরিসডিকশন' বা বিচারক্ষেত্র নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, – "It extends to the whole West Bengal" এবং আইনটির ১(৩) উপধারাতে উল্লিখিত হয়েছে, "It shall come into force in Calcutta at once and in such other areas such other dates as the State Government may by notification in the Official Gazette, direct"।[৩৬] এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৪৪ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি 'গেজেট নির্দেশিকা' দ্বারা ভবঘুরে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তৎকালীন কলকাতা পৌরসভা, হাওড়া থানা, বালি থানা, গোলাবাড়ি থানা এবং টালিগঞ্জ, বেহালা, মেটিয়াব্রুজ, বরানগর এবং দমদম থানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করা হয়েছিল। ভবঘুরে আইনে ১৯৪৪ সালের পর নতুন কোনো অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ভবঘুরে আইনের (BVA) ৭ নং ধারায় বিশেষ বিচারকের (Special Magistrate) দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে, - "When a person is brought before a Special Magistrate under Section 6, such special Magistrate shall make a summary inquiry in the prescribed manner into the circumstances and character of such person, and if, after hearing anything which such person may wish to say he is satisfied that such person is a vagrant he shall record a declaration to this effect and the provisions of this Act relating to vagrants shall thereupon apply to such person."[৩৭]

ভবঘুরে আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে পুলিশ রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার পর বিচারক ওই ব্যক্তির সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার করার পর তিনি যদি নিশ্চিত হন যে, ঐ ব্যক্তির জীবিকা ভিক্ষা তাহলে তাকে ভ্যাগ্রান্ট বা ভবঘুরে হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন মানুষকেও ভবঘুরে হিসাবে গণ্য

করে আবাস বন্দী করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ‘আজকাল’ পত্রিকার একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্যাঙ্গালোরের এক ব্যবসায়ী কলকাতায় এসে পকেটমারের দ্বারা সর্বশান্ত হয়ে প্রায় দু’বছর ভবঘুরে আবাসে থাকার পর মুক্তি পান। পত্রিকায় বর্ণিত খবরটি হল নিম্নরূপ, -

> “বাড়ি ফিরে যেতে পেরেছেন হস্তিমল নামের এক ব্যবসায়ী। দু’বছর আগে ব্যবসার কাজে কলকাতা এসেছিলেন তিনি। হাওড়া স্টেশনে নেমেই পড়ে যান পকেটমারের খপ্পরে। পকেটের পুরো টাকা খুইয়ে রাত কাটাতে এসে যথারীতি পুলিস তাঁকে পাকড়াও করে। বিচারকের নির্দেশে তাঁর হোমে ঠাঁই হয়। বার বার নিজের পরিচয় দিয়েও রেহাই পাননি। অবশেষে খবর পেয়ে ছেলে এসে বাবাকে মুক্ত করে নিয়ে যান নিজের বাসায়”।[৩৮]

অনুরূপভাবে এই বিষয়টি সম্পর্কে ‘Outlook’ পত্রিকা থেকেও বিবরণ পাওয়া যায়, -

> “On her way home from work three months ago, Salwar Bibi, a maid servant in Calcutta, had queued up for food outside a gruel kitchen when the police arrived. They mounted her-up along with a few others, boarded them into a van and sped off. A few hours later, they were produced before a Magistrate and sent packing to a vagrant’s home. At the time, the bewildered main implored the authorities to release her-for she never begged, and had a husband and a child waiting for her at home. Three days later, authorities traced her address and sent her back home.” [৩৯]

ভবঘুরে আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আরও অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস অথবা পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, রাষ্ট্র ও আইনের মধ্যে দিয়ে যত মানুষ আবাসে বন্দী হয়ে রয়েছেন তাদের সবার কথা বলার পরিসর কোথাও নেই। প্রতিটি আবাসে অসংখ্য মানুষ নিজেদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে কখনো

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, কখনো আবার হতাশায় ভেঙে পড়েন। যদিও হাতে বেড়ি নেই, অস্ত্র ধারী-উর্দি ধারী রক্ষী নেই, নির্যাতন নিপীড়ন নেই – বরং সহানুভূতিশীল অসংখ্য কর্মীর সাহায্যে তাদের যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে, তবুও নিজেদের বন্দী বলেই মনে করেন তাঁরা।

৬.৩.৩. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের বিবরণ:

বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১১ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে, - "A declaration that a person is vagrant recorded by a Special Magistrate under sub-section (1) of section (7) shall be sufficient authority to any person to retain such vagrant in his custody when such person is under the provisions of this Act or as any rule made there under conveying a vagrant from the Court of a Special Magistrate to a receiving centre or from a receiving centre and to the Manager of a vagrant's home for detaining such vagrant in accordance with the provision of his Act in a receiving centre or vagrant's home, as the case may be."[৪০]

ভবঘুরে আইনটি কার্যকর করার সময় বিধান পরিষদের অনেক সদস্য আপত্তি জানিয়ে ছিলেন এই এক রৈখিক আইন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ১৯৪৩ সালে ১৫ ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি বিলের ওপর বিতর্কের সময় বিধান পরিষদের সদস্য হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেন, ৭(৩) ধারাটির সঙ্গে আরো একটি উপধারা সংযোজন করা উচিত। তাঁর প্রস্তাবিত উপধারাটিতে বলা হয়, - "A person declared to be a vagrant under sub-section (1) of Section 7 may apply for revision of the declaration or may appeal to have it set aside in accordance with the procedure laid down in the Criminal Procedure Code, as if the declaration was an order under section 118 of the said code." [প্রস্তাবিত উপধারা নং ৭(৪)][৪১]

প্রকৃতপক্ষে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, রাজনৈতিক স্বার্থে আইনটি ব্যবহৃত হতে পারে। যদিও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই আইনটি কখনো ব্যবহৃত হয়েছে এমন ঘটনার উদাহরণ না থাকলেও আবাসে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যারা নিজস্ব জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভবঘুরে আবাসে অর্থহীন জীবনযাপন করেছেন। হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বিধান পরিষদের (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) স্পীকারকে উদ্দেশ্য বলেছেন, - "Sir, you will find that once a person is taken to Magistrate and is declared to be a vagrant there is almost an end of him. He has got to go almost jail and remain there for such a length of time as it suits the pleasure of the Controller of Vagrancy."[৪২]

অনুরূপভাবে এ বিষয়ে বিধান পরিষদের সদস্য (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) ড. নলিনাক্ষ স্যান্যাল সহমত প্রশন করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন, - "It is only fair and reasonable that an opportunity should be provided in the Act itself to the person who is declared to be a vagrant to seek some remedy in case he feels aggrieved by such an order."[৪৩]

প্রকৃতপক্ষে যা আইন হিসাবে বর্ণিত করা হয় অন্যদিকে তা বে-আইনি। একদিকে সংবিধান স্বীকৃত নানা অধিকার অন্যদিকে তা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এই সাংবিধানিক সমস্যায় বহু নিরপরাধ মানুষ যারা নানা আবাসে বন্দী হিসাবে জীবনযাপন করে। এই বন্দী দশার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদও নেই। মূলত এরা জেলের অপরাধীদের থেকে আলাদা।

৬.৩.৪. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ:

১৮২৪ সালের 'দি ইউরোপীয় ভ্যাগরান্সি অ্যাক্ট' (E.V.A.)-এর উল্লেখ করে ড. নলীনাক্ষ স্যান্যাল বলেন এই আইনে আপিলের সুযোগ থাকায় 'রোগ' (Rogue) বা 'ভ্যাগাবন্ড'দের

বঞ্চিত করা হয় না। বিধান পরিষদের বির্তকের সময় ড. নলিনাক্ষ স্যান্যাল বা হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে ১৮ নং ধারা উল্লেখ করে বলেন যে, এই ধারায় কন্ট্রোলারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ করে যে কোনো ব্যক্তিকে আবাস থেকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিতে পারেন।[৪৪] ভবঘুরে আইনের ১৮ নং ধারাটিতে ভিক্ষুকদের মুক্তির বিষয়টি সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে ভবঘুরে আইনের ১৮(১) ধারার বিষয়বস্তুগুলি উল্লেখ করা যায়, - "A vagrant may be discharged from vagrant's home under of the controller, - (a) On the manager of such vagrant's home certifying in the prescribed manner that satisfactory employment has been obtained for such vagrant; (b) On being shown to the satisfaction of the controller that such vagrant has become possessed of an income sufficient to enable him to support himself without resorting to vagrancy; (c) On a relative of such vagrant, or a person who the controller is satisfied is interested in the welfare of such vagrant, entering into a bond with or without sureties for a sum prescribed, to look after and maintain such vagrant and to prevent him from resorting to vagrancy; (d) For other good and sufficient reasons to be recorded by the Controller in Writing."[৪৫]

ভবঘুরে আইনের ১৮(২) নং ধারায় কোনো ভিক্ষুক বা ভবঘুরেদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি হল, - "When the employment referred to in clause (a) of sub-section (1) has been obtained for a vagrant, any such vagrant refusing or neglecting to avail himself thereof shall be liable to be punished on conviction before a Magistrate, with rigorous imprisonment for a term which may extend to one month."[৪৬]

প্রকৃতপক্ষে ভবঘুরে আইনের এই ধারা অনুযায়ী ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেতে গেলেও দীর্ঘ সময় তাদের ভবঘুরে আবাসে থাকতে হত। কারণ ভবঘুরে আইন অনুযায়ী কোনো বন্দী যদি ভিক্ষুক বা ভবঘুরে হিসেবে চিহ্নিত না হয়, অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি

যার প্রকৃত পেশা ছিল না, তা সত্ত্বেও তাকে যদি আবাসে বন্দী করা হয়, তা বে-আইনি বলে গণ্য করা হয় না। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী বলেছেন, - "If they are not strictly vagrants it could be a matter of illegal detention."[৪৭]

ভবঘুরে আইনে ১৮ নং ধারায় ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের মুক্তির বিষয়ে বেশ কয়েকটি নির্দেশাবলী বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন - (ক) ভবঘুরে আবাসের আধিকারিক যদি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে আবাসের কোনো ভিক্ষুক ও ভবঘুরের কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন, সেক্ষেত্রে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে সেই ভিক্ষুকে মুক্তি দিতে পারেন। (খ) ভবঘুরে আবাসে থাকাকালীন কোনো ভিক্ষুক যদি তার আয়ের সাহায্যে যে কোনো কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে পারে এবং সে যদি ভবিষ্যতে আর ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেক্ষেত্রে তাকে মুক্তি প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। (গ) ভিক্ষুক বা ভবঘুরের কোনো আত্মীয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সহায়তার দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে ও ভবিষ্যতে সেই ব্যাক্তি যদি আর ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়, সে বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করলে, তা বিবেচনা করার পর সেই ব্যাক্তিকে মুক্তি প্রদান করা যায়। (ঘ) এছাড়া ভবঘুরে কন্ট্রোলার অন্যান্য বিষয়গুলির উপর বিবেচনা করে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের মুক্তি প্রদান করে থাকেন।[৪৮]

ভবঘুরে আইনের ১৮(ক) ধারায় ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পুনর্বাসন অর্থাৎ কর্মসংস্থানের দ্বারা সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত আছে। কিন্তু বাস্তবে, এই আইন দ্বারা ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের কথা উল্লিখিত হলেও আবাসের আধিকারিকদের পক্ষে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার মতো কোনো জীবিকা সংস্থান করে দেওয়া সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।[৪৯] ভবঘুরে আইন কার্যকর করার পর কতজন ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাস থেকে ছাড়া

পেয়ে সুস্থ জীবন-জীবিকাতে পুনর্বাসিত হয়েছেন, সে তথ্য জানা দুঃসাধ্যের বিষয়। ভবঘুরে দপ্তরের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯-২০০০ সালে দু'জন ভবঘুরে – রঙ্গা রাও ও মাটিন-ডি মোরেস্-এর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।[৫০] এক্ষেত্রে বলা যায়, ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের কর্মসংস্থানের সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য হলেও সামগ্রিক সংখ্যার তুলনায় এটি দৃষ্টান্ত হিসাবে অতি উজ্জ্বল ও প্রাসঙ্গিক।[৫১]

ভবঘুরে আইনের ১৮(খ) ধারায় ভবঘুরে মুক্তির বিষয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ করা যায়, আবাসে থাকার জন্য ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বিভিন্ন রকম বৃত্তিমূলক কাজের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্য চলার সময় এদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা ও পাশাপাশি তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ইনসাইড ওয়ার্কার ওয়েজেস স্কীমের মাধ্যমে তাদের জন্য কিছু টাকা সঞ্চিত করা হয়। কারণ এদের মুক্তির সময় তাদের সঞ্চিত অর্থ তাদের হাতে দেওয়া হয়, যাতে তারা ঐ অর্থের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।[৫২] ১৯৮০ সালে ইনসাইড ওয়ার্কার ওয়েজেস স্কীমের দ্বারা দৈনিক চার টাকা পাঁচ পয়সা হারে সর্বাধিক ছয় মাস বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রকল্পের দ্বারা যে পরিমান বৃত্তি প্রদান করা হত, তার সাহায্যে বিকল্প কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। ফলে যে সকল ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তি প্রদান করা হত, তারা পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত। ১৯৯৭ সাল থেকে ইনসাইড ওয়েজেস স্কীমের মাধ্যমে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে মুক্তির বিষয়টি বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই প্রকল্পের সাহায্যে যাদের মুক্তি প্রদান করা হয়েছিল, তাদের পক্ষে এই অর্থের সাহায্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতার বাস্তবায়ণ ঘটানো সম্ভব না হওয়ায় ভিক্ষুকরা পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে আসে।[৫৩] অনুরূপভাবে ভবঘুরে আইনের ১৮(খ) ধারায় কন্ট্রোলারের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'for other good and sufficient reasons'-এ ভিক্ষুকদের মুক্তি প্রদান করতে পারেন। এই ধারা অনুযায়ী ১৯৯০ সালে হোম রিফর্ম কমিটি

ভবঘুরে কন্ট্রোলারের উদ্দেশ্যে রির্পোট পেশ করেন, - “The Fourth provision is operative in an inverse way as the Controller often finds ‘good’ or sufficient reasons not to discharge them because most of them are physically deformed or mentally deficient or both. A deaf and dumb, blind, lunatic or leper cannot be turned out into the wilderness to fend for himself.”[৫৪] সুতরাং এই ধারার প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা দুই প্রশ্নচিহ্নের উপরে দাঁড়িয়ে। কারণ ভবঘুরে মুক্তির ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক কারণের উল্লেখ করতে পারেন নি। ফলে ভিক্ষুক মুক্তির বিষয়টি প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ভবঘুরে আইনে ১৮(গ) ধারা অনুযায়ী ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের মুক্তির ক্ষেত্রে তাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন এসে দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুত দেয়, তাহলে তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট সব দিক বিবেচনা করার পর মুক্তির কথা ঘোষণা করবেন।[৫৫] ভবঘুরে আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত সর্বাধিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে মুক্তি পেয়েছে ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯-এর সময়কালীন পর্বে। এই সময়কালের মধ্যে মোট ৩০২ জন ভিক্ষুক ও ভবঘুরে ছাড়া পেয়েছেন।[৫৬] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ভবঘুরে আইন কার্যকর করার পর থেকে ভবঘুরে মক্তির ক্ষেত্রে ১৮(ক) ধারা অনুযায়ী এক জন চাকরি পেয়ে ছাড়া পেয়েছেন ও অন্যান্যরা প্রায় ১৮(গ) ধারা অনুসারে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরে গেছে। আবার ভবঘুরে আবাসে নতুন কোনো ভিক্ষুক ও ভবঘুরে এলে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আবাসের ম্যানেজার, জুনিয়র সোশাল ওয়ার্কার, শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মীরা এই সকল ব্যক্তিদের পরিচয় বা আত্মীয়-স্বজনদের পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্য অসম্পূর্ণতার কারণে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। ফলতঃ ভবঘুরে

আবাস কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও এই সকল ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পুনর্বাসন সম্ভব হয় না।

৬.৪. বঙ্গীয় ভবঘুরে দপ্তরের গঠন ও কার্যপ্রণালী:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ [Department of Women & Child Development and Social Welfare (DWCD&SW)] দপ্তরের অধীনে ভবঘুরে নিয়ামক (Controller of Vagrancy) দপ্তর 'বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩'-এর দ্বারা বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যকলাপের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং কিশোর ভিক্ষুকদের (Juvenile Beggars) সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেছে। ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে তিনটি প্রকল্পের[৫৭] উদ্যোগ নেয়, যথা: (ক) ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে ভবঘুরে আইন কার্যকর করা। (খ) কিশোর ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধান এবং নিয়ন্ত্রণ, এবং (গ) ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ প্রকল্প।

৬.৪.১. ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের কার্যকলাপ:

১৯৪৩ সালে 'বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন' কার্যকর করার দরুন ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানকল্পে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের পরিচালনের জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে বিভিন্ন পদমর্যাদায় কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয়। সারণি - ৬.৩-এ ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মীদের পদমর্যাদার বিষয়টি দ্রষ্টব্য। এই দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর সাহায্যে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যার বিষয়গুলি নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। এর থেকে শহরের ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের অবস্থান ও তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণা পাওয়া যায়। এই তথ্যের সাহায্যে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর ভিক্ষুক সমস্যার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অন্যদিকে ১৯৬৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতার রাজা বাজার অঞ্চলে প্রথম ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে কিশোর ভিক্ষুক ও ভবঘুরে (Juvenile Beggary and Vagrancy) নিবারণের জন্য বিশেষ প্রকল্প তৈরি করে, যা ভারত সরকারের শিশু আইনের ১৯৬০ এর অনুরূপ।[৫৮] এই প্রকল্পটি হাওড়া, হুগলী ও কলকাতা সহ পাঁচটি বস্তি অঞ্চলে গড়ে তোলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ কল্পে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভবঘুরে আবাসগুলিতে সক্ষম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই প্রকল্পটি ১৯৯৭-৯৮ সালের ভারত সরকারে সমাজকল্যাণ দপ্তরের অনুকরণে গড়ে তোলা হয়।[৫৯]

সারণি - ৬.৩: ভবঘুরে দপ্তরের প্রশাসন ও কর্মী সংখ্যার গঠন কাঠামো

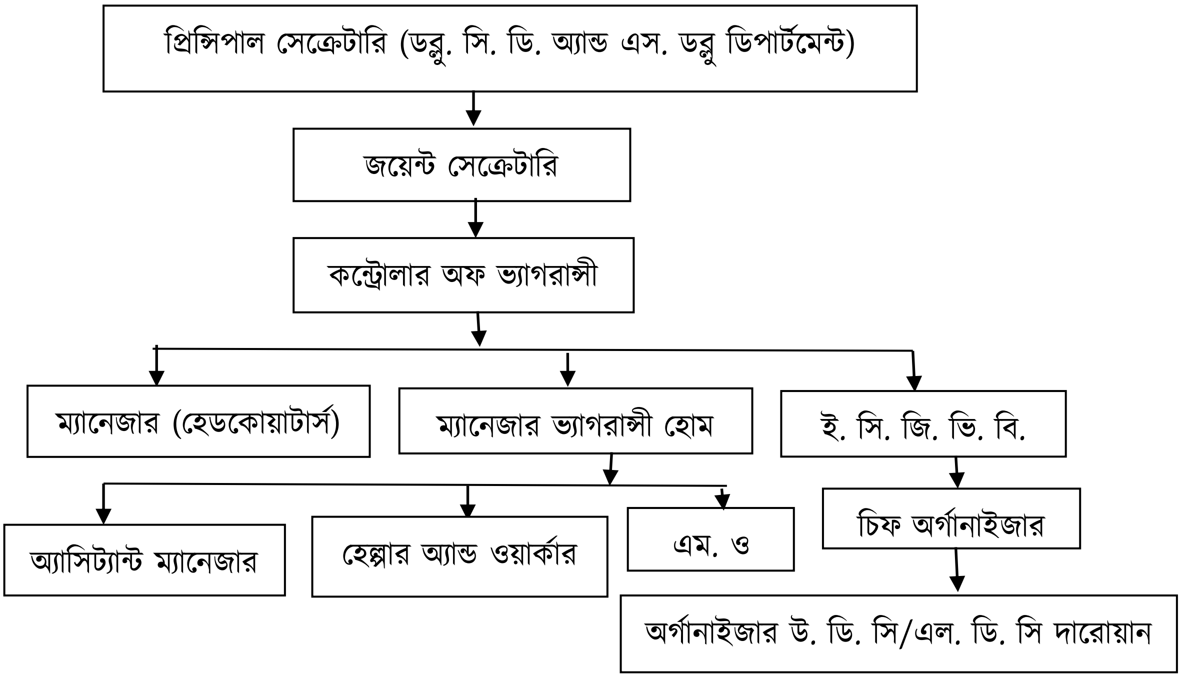

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিন মাধ্যম। http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২০.০৯.২০১৯।

প্রায় ৭৫ বছর ধরে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর ও দপ্তরের কার্যপ্রণালী চলছে। স্বাভাবিক ভাবে এই আইনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রয়োজন ধারাবাহিক তথ্যপঞ্জী, দলিল ও নথিপত্রের। কিন্তু এই কাজটির পূর্ণাঙ্গ রূপ সেভাবে গড়ে তোলা সম্বব হয়নি। দেশভাগের

সময় বিভিন্ন মন্ত্রকের ন্যায় এই দপ্তরটির অন্তর্ভুক্তি হলেও, বিভিন্ন সময়ে দপ্তরটির স্থানান্তরের ফলে এই দপ্তরের বহু প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল ও দস্তাবেজের বিবরণ পাওয়া যায় না সাম্প্রতিক কালে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রাক্তন কর্মচারীদের স্মৃতিকথা, চিঠি-পত্র, পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও সরকারি দলিল ও দস্তাবেজের উপর নির্ভর করতে হয়।

৬.৪.২. ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের কার্যালয়:

'দ্য ক্যালকাটা গেজেটে'র ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩'-এর সংখ্যায় 'দা বেঙ্গল ভ্যাগরান্সি বিল, ১৯৪৩' প্রকাশিত হয়।[৬০] বিধানসভা ও বিধান পরিষদে এই বিলটি পেশ করা হলেও, তৎকালীন সময়ে সরকার ভেঙে যাওয়ার কারণে বিলটি নিয়ে আলোচনা করা যায়নি। ১৯৪৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পুনরায় বিলটি নিয়ে বিধান পরিষদে বিতর্কের পর তা আইনে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গত, বিধান পরিষদে জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী খান বাহাদুর মৌলবী জালালুদ্দিন আহমেদ ভবঘুরে বিলটি আইন হিসাবে কার্যকার করার জন্য তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন, - "We have at present got provision for only one thousand beggars and they will be carried to Mahalandi where there is accommodation for 7000 men".[৬১] অন্যদিকে বিধান পরিষদের সদস্য সি. ই. ক্লার্ক বিলটির বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, - "This (Mahalandi) site was acquired as far back as August, 1942 and it seems to us that the delay in completing the homes cannot be entirely explained away by the lack of building materials or coal, as was one time suggested".[৬২] এ সময় বিধান পরিষদের অধিবেশনে মুর্শিদাবাদের মহালন্দীতে আবাস তৈরি কথা ঘোষণা করা হলেও সেটি তৈরি হতে প্রায় ৩৩ বছর সময় লেগে যায়। ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে আবাস তৈরিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার পরেও আবাসের ধারণ ক্ষমতা মাত্র ২০০ জনের। এক্ষেত্রে স্পষ্টত বোধগম্য যে, বিপুল সংখ্যক ভিক্ষুকের জন্য এই উদ্যোগ আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না। তবে ১৯৭৬ সালে পুরুষদের জন্য এবং ১৯৮৫ সালে

মহিলাদের জন্য দুটি আবাস তৈরি করা হয়। এই আবাসগুলিতে মোট ২০০ জন ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৩ সালে ভবঘুরে নিয়ামক (সি. ভি) দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও রিসিভিং সেন্টার ১৬২/বি লোয়ার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড) অবস্থিত ছিল। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর ওই স্থানে ছিল।[৬৩] পরবর্তীকালে ভবনটি সংস্কারের জন্য ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর সাময়িক সময়ের জন্য বিধান নগরে পূর্ত ভবনে স্থানান্তরিত করা হলেও দপ্তরটি পূর্বের ঠিকানায় আর স্থানান্তরিত করা হয় নি। বর্তমানে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরটি পূর্ত ভবনে অবস্থিত। লোয়ার সার্কুলার রোডে রিসিভিং সেন্টার থাকলেও সেখানে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আইনটি কার্যকর হওয়ার প্রথম দিকে এই স্থানে সপ্তাহে চার বিচারকার্য পরিচালনা করা হত। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য চার জন স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট (আলিপুর), পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট (শিয়ালদহ), পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট (হাওড়া) এবং পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট (প্রেসিডেন্সি), এছাড়া রিসিভিং সেন্টারের দায়িত্বে থাকতেন একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বর্তমানে পদটি নাম ও. সি. (Officer-in-Charge) রিসিভিং সেন্টার।[৬৪] তাঁর দায়িত্ব হল বিচারক কোনো ব্যক্তিকে ভিক্ষুক বা ভবঘুরে ঘোষণা করলে তাদের নির্দিষ্ট আবাসে প্রেরণ করা।

৬.৪.৩. ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের প্রকল্প:

পঞ্চাশের দশকে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে রিসিভিং সেন্টার ৩৪/১ বি. টি. রোডে স্থানান্তরিত করা হয়। অনুরূপভাবে ১৯৬২ সালে রিসিভিং সেন্টারের প্রধান কার্যালয়ে (১৫৩, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৭৮) স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই ঠিকানায় রিসিভিং সেন্টারের সকল কার্য পরিচালনা করা হয়। ১৯৬২ সালের ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের বিবরণ অনুযায়ী কলকাতায় মোট ছয়টি ভবঘুরে আবাস তৈরি করা

হয়েছিল।[৬৫] সারণি ৬.৪-এ ভবঘুরে আবাসের নাম, ঠিকানা, কোনো ধরনের ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের রাখা হয় ও তাদের সংখ্যার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৬১-১৯৬২ সালের ভবঘুরে দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভবঘুরে আবাসগুলিতে সর্বমোট ২২৫০ জন ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময় কালে কলকাতাতে সাতটি আবাস গড়ে তলা হয়।[৬৬] আবাসগুলি হল, - (১) ক্যাজুয়াল ভ্যাগ্রান্ট হোম, ১২০ আন্দুল রোড, (২) মেল ভ্যাগ্রান্ট হোম, ১৭/১ ক্যানাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, (৩) ফিমেল ভ্যাগ্রান্ট হোম, রাজমোহন রোড, উত্তরপাড়া, (৪) চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্ট হোম, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, আড়িয়াদহ, (৫) স্পেশাল ভ্যাগ্রান্ট হোম, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, (৬) লেপ্রোসি ভ্যাগ্রান্ট হোম, ৭৫/১, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা ১০ এবং (৭) ডেস্টিটিউট চিলড্রেন হোম, রাজমোহন রোড, উত্তরপাড়া।

ভবঘুরে আবাসগুলি যে সকল স্থানে তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তীতে কিছু স্থানের পরিবর্তন হয়। যেমন, - ক্যাজুয়াল ভ্যাগ্রান্ট হোম প্রথমে ক্যানাল সাউথ রোডে অবস্থিত ছিল; কিন্তু ১৯৫৪ সালে বর্ধমানের গোলাপবাগ স্থানান্তরিত করা হয়, বর্তমানে যেটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। আবার ১৯৬০ সালের এই হোম আন্দুলে স্থানান্তরিত হয় এবং এখনও সেখানেই অবস্থিত। একইভাবে ১৯৬০ ফিমেল ভ্যাগ্রান্ট হোম, ১৭/১, ক্যানাল স্ট্রীট থেকে রাজমোহন রোড, উত্তরপাড়ায় সরকার অধিগৃহীত রাজা নিমাই মোহন মুখার্জীর বাড়িতে এই আবাসটি স্থানান্তরিত করা হয় এবং ক্যানাল স্ট্রীটে ওমেন স্পেশ্যাল হোম' নামে আরো একটি আবাস ছিল, যা ফিমেল ভ্যাগ্রান্ট হোমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

অন্যদিকে চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্ট হোম প্রথম পর্যায়ে কোথায় অবস্থিত ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্ট হোমটি বর্ধমানের তোষাখনায় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ১৯৬৬ সালে চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্ট হোমটি বর্ধমান থেকে

শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, আড়িয়াদহে স্থানান্তরিত হয়, যার বর্তমান নাম ধ্রুবাশ্রম। অবশ্য ১৯৮৬ সালে জুভেইনাল জাস্টিস অ্যাক্ট, প্রবর্তিত হবার পর শিশু ভবঘুরেদের জন্য বিকল্প কোনো দপ্তর রাখা হয়নি। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ [Department of Women & Child Development and Social Welfare (DWCD&SW)] দপ্তরের ভবঘুরে নিয়ামক (Controller of Vagrancy) দপ্তরের অধীনে রাখা হয়।[৬৭]

ভবঘুরে আইনে কার্যকর করার দুই দশকের মধ্যে ভবঘুরে আবাসগুলি তৈরি করা হলেও আবাসগুলিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে লেপ্রোসি ভ্যাগ্রান্ট হোম, ডেস্টিটিউট চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্ট হোম এবং মেল ভ্যাগ্রান্ট হোম, - এই তিন হোমই বেলেঘাটার একই স্থানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালে ডেস্টিটিউট চিলড্রেন ভ্যাগ্রান্ট হোম, রাজমোহন রোড, উত্তরপাড়া স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯৭৫ সালে মেল ভ্যাগ্রান্ট হোমকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁয় পেট্রাপোল অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়।[৬৮] অন্যদিকে পঞ্চাশের দশকে স্পেশ্যাল ভ্যাগ্রান্ট হোম, ১৫৩ নং শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়ায় তৈরি করা হয়। পুনরায় ১৯৬২ সালের স্পেশ্যাল ভ্যাগ্রান্ট হোম, মেদিনীপুর ওল্ড জেল বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।[৬৯]

ভবঘুরে আবাসগুলির পাশাপাশি ১৯৬২ সালের ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে টি. সি. পি. সি অর্থাৎ ট্রেনিং কাম-প্রোডাকশন সেন্টার যুক্ত করা হয়, যা পূর্বে রিফিউজি রিলিফ এণ্ড রিহ্যাবিলিটিশন দপ্তরের অধীনে মেদিনীপুরের তাঁতিগেড়িয়ায় অবস্থিত ছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে ভবঘুরেদের আবাস তৈরির পাশাপাশি অস্থায়ী আবাস ও ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, - ভবঘুরে আবাস তৈরির ক্ষেত্রে ভবঘুরে আইনে সে সকল নিয়মাবলীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা অস্থায়ী আবাস বা

ডিটেনশন ক্যাম্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হত না। এছাড়া ভবঘুরে আইন অনুযায়ী ভবঘুরে আবাসগুলিতে যে পরিষেবা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া ছিল সেগুলি এই সকল অস্থায়ী আবাস বা ক্যাম্পে প্রদান করা হত না। এ বিষয় সম্পর্কে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সরকার তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৫৬ সালে চৌ-এন-লাই পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণকালে শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি শিয়ালদহ থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। এক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের কাছে এটি সমস্যা হিসাবে পরিণত হয়, কারণ শিয়ালদহ স্টেশন ও আউট্রাম ঘাটে হাজার হাজার হত দরিদ্র উদ্বাস্তুরা ঝুপড়ি বানিয়ে থাকত। এই বিষয়টি চৌ-এন-লাই'য়ের নজরে বিষয়টি আসুক সেটি তৎকালীন সরকার চাননি। এই বিষয়টি সমাধানকল্পে সরকার পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে এই সকল অঞ্চল থেকে দরিদ্র ও উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়।[৭০] এই সকল মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য টালিগঞ্জের পরিত্যক্ত ইন্দ্রলোক স্টুডিও ও কাশীপুরের অ্যাটলাস জুট প্রেসের গোডাউনে স্থানান্তরিত করার কথা ঘোষণা করা হয়। ফলে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ইন্দ্রলোক স্টুডিও কাশীপুর অ্যাটলাস জুট প্রেসে দু'টি অস্থায়ী স্পেশাল রিসিভিং সেন্টার তৈরি করা হয়। এই অস্থায়ী আবাসগুলিতে প্রায় ৬-৭ হাজার মানুষের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়কালেও সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থায়ী আবাস ও রিসিভিং সেন্টার তৈরি করে শহরের ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বন্দী করেছিল।[৭১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে রিসিভিং সেন্টার সহ মোট আবাসের সংখ্যা দশটি, কলকাতা ও কলকাতা শহরাঞ্চলের পাশ্ববর্তী অঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আবাসগুলি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর রাজ্যে ভবঘুরে আবাস ও বিভিন্ন প্রকল্প দ্বারা ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করেছেন।

৬.৫. ভবঘুরে আবাসের বিবরণ ও গঠন:

১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই কলকাতায় বেসরকারি উদ্যোগে ভবঘুরেদের জন্য প্রথম 'রিফিউজি' নামে একটি নোটিফায়েড আবাস তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে আবাস তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশেষত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভবঘুরে আবাস তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ে কলকাতা ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ভবঘুরে আবাস গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোট দশটি আবাস গড়ে তোলা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাসগুলির সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে আসে।

কলকাতা শহরের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাসনগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা নেই। কারণ ভবঘুরে আবাসগুলির ভেতর যারা থাকেন, তাদেরকে 'পাগল' হিসাবে অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে এই সকল আবাসগুলি সাধারণ মানুষের কাছে 'পাগলা গারদ' বলেও উল্লেখ করে থাকেন। এছাড়া ভবঘুরে আবাসনগুলিতে যাদের রাখা হয় তাদের মধ্যে কোনো জাতিগত ভেদাভেদ নেই, কারণ আবাসগুলিতে বিভিন্ন জাতির মানুষকে একসঙ্গে রাখা হত। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন কার্যকর করার দরুণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানকল্পে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভবঘুরে আবাস গড়ে তোলা হয়।

সারণি - ৬.৪: ভবঘুরে আবাস এর প্রশাসক ও কর্মী সংখ্যার গঠনমূলক কাঠামো

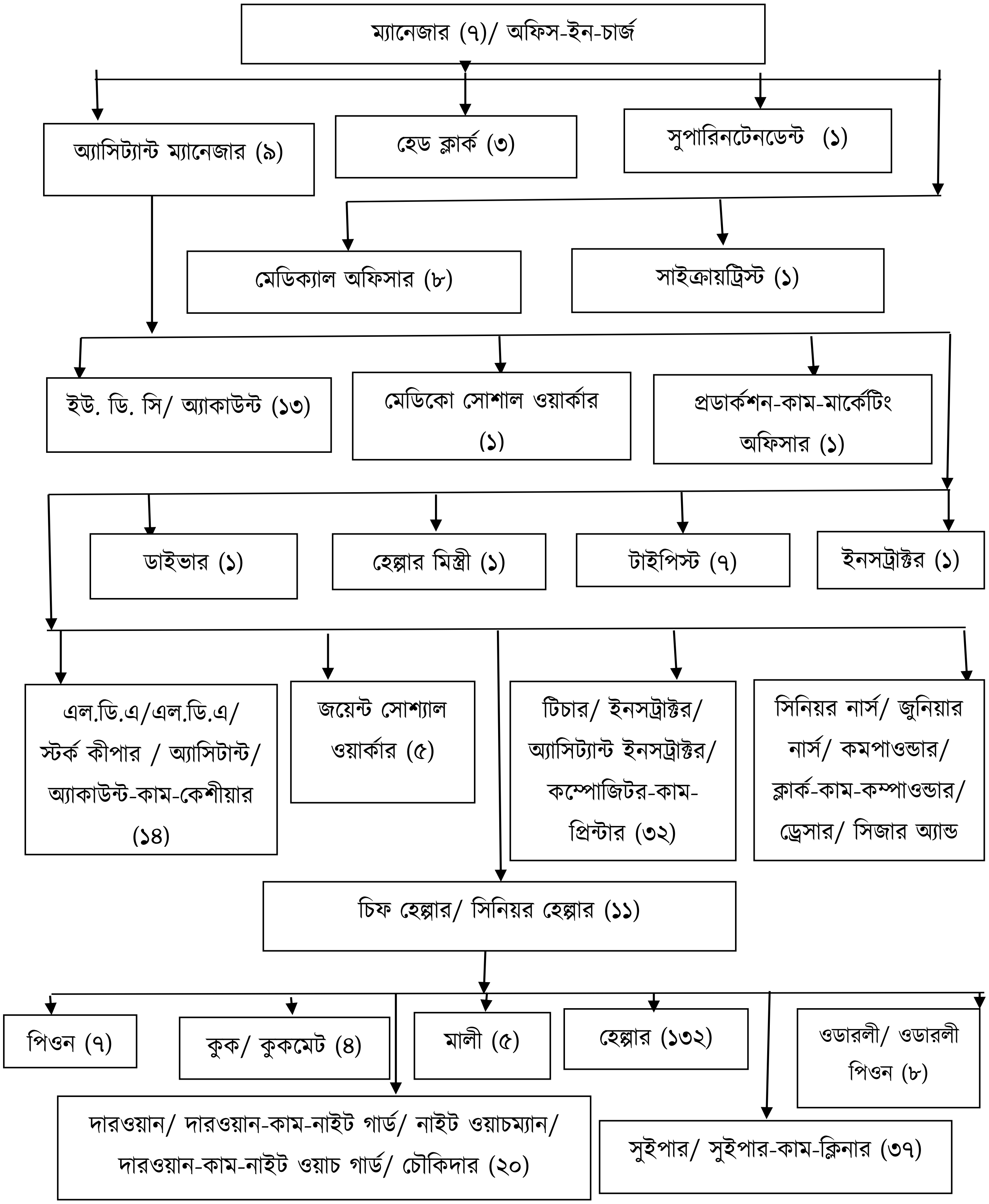

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিন উৎস। http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২৯.১০.২০১৯।

ভবঘুরে আবাস গুলির কার্যপ্রণালী পরিচালনের জন্য বিভিন্ন পদমর্যাদায় একটি প্রশাসনিক কাঠামো বা কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। সারণি-৬.৪-এর দ্বারা ভবঘুরে আবাসের কার্যপ্রণালী পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো, কর্মী ও প্রশিক্ষক কর্মীদের পদমর্যাদার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। ভবঘুরে আবাসের প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মীদের সাহায্যে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের দৈনন্দিন বিষয়গুলি দেখাশোনা করা ও আবাসগুলিতে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বিভিন্নরকমের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে এবং ভবঘুরে আবাসগুলিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৬.৫.১. অঞ্চলভিত্তিক ভবঘুরে আবাসের সংখ্যা:

পশ্চিমবঙ্গে ভবঘুরে আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারি ভবঘুরে আবাসের সংখ্যা দশটি।[৭২] এগুলি হল, (ক) রিসিভিং সেন্টার, ঢাকুরিয়া, (খ) নিউ ভ্যাগরান্ট হোম, ঢাকুরিয়া, (গ) লেপ্রসি ভ্যাগরান্ট হোম, বেলেঘাটা, (ঘ) ক্যাজুয়াল ভ্যাগরান্ট হোম, আন্দুল, (ঙ) ফিমেল ভ্যাগরান্ট হোম, উত্তরপাড়া, (চ) স্পেশাল ভ্যাগরান্ট হোম, মেদিনীপুর, (ছ) ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার, মেদিনীপুর, (জ) মেল ভ্যাগরান্ট, পেট্রাপোল, বনগাঁও, (ঝ) হোম ফর লুনাটিক ভ্যাগরান্ট, মহালন্দীকলোনী, মুর্শিদাবাদ, (ঞ) হোম ফর লুনাটিক ভ্যাগরান্ট, হাজারীপুর, মুর্শিদাবাদ। এই সকল সরকারি ভবঘুরে আবাস ছাড়াও শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাস, বৃদ্ধাশ্রম ও রাত্রি নিবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারণি-৬.৫-এ ভবঘুরে আবাসগুলিতে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের জন্য সরকার অনুমোদিত মোট সদস্য সংখ্যা, আবাস গুলির প্রকৃত ধারণ ক্ষমতা ও বর্তমানে সময়ে আবাস গুলির আবাসিক সংখ্যার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি - ৬.৫: ভবঘুরে আবাস ও আবাসিকদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	আবাসনের নাম ও ঠিকানা	অনুমোদিত আবাসিক সংখ্যা	প্রকৃত ধারণ সংখ্যা	বর্তমান আবাসিক সংখ্যা
১	রিসিভিং সেন্টার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা	১০০	৫০	৬১
২	নিউ ভ্যাগারান্টস হোম, ঢাকুরিয়া, কলকাতা	৩০০	১০০	১২২
৩	লেপ্রসি ভ্যাগারান্টস হোম, বেলেঘাটা, কলকাতা	২০০	২০০	৫৭
৪	ক্যাজুয়াল ভ্যাগারাণ্টস হোম, আন্দুল, হাওড়া	৪০০	২০০	১৬০
৫	ফিমেল ভ্যাগারান্ট হোম, উত্তরপাড়া, হুগলি	৫০০	৩০০	২৭৩
৬	স্পেশাল ভ্যাগারান্টস হোম, মেদিনীপুর	৪০০	২৫০	১৬৩
৭	ট্রেনিং কাম প্রোডাকসন সেন্টার, মেদিনীপুর	২৫	২৫	১৩
৮	মেল ভ্যাগারান্টস, পেট্রাপোল, বনগাঁও, উত্তর ২৪ পরগণা	২৫০	২০০	১৩৭
৯	হোম ফর লুনাটিক ভ্যাগারান্টস, মহালন্দীকলোনী, মুর্শিদাবাদ	১০০	১০০	৭৫
১০	হোম ফর লুনাটিক ভ্যাগারান্টস, হাজারীপুর, মুর্শিদাবাদ	১০০	৬০	৪৩
১১	মোট	২৩৭৫	১৫০০	১১০৪

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিন উৎস।
http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ১২.১১.২০১৯।

ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তর ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানকল্পে ভবঘুরে আবাস তৈরি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভবঘুরে আইন কার্যকর হওয়ার প্রায় ৭৫ বছর পরেও মাত্র ১০ টি আবাসে সরকার অনুমোদিত ২,৩৭৫ ভিক্ষুক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে আবাসগুলিতে যে সংখ্যক ভিক্ষুক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাস্তবে সেগুলিতে সর্বমোট ১,৫০০ জন ভিক্ষুক রাখার পরিকাঠামো লক্ষ করা যায়। ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবার কথা ঘোষণা করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে চিত্রটি অন্যরূপ। কারণ, আবাসগুলিতে বর্তমানে প্রায় ১,৫০০ জন ভিক্ষুকের পরিকাঠামো থাকলেও, ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ১,১০৪ জন ভিক্ষুক ও ভবঘুরে রয়েছেন।[৭৩] ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষুকের সংখ্যা ৮১,০০০ হাজার,[৭৪] সেখানে ভবঘুরে আবাসগুলিতে মাত্র ২,৩৭৫ জন ভিক্ষুক রাখার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

৬.৫.২. ভবঘুরে আবাসে উপলব্ধ পরিষেবা:

বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন অনুসারে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের আবাসে রাখার জন্য বেশ কিছু পরিষেবা প্রদানের উল্লেখ করা হয়েছে। ভবঘুরে আবাসে অবস্থিত আবাসিকদের যে সকল পরিষেবা প্রদান করা হয়[৭৫], সেগুলি হল, - (ক) ভবঘুরে আবাসের আবাসিকদের প্রতি মাসে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের বাবদ আবাসিকদের জন্য মাথা পিছু ১২৫০ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। (খ) ভবঘুরে আবাসে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিমূলক প্রকল্প দ্বারা আবাসিকদের স্ব-নির্ভর করে তোলা। (গ) আবাসিকদের স্বাক্ষরতার জন্য শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলা। (ঘ) আবাসিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা। (ঙ) আবাসিকদের বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যের সঙ্গে যুক্ত করা ইত্যাদি পরিষেবা গুলিকে ভবঘুরে আসাবে অবস্থিত আবাসিকদের প্রদান করা হয়ে থাকে।

ভবঘুরে আবাসগুলিতে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রকল্প ঘোষণা করা হয়, ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানকল্পে। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ কল্পে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প প্রয়োগ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বিভিন্ন ভবঘুরে আবাসে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভারত সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুসারে ১৯৯৪-৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু প্রকল্প চালু করা হয়।

৬.৫.৩. ভবঘুরে আবাসের প্রশিক্ষণ প্রণালী:

ভবঘুরে আবাসগুলিতে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা তাদের স্বনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবঘুরে আইনে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি স্বাধীনতার প্রায় ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। কারণ ভবঘুরে আবাসগুলির মধ্যে চারটি আবাসে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৭৬] ভবঘুরে আবাসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি হল, - (ক) ক্যাজুয়াল ভ্যাগরান্ট হোম, আন্দুল, (খ) ফিমেল ভ্যাগরান্টস হোম, উত্তরপাড়া, (গ) নিউ ভ্যাগরান্ট হোম, ঢাকুরিয়া, (ঘ) ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার, তাঁতিগেড়িয়া, মেদিনীপুর। এই সকল আবাসগুলিতে প্রশিক্ষণ দ্বারা ভিক্ষুকদের স্ব-নিভর করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবঘুরে আবাসে যে সকল বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার মধ্যে ক্যাজুয়াল ভ্যাগরান্ট হোম, আন্দুল-এ বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া এই আবাসটিতে ভিক্ষুকের সংখ্যা অন্যান্য আবাসের তুলনায় বেশী হওয়ায়। সারণি-৬.৬-এ এই আবাসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রকল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি - ৬.৬: ক্যাজুয়াল ভ্যাগরান্টস হোম, আন্দুল-এর প্রশিক্ষণ প্রণালী, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়

ক্রমিক নং	বিভাগ	ইন্সট্রাকট্রর	সহ- ইন্সট্রাকট্রর	আবাসিক	সুস্থ আবাসিক	উৎপাদিত দ্রব্য
১	কয়্যার বুনন	শূন্যপদ	১	৬৫	৫	পাপোশ
২	তাঁত	১	১	২২	৫	শাড়ি, গামছা ইত্যাদি
৩	পটারি ও ক্লে মডেলিং	শূন্যপদ	২জন অনারারি ও ২জন হেল্পার	১০	৩	টেরাকোটা দ্রব্য
৪	সেলাই	১	শূন্যপদ	৬	১	শার্ট, হাফ প্যান্ট
৫	ব্ল্যাকস্মিথ	১	শূন্যপদ	৬	০	বালতি, ড্রাম, হাতা ইত্যাদি
৬	কাঠের কাজ	১	শূন্যপদ	শূন্যপদ	শূন্যপদ	টুল, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি
৭	ছাপাখানা ও বই বাঁধাই	১	শূন্যপদ	১৫		সরকারি কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিন উৎস। http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২১.১১.২০১৯।

ক্যাজুয়াল ভ্যাগরান্ট হোম, আন্দুল-এর আবাসটিতে মোট আবাসিকের সংখ্যা ১৬০ জন, এদের মধ্যে ১২০ জন এই বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। সারণি-৬.৬-এ উল্লিখিত প্রকল্পগুলির প্রশিক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া এই কাজের বিনিময়ে তাদের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। আবাসের এই প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পূর্ণ হলে তাদের মধ্যে কিছু জনকে মুক্তি প্রদান করা হয়, যাতে তারা স্ব-নির্ভরভাবে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে জীবনধারণ করতে পারে ও ভিক্ষাবৃত্তি সঙ্গে যাতে যুক্ত না হয়।

উত্তরপাড়া ফিমেল ভ্যাগরান্টস হোম এ মহিলা ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আবাসটিতে মহিলাদের দুই প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সারণি-৬.৭-এ প্রশিক্ষণ প্রণালী, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে। উত্তরপাড়া আবাসে মোট ২৭৩ জন ভিক্ষুক ও ভবঘুরের মধ্যে মাত্র ৭০ জন এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই আবাসে প্রধানত সেলাই ও তাঁতের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সারণি - ৬.৭: ফিমেল ভ্যাগরান্টস হোম, উত্তরপাড়া

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	ইন্সট্রাকট্রর	সহ-ইন্সট্রাকট্রর	আবাসিক	সুস্থ আবাসিক	উৎপাদিত দ্রব্য
১	সেলাই	১	-	১০	৫	ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি
২	তাঁত	১	-	৫	২	কাপড়

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিন উৎস। http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২১.১১.২০১৯।

ঢাকুরিয়ার নিউ ভ্যাগরান্ট আবাসটি প্রথম পর্যায়ে স্পেশাল ভ্যাগরান্ট হোম ও পরবর্তীকালে রিসিভিং সেন্টার হিসারে গড়ে তোলা হয়। এই আবাসটিতে প্রতি সপ্তাহে চার দিন ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য আদালত বসত। ১৯৬২ সালে নিউ ভ্যাগরান্ট হোম, ঢাকুরিয়ার স্পেশাল ভ্যাগরান্ট হোমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই আবাসে প্রথমত কোনো প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে এই আবাসটিতে ট্রেলারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। নিউ ভ্যাগরান্ট হোমে বর্তমানে ১০০ জনের পরিকাঠামো থাকলেও আবাসটিতে ১২৬ জন ভিক্ষুক রয়েছেন। ফলে আবাসের আবাসিকদের উপযুক্ত পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে আবাসটিতে ৫০ জন আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। সারণি-৬.৮-এ আবাসটির প্রশিক্ষণ প্রণালীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি - ৬.৮: নিউ ভ্যাগরান্ট হোমে প্রশিক্ষণের পরিসংখ্যান, ঢাকুরিয়া

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	ইন্সট্রাকট্রর	সহ-ইন্সট্রাকট্রর	আবাসিক	সুস্থ আবাসিক	উৎপাদিত দ্রব্য
১	ট্রেলারিং	-	৩	৫০	২০	এমব্রয়ডারী, চটের আসন, ব্যাগ ইত্যাদি

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিক উৎস।
http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২১.১১.২০১৯।

ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার, মেদিনীপুর, তাঁতিগেড়িয়া আবাসটি রিফিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটিশন দপ্তরের তৈরি হয়। ১৯৬২ সালে ভবঘুরে দপ্তর ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টারটি কার্যভার গ্রহণ করেন। এই আবাসটিতে ২৫ জন ভিক্ষুক রাখার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলেও আবাসটিতে বর্তমানে ১৫ জন আবাসিক রয়েছেন। সারণি-৬.৯-এ ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টারের ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ প্রণালীর কার্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই আবাসনে বর্তমানে তিন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মাত্র ছয় জনকে।

সারণি - ৬.৯: ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার, তাঁতিগেড়িয়া, মেদিনীপুর

ক্রমিক নং	বিভাগ	ইন্সট্রাকট্রর	সহ-ইন্সট্রাকট্রর	আবাসিক	সুস্থ আবাসিক	উৎপাদিত দ্রব্য
১	শিট	-	২	২	২	বালতি, ড্রাম, ট্রে ইত্যাদি
২	ব্ল্যাক স্মিদি	-	১	২	-	তাওয়া, ডালের কাঁটা ইত্যাদি
৩	কাঠের কাজ	-	২	২	২	টুল, চেয়ার ইত্যাদি

সূত্র: নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদ্যুতিক উৎস।
http://www.wbcdwdsw.gov.in, দেখার তারিখ, ২১.১১.২০১৯।

৬.৫.৪. শহরাঞ্চলের আশ্রয়হীনদের জন্য রাত্রি নিবাস:

ভবঘুরে আবাসগুলির পাশাপাশি শহরাঞ্চলে আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য রাত্রি নিবাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভারতের মহামান্য ন্যায়াধীলয় (সুপ্রিম কোর্ট) সকল রাজ্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, শহরাঞ্চলগুলির আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য রাত্রি নিবাসে পরিকল্পনা গ্রহণ করার। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রেনেয়াল মিশনের (জেইউ-এন.ইউ.আর.এম) অধীনে ৫ লাখ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরাঞ্চলগুলিতে ১ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে অনন্ত ১০০ জন ব্যক্তির জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পটির মধ্যে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে, যেমন - প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, পানীয় জল এবং রাত্রি নিবাসের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধাগুলি।[৭৭]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১১ সালের ১৬ই অগাস্ট দরিদ্র, মহিলা, পথ শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে শহরাঞ্চলের রাত্রি নিবাসের প্রকল্পটির পরিকল্পনা করে।[৭৮] এছাড়া এই সকল রাত্রি নিবাসের গৃহগুলিকে একাধিক কার্যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়। এই সুবিধার্থে সরকার উপযুক্ত স্থান হিসেবে পার্শ্ববর্তী রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ব্যস্ত বাজার, পর্যটন কেন্দ্র এবং ধর্মীয় ক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে এবং সেগুলিকে দাতব্য ক্ষেত্র হিসাবে জমির আংশিক ব্যবহারের শর্তে দরিদ্র, ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং অন্যান্য গৃহহীনদের রাত্রি নিবাসের সুবিধার্থে থাকার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সরকারি ও সমাজসেবা সংগঠন গুলিকে অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬.৫.৫. বয়ঃবৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থাপনা:

সাম্প্রতিক সময়কালে সামাজিক অবনমনের কারণে বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাশোনা করার বিষয়টি ক্রমশ উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের পরিবারগুলিতে বৃদ্ধ বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য বৃদ্ধ সদস্যদের প্রতি উপেক্ষা করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হিসেবে

দেখা দিয়েছে। অনেক সময় সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসাহেতু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চুপ করে থাকেন। ফলে সমস্যা এতটাই জটিল আকার ধারণ করে যে, অনেক সময় তাঁদেরকে নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। এমনকি তাঁরা শারীরিক নিগ্রহেরও শিকার হয়ে থাকেন। শহুরে মধ্যবিত্তরা চাইছেন, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে সংসার অতিবাহিত করতে। বাবা-মার স্থান হচ্ছে নিতান্তই একাকিত্বের গহ্বরে, নয়তো বৃদ্ধাশ্রমে। যাঁদের অর্থ রয়েছে, তাঁরা হয়তো অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধাশ্রমের সুযোগ পাচ্ছেন, কিন্তু অনেকেই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।[৭৯] এই অসহায় মানুষদের অবস্থার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইনি ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয়। প্রসঙ্গত, বেঙ্গল কন্ট্রোলার অফ ভ্যাগরান্সি আইনের ৭(২) নং ধারার সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বয়ঃবৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভালের জন্য কন্ট্রোলার অফ ভ্যাগরান্সি কলকাতার ২৪ টি থানা এলাকায় এই আইনের ১৮(১) নং ধারা অনুযায়ী কাজ করে।[৮০] যার অধীনে বয়ঃবৃদ্ধদের উপরোক্ত সমস্যাগুলির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৬.৬. শিশু ও কিশোর ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ প্রকল্প:

ভবঘুরে আইন অনুসারে ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার পাশাপাশি শিশু ও কিশোর ভিক্ষুক ও ভবঘুরেবৃত্তি প্রতিরোধ করার জন্য ‘ইরাডিকেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ জুভেনাইল বেগারী অ্যান্ড ভ্যাগরান্সি’ (Eradication and Control of Juvenile Beggary and Vagrancy) প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি ১৯৬৬ সালে তৈরি করা হয়েছিল।[৮১] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘রিলিফ অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার’ দপ্তরের সহকারী সম্পাদক ১৯৬৬ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী এক আদেশনামায় উল্লেখ করেন, - “The Governor has been pleased to approve of the scheme for Eradication and Control of the Juvenile Beggary and Vagrancy in Calcutta on

the basis of the model prepared by the Government of India."[৮২] এই প্রকল্পটি ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে ও 'চীফ অর্গানাইজার' নামে একটি পদ তৈরি করে তাঁর ওপর এই প্রকল্পটির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটিকে কলকাতা সহ, হাওড়া ও হুগলীর মধ্যে মোট ছয়টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। রাজাবাজার, বেহালা, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, আন্দুল সাময়িক ভবঘুরে আবাস, উত্তরপাড়া মহিলা আবাস ও ঢাকুরিয়া নব ভবঘুরে আবাসে শিশু ও কিশোরদের জন্য ইউনিটের সূচনা করা হয়। এই প্রকল্পের সাহায্যে শিশু ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ কল্পে শিক্ষা, সচেতনতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পটির দ্বারা ৮ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ৩০০ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শিশু ভিক্ষুক ও ভবঘুরে প্রতিরোধ কল্পে এই প্রকল্পটি দ্বারা যে সকল পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে, সেগুলি হল - (ক) ভিক্ষুক ও ভবঘুরে শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সচেতনতা ও কাউন্সেলিং করা। (খ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, যেমন - 'বই বাঁধাই', 'কাঠের কাজ', 'সেলাই' ও 'চামড়ার কাজ' ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। (গ) 'নন-ফর্মাল এডুকেশন প্রদানের ব্যবস্থা। (ঘ) ভবঘুরে আবাসের বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া এবং বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করা।[৮৩]

৬.৬.১. শিশু ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাস :

ভবঘুরে নিয়ামক দপ্তরের অধীনে 'ইরেডিকেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ জুভেনাইল বেগারী অ্যান্ড ভ্যাগরান্সি' (Eradication and Control of Juvenile Beggary and Vagrancy) দ্বারা শিশু ভিক্ষুক ও ভবঘুরে প্রতিরোধ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ [Department of Women & Child Development and Social Welfare (DWCD&SW)] দপ্তরের অধীনে জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে

সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত মোট ২০ টি আবাস তৈরি করা হয়েছে এবং বেসরকারি আবাসের সংখ্যা ২৫ টি।[৮৪] এই আইন অনুসারে শিশু পাচার ও শিশু ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধকল্পে আবাসগুলিতে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬.৬.২. ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন প্রকল্প:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ [Department of Women & Child Development and Social Welfare (DWCD&SW)] দপ্তরের অধীনে 'ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিম' (ICPS) এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ প্রকল্প যা সরকার ও সিভিল সোসাইটির অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দুর্বল শিশুদের জন্য সুরক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করা। ১৯৭৫ সালের ২ রা অক্টোবর 'ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিম' (আই.সি.পি.এস) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা (খিদিরপুর) ও পুরুলিয়া (মানবাজার) অঞ্চলে গড়ে তোলা হয়।[৮৫] বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৭৬ টি আই.সি.পি.এস প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে গ্রামীণ অঞ্চলে ৪২৩ টি, শহরাঞ্চলে ৭৫ টি ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ৭৮ টি। এটি বর্তমানে রাজ্য সরকার অধীনস্থ একটি প্রকল্প। আই.সি.পি.এস প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল, - (ক) ০-৬ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা। (খ) শিশুদের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করা। (গ) প্রকল্পটির সাহায্যে শিশু মৃত্যুহার, অসুস্থতা, অপষ্টি এবং স্কুল ছাড়ার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে হ্রাস করা। (ঘ) শিশু বিকাশের প্রাচারের নীতি ও বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন। (ঙ) শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা, পরিষেবা, পরিকল্পনা এবং কাঠামো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। (চ) শিশু সুরক্ষা পরিষেবা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে শিশু ট্র্যাকিং সিস্টেমসহ শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ করা।[৮৬]

রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসন, শিশু অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, শিশু সুরক্ষা পরিষেবাগুলির উন্নত কাঠামোর ইত্যাদি বিষয়কে ‘শিশু ন্যায়বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০’ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। শিশুদের সুরক্ষা পরিষেবাগুলির উন্নয়নের জন্য বর্ধিত শিশু সুরক্ষায় বিনিয়োগ এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে সমস্ত শিশুদের সুরক্ষিত করার অধিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ‘ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিম’ (ICPS) কার্যকরীভাবে শিশুদের সুরক্ষার জন্য ‘শিশু অধিকার রক্ষা’ এবং ‘শিশুদের সর্বোত্তম আগ্রহে’র ভিত্তিতে এই প্রকল্পের দ্বারা শিশুদের সুস্থতা ও দুর্বলতা হ্রাসে যথাযথ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৬.৩. শিশু দত্তক গ্রহণের বিবরণ ও গঠন প্রণালী:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ [Department of Women & Child Development and Social Welfare (DWCD&SW)] দপ্তরের অধীনে শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিষয়টি যুক্ত রয়েছে। ভারতে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি বর্তমান সময়ের নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিষয়টির ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে কেবলমাত্র। পূর্বে কোনো পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ না করলে নিকটস্থ আত্মীয়ের থেকে পুত্র সন্তান দত্তক নেওয়া হত। ভারতের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, পরিবার ও শিশু সুরক্ষা দপ্তর ভবঘুরে ও পরিত্যক্ত শিশুকে দত্তক গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গড়ে তুলেছে। সরকারে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণের ফলে বর্তমান সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, একইভাবে বিদেশী নাগরিক সমাজেও এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দত্তক গ্রহণের বিষয়টি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংগঠন ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ভারতের বিভিন্ন সমাজকল্যাণ দপ্তর, জাতীয় এবং আঞ্চলিক উভয় স্তরেই পরিবারহীন ও অনাথ শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিষয়টি সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচার করছে। এই সংগঠনগুলি

মূলত দু'টি ভাগে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন, - (ক) প্রথম পর্যায়ে এই সংগঠনগুলি জনমত গঠনের দ্বারা দত্তক গ্রহণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেমন - আইন ও শিশুদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলি। (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলি শিশুদের সঙ্গে দত্তক গ্রহণের আগ্রহী পরিবার গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন।[৮৭] এক্ষেত্রে জাতীয় সংস্থা বা সংগঠন হিসাবে প্রথম পর্যায়ে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার [Indian Council of Child Welfare (ICCW)], অল ইন্ডিয়া ওমেন'স কনফারেন্স [All India Women's Conference (AIWC)], ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার [Indian Council of Social Welfare (ICSW)] এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রমোশন অফ অ্যাডপশন [Indian Association for Promotion of Adoption (IAPA)] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।[৮৮] এই সংগঠনগুলির প্রথমত সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রকাশনা, রেডিও এবং টেলিভিশন মাধ্যমে দত্তক গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুলিকে আলোচনার সাহায্যে প্রচার করতে শুরু করেন।

ভারতে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি প্রথম পর্যায়ে যথাযথ আইন দ্বারা পরিচালিত হত না। বিশেষত, বিদেশীদের (Foreigners) দ্বারা দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে কিছু সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা বা সংগঠন বিদেশী মিশনারি এবং সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তঃদেশীয় দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও আইনি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৯৫৭ সালে জেনেভাতে, ১৯৬০ সালে লেইসিনে এবং ১৯৭১ সালে মিলান-এ অনুষ্ঠিত হয়।[৮৯] ফলে জাতীয় দত্তক গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত নীতি ও পদ্ধতি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথাযথ

পদ্ধতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত আইনি কর্মী এবং সামাজিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ দত্তক গ্রহণের যথাযথ আইন না থাকায় বিদেশী ও অ-হিন্দুদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে ১৮৯০ সালের 'অভিভাবক ও ওয়ার্ডস অ্যাক্টে'র অধীনে দত্তক গ্রহণ করতে পারতেন। বিদেশীদের ক্ষেত্রে ছয় মাস থেকে দু'বছর সময়কালে মধ্যে সেই দেশের আইন অনুসারে শিশুকে দত্তক গ্রহণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিশুর অভিভাবকত্বের অধিকার অর্জন করতে পারে।

ভারতে শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিলটি ১৯৫৫ সালে পার্লামেন্টে (রাজ্যসভা) সদস্যদের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়। ১৯৬৫ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' ভারতের অন্যান্য সমাজকল্যান মূলক সংস্থার বা সংগঠনগুলির সহযোগিতায় শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিলটির খসড়া তৈরি করে। ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে বিলটি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালে পুনরায় রাজ্যসভায় শিশু দত্তক গ্রহণের বিলটি উপস্থাপিত হলেও, ১৯৭৮ সালের ১৯ শে জুলাই বিলটি সংসদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়।[৯০] শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিলটি একটি যৌথ কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু এই কমিটির বেশিরভাগ সদস্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী, ও বিলটি তাদের নিজ আইনের আওতাভুক্ত হওয়ার কারণে সংসদে তৎকালীন বিরোধী পক্ষ এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেছিল। যদিও ১৯৮০ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর লোকসভায় (Lok Sabha) দত্তক গ্রহণের বিলটি নতুন নামে কার্যকর করা হয়, যা 'অ্যাডপশন বিল, ১৯৮০' নামে পরিচিত।[৯১] ১৯৮০ সালে দত্তক গ্রহণের বিলটি লোকসভায় পাশ হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই বিলটি আইনে পরিণত হলে তা কার্যকর করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি [Central Adoption Resource Authority (CARA)] পূর্বে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ছিল, বর্তমানে জুভেনাইল জ্যাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ২০১৫ (২০১৬ সালের অ্যাক্ট নং-২) এর ৬৮ ধারা, যা ১৫ ই জানুয়ারী, ২০১৬ সালে ভারত সরকারের সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে পরিণত হয়েছে।[৯২] এটি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের [Ministry of Women and Child Development (MWCD)], তত্ত্বাবধানে জাতীয় পর্যায়ে ভারতীয় শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিষয়টি প্রচার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংযোগ মাধ্যম সংস্থা হিসাবে কাজ করে। পূর্বে CARA ভারতের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে ‘হেগ কনভেনশনে’র আওতায় আন্তঃদেশীয় দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু সংরক্ষণ ও সহযোগিতা বিষয়ক দেশ ও বিদেশে দত্তক গ্রহণের প্রচার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা ও আন্তঃদেশীয় দত্তক নিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি কার্যকলাপগুলি পরিচালনা করত। বর্তমানে ‘জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ২০১৫’-এর ৬৮ ধারা অনুসারে, CARA নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেগুলি হল - (ক) রাজ্যের বিভিন্ন দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে দেশ ও বিদেশে দত্তক গ্রহণের বিষয়গুলি প্রচার করা। (খ) আন্তঃদেশীয় দত্তক গ্রহণের নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা। (গ) দত্তক গ্রহণের কাঠামোটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে বিধিবদ্ধ করা। (ঘ) আন্তঃদেশীয় দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা ও সহযোগিতার বিষয়গুলিকে হেগ কনভেনশনের আওতায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; এবং (ঙ) দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি কার্যকলাপগুলিকে যথাযথ ভাবে পালন করা।[৯৩]

‘জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ২০১৫’-এর ৬৮(সি) ধারার অধীন CARA কর্তৃক ‘দত্তক আইনে, ২০১৭’ এর কাঠামো তৈরি করা হয়, যা ২০১৭ সালের ১৬ ই জানুয়ারী প্রণয়ন করা হয়। দত্তক গ্রহণের নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে CARA এবং

অন্যান্য দত্তক গ্রহণ সংস্থাগুলি বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টির হলেও এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে আরোও সহজ লভ্য করা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের এটিকে প্রচার করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতার সঙ্গে শিশুদের নৈতিক অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে, আইনানুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দত্তক প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা। দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি হল, - (ক) দেশে অনাথ, পরিত্যক্ত এবং দরিদ্র শিশুদের দত্তক গ্রহণ। (খ) দেশের মধ্যে দত্তক গ্রহণ। (গ) সৎ পিতামাতার দ্বারা দত্তক গ্রহণ। (ঘ) বিদেশে অনাথ, পরিত্যক্ত এবং দরিদ্র শিশুদের দত্তক গ্রহণ। (ঙ) বিদেশী অভিভাবক দ্বারা দত্তক গ্রহণ।[৯৪]

একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু সুরক্ষা সমিতির অধীনে 'স্টেট অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সি' [State Adoption Resource Agency (SARA)], এককভাবে অনাথ, পরিত্যক্ত এবং দরিদ্র শিশুদের দেশ ও বিদেশে দত্তক গ্রহণের বিষয়ে CARA এর সহিত যৌথ কার্য-প্রণালী গ্রহণ করেছে।[৯৫] এই প্রক্রিয়াটি সহায়তা প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির সচিবালয় ও প্রশাসনিক আধিকারিকগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে রাজ্য রিসোর্স সেন্টার হিসাবে SARA নিম্নলিখিত কার্যকলাপগুলি সম্পাদন করে, - (ক) রাজ্যে দত্তক গ্রহণের কর্মসূচিগুলিকে সমন্বয়, উন্নয়ন ও নিরীক্ষণ করা। (খ) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় SAAs (Specialised Adoption Agencies) স্থাপন করা এবং SAAs এর সাহায্যে ভারতীয় শিশুদের দেশ ও বিদেশে দত্তক গ্রহণের জন্য আইনী স্বীকৃতি দানে সহায়তা প্রদান করা। (গ) রাজ্যে SAAs-এর একটি বিস্তৃত তালিকা বজায় রাখে। (ঘ) নথিকরণ/স্বীকৃত দত্তক সংস্থাগুলি বা অ-স্বীকৃত ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৯৬] নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে ২০১৭ সালে ১৬ ই জানুয়ারী

অ্যাডপশন রেগুলেশন দ্বারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে অনাথ, ভবঘুরে, দরিদ্র এবং পরিত্যক্ত শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিষয়টি আইনসিদ্ধ হয়।

৬.৭. পর্যবেক্ষণ:

ভিক্ষুক সমস্যাজনিত রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি পর্যালোচনা করে বলা যায়, – এই সমস্যা নিবারণে রাষ্ট্র যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রথমত আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুকদের বাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলিকে সুনিশ্চিত করেছে। একইসঙ্গে পরিচয় গোপনকারী ও ভুয়ো ভিক্ষুকদেরকে সনাক্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়ছে। মানসিক ভারসাম্যহীন ভিক্ষুকদেরকে আবাসনে পরিচর্যার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাও গৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে তাদেরকে বিকল্প কর্মের উপযোগী করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করা গেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Jogesh C. Bagal: ‘The Beggar Problem of Calcutta: How they Tried to Solve it an Ago’, *The Calcutta Municipal Gazette, XVII,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 6th December, 1941), পৃ. ১০৯।

২. S. C. Ray Choudhury: ‘Corporation Scheme for Housing the Poor’, *Calcutta Municipal Gazette, Volume IX (2),* (Calcutta, Corporation of Calcutta,1928).

৩. ‘The Calcutta Police Act, 1866’, (Bengal Act 4 of 1866).

৪. Calcutta Beggar Menacce: *A scheme prepared by the rotary club of Calcutta,* (Calcutta, Goverment House, 3rd April, 1936), পৃ.পৃ. ১-৯।

৫. Calcutta: *Report of the Mendicancy Committee, Calcutta, 1920,* (Calcutta, Government of Bengal, 16th Oct, 1920), পৃ.পৃ. ১-১৯।

৬. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৭-৮।

৭. *তদেব,* পৃ. ১৩-১৫।

৮. *তদেব,* পৃ. ১২-১৭।

৯. *তদেব,* পৃ. ১২।

১০. *তদেব,* পৃ. ১৪।

১১. Corporation of Calcutta: 'The Problem of Calcutta Beggars and Vagrants. Proceedings of The Rotary Club Conference', *Calcutta Municipal Gazette, Volume XXI (12),* (Calcutta: Corporation of Calcutta, 16TH February 1935).

Calcutta Beggar Menace: A scheme prepared by the rotary club of Calcutta, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

১২. *Calcutta Beggar Menace: A scheme prepared by the rotary club of Calcutta, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২।

১৩. *তদেব,* পৃ. ৪।

১৪. *তদেব*।

১৫. *তদেব,* পৃ. ৫।

১৬. *তদেব,* পৃ. ৬।

১৭. *তদেব,* পৃ. ৭।

১৮. Alok Majumdar: 'Vagrancy in West Bengal', *The Indian Journal of Social Work, Vol. XXII, No. 3, (December, 1961),* পৃ. ২১৯।

১৯. Bengal Legislative: *Official Report, Third Session, Bengal Legislative Council Debates,* (Calcutta, West Bengal Legislative assembly, 28th September, 1943).

২০. *তদেব*।

২১. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *The Calcutta Municipal Gazette,* (Calcutta, Corporation of Calcutta, 25th October, 1943). পৃ.পৃ. ৫৫৮-৫৬৯।

২২. *তদেব,* পৃ.

২৩. *তদেব,* পৃ.

২৪. Chambliss J. William: 'A Sociological Analysis of the Law of Vagrancy', *Social Problems, Vol. 12, No. 1, 1964,* পৃ. ৬৮।

২৫. Mitra Dipankar: *The beggars, 'an informative book on beggars', informative study on beggar*/people's participation/KUSP-W. B/2013. পৃ. ১৩।

২৬. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ৬৬২-৬৬৫।

২৭. *তদেব*, পৃ. ৫৫৯।

২৮. *তদেব*, পৃ. ৫৫৮।

২৯. *তদেব*, পৃ. ৫৬০।

৩০. *তদেব*।

৩১. *তদেব*, পৃ. ৫৬১।

৩২. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare*, (Webliography: Last accessed: 20.07.2019)

৩৩. Bengal Legislature: '*Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943*', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬২

৩৪. *তদেব*, পৃ.পৃ. ৫৬৪-৫৬৬।

৩৫. *তদেব*, পৃ.পৃ. ৩৬-৩৬৭।

৩৬. *তদেব*, পৃ. ৫৫৯।

৩৭. *তদেব*, পৃ. ৫৬১।

৩৮. আজকাল পত্রিকা, ১৪ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৩৯. Biswas Soutik: Pavement Purgatory: Ordinary Citizen Crowd Vagrant Home as a Grey Law is Implemented all to Zealously, (Calcutta, Outlook Magazine, 16th July, 1997), পৃ. ১০।

৩৯. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৩।

৪০. Bengal Legislative: *Government Session, Bengal Legislative Assembly Proceeding, Vol. LXVI, No. 1,* (Calcutta, West Bengal Legislative assembly, 15th September, 1943).

৪১. *তদেব*।

৪২. Bengal Legislative: Government Session, Bengal Legislative Assembly *Proceeding, Vol. LXVI, No. 1,* ((Calcutta, West Bengal Legislative assembly, 16th September, 1943).

৪৩. Bengal Legislative: Government Session, Bengal Legislative Assembly *Proceeding, Vol. LXVI, No. 1,* (Calcutta, West Bengal Legislative assembly, 18th September, 1943).

৪৪. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৬।

৪৫. *তদেব*।

৪৬. *তদেব*।

৪৭. পূর্নেন্দু দাস, অনিতা মুখার্জী ও আশিস মুখার্জী: ভিখারি: একটি অনুসন্ধান, (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১), পৃ. ৫২।

৪৮. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*।

৪৯. *তদেব*।

৫০. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত*।

৫১. *তদেব*।

৫২. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*।

৫৩. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত*।

৫৪. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*।

৫৫. *তদেব*।

৫৬. *তদেব*।

৫৭. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত*।

৫৮. The Gazette of India Extraordinary: *The Juvenile Justice (Care and Protection of Children), Act, 2015, No.2 Of 2016,* (New Delhi, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, The 1st January, 2016).

৫৯. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত*।

৬০. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*, পৃ.

৬১. *তদেব।*

৬২. *তদেব।*

৬৩. M. Nag: 'Beggar Problem in Calcutta and its Solution', *The Indian Journal of Social Work, Vol-16(3), 1965*, পৃ. ২৪৪।

৬৪. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত।*

৬৫. *তদেব।*

৬৬. *তদেব।*

৬৭. *তদেব।*

৬৮. *তদেব।*

৬৯. M. Nag: 'Beggar Problem in Calcutta and its Solution', *প্রাগুক্ত।*

৭০. পূর্নেন্দু দাস, অনিতা মুখার্জী ও আশিস মুখার্জী: ভিখারি: একটি অনুসন্ধান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৪।

৭১. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত।*

৭২. Government of West Bengal: *Scheme of Shelter for Urban Homeless*, Kolkata, Department of Women and Child Development and Social Welfare West Bengal, 16th August, 2011, পৃ. ১।

৭৩. *তদেব,* পৃ. ২।

৭৪. Census of India, 2011: *City of Calcutta. Part I, Volume VI* (Calcutta, Census of India, 2013).

৭৫. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত।*

৭৬. *তদেব।*

৭৭. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare West Bengal*, (Kolkata, The Kolkata Gazette, 3rd February, 2010), পৃ. ৫।

৭৮. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare, প্রাগুক্ত।*

৭৯. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare*, *প্রাগুক্ত*।

৮০. Bengal Legislature: 'Bengal Act of 1943: The Bengal Vagrancy Act, 1943', *প্রাগুক্ত*।

৮১. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare*, *প্রাগুক্ত*।

৮২. Mitra Dipankar: *The beggars, 'an informative book on beggars', informative study on beggar*/people's participation/KUSP-W. B/2013, *প্রাগুক্ত*।

৮৩. *তদেব*।

৮৪. Government of West Bengal: *Department of Women and Child Development and Social Welfare*, *প্রাগুক্ত*।

৮৫. *তদেব*।

৮৬. *তদেব*।

৮৭. *তদেব*।

৮৮. '*Central Adoption Resource Authority'*, (New Delhi, Ministry of Women & Child Development, Government of India). "CARA- Central Adoption Resource Authority," n.d. https://cara.nic.in/. [Last Accessed: 12.04.2020].

৮৯. *তদেব*।

৯০. *তদেব*।

৯১. *তদেব*।

৯২. The Gazette of India Extraordinary: *The Juvenile Justice (Care and Protection of Children), Act, 2015, No.2 Of 2016*, *প্রাগুক্ত*।

৯৩. "CARA- Central Adoption Resource Authority," *প্রাগুক্ত*।

৯৪. The Gazette of India Extraordinary: *The Juvenile Justice (Care and Protection of Children), Act, 2015, No.2 Of 2016*, *প্রাগুক্ত*।

৯৫. "State Child Protection Society," n.d. https://wbscps.in/User/contact_sara. [Last Accessed: 12.04.2020].

৯৬. *তদেব*।

স প্ত ম অ ধ্যা য়

উপসংহার

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বহুমুখী চরিত্রের ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল রাষ্ট্র ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। সেক্ষেত্রে ভারতের ভিক্ষাবৃত্তির ধারা ভারতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রাচীন কাল থেকেই। ভারতের যে চারটি মহানগর আছে তার মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। এই কলকাতা মহানগরীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানকার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় আঙ্গিকের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই নিরিখে বিচার করলে কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করলে মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় স্তরে ঐ সমস্যাগুলির যা চিত্র তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। দারিদ্র্যতা তথা ভিক্ষাবৃত্তির যে একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এই ব্যাধি যে সমগ্র সমাজের পক্ষে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক বিষয়, তা কলকাতার ভিক্ষাবৃত্তির চিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। যদিও এটাও দেখা গেছে যে, এই ব্যাধি বা সমস্যা নিরসণে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথাপি সমস্যার গভীরতা এবং ব্যাপ্তি এতই প্রবল যে সরকারের এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যে এই সমস্যাকে পুরোপুরি নিরসণ করা যায়নি।

প্রসঙ্গত, ভারতে ধর্মীয় দর্শন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ‘ভিক্ষা’ প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগের ভারতে সমস্যা আকারে চিহ্নিত না হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত সমাজব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই লক্ষনীয় যে, একান্নবর্তী পরিবারগুলির ভাঙন,

দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে 'ভিক্ষাবৃত্তি'র শ্রেণিগত ও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে।

আমাদের গবেষণায় আমরা লক্ষ করেছি যে, - ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভিক্ষুকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, যাদের মূল অবস্থান বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে কলকাতার মতো মহানগরে। কলকাতা ও কলকাতাসংলগ্ন শহরতলিগুলির বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ইত্যাদি), পরিবহনের কেন্দ্রস্থল (রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ফেরিঘাট, ইত্যাদি), বাজার, জনবহুল এলাকা, বড় রাস্তার মোড়, ও ফুটপাতগুলি ভিক্ষুক শ্রেণির জীবন-জীবিকার উৎসস্থলে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে, বিশেষত বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে কলকাতার সমাজচিত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩-১৯৪৪), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ (১৯৪৭), খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯), ভারত-চিন যুদ্ধ (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫), বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯৭১), উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৭১), অপারেশন বর্গা (১৯৭৭) ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষাপটে সমাজের দরিদ্র মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করত। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি হয়ে ওঠে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবিকার অন্যতম বিকল্প পন্থা। এছাড়া এইপর্ব থেকেই কলকাতাতে ভিক্ষুক শ্রেণির অভূতপূর্ব বিকাশ হতে থাকে মূলত আর্থ-সামাজিক সংকটের কারণে। সেই ধারাবাহিকতা আজও বর্তমান।

বর্তমান গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণিরও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনকালে ভিক্ষাবৃত্তি ছিল ধার্মিক ব্যক্তির জীবিকার মূল অবলম্বন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় প্রান্তিক মানুষেরা বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে

গ্রহণ করছেন। একই সঙ্গে অনেকে আবার পরিচয় পত্র গোপন করে ভুয়ো ভিক্ষুকরূপে সমাজে নিজেদের জীবিকাস্বরূপ ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করছেন। আমাদের আলোচনায় কলকাতাতে আমরা প্রায় ১১ প্রকারের ভিক্ষুকের পরিচয় পেয়েছি। এদের মূল লক্ষ্য মূলত বেঁচে থাকার জন্য অর্থ উপার্জন করা। তবে তাদের মধ্যে আচরণগত কিছু প্রভেদও লক্ষণীয়।

ভিক্ষুক শ্রেণির চারিত্রিক ভিন্নতার কারণে তারা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য বিভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করেন। উপার্জন বৃদ্ধির জন্য কেউ দৃষ্টিহীন, শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক ভারসাম্যহীনতাকে কাজে লাগান সুকৌশলে। এই কৌশলগুলি তাদের ভিক্ষার কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।

আলোচ্য সন্দর্ভে ভিক্ষুক সমস্যার প্রতিরোধকল্পে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে উঠে এসেছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকম আইন প্রণয়নের দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তিকে 'অপরাধ' হিসাবে গণ্য করার কথা। সেই সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য অংশে। আলোচনায় আমারা দেখেছি যে, ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার কখনো কখনো পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পৌরসভার অফিসারদের নিয়ে বোর্ড গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। কখনও আবার ভিক্ষাদানকারী ও ভিক্ষাগ্রহণকারী দু'জনকেই শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এমনকি প্রকারভেদ অনুযায়ী ভিক্ষুকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা ও গরিবদের জন্য 'গরিবালয়' নির্মানের বিষয়টিও এক্ষেত্রে লক্ষনীয়। এই একই প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ সালে গৃহীত হয়েছে, যার দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ তথা ভিক্ষুক সমস্যাকে নির্বাপিত করার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। যদিও ভিক্ষুক সমস্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো জটিল রূপ পরিগ্রহ করে, যা আজও কলকাতা তথা ভারতের প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান।

ভিক্ষাবৃত্তির কারণ এবং প্রভাব প্রকৃতিগতভাবে বহুমাত্রিক। যে প্রভাবকগুলি ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তা হল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলি। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক

প্রভাবকগুলি হল আকর্ষক (Pull Factor) এবং অর্থনৈতিক প্রভাবকগুলি হল বিকর্ষক (Push Factor)। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু সেই বিকাশ সুষম নয় ফলত একটি দরিদ্র শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে যার দরিদ্রতম অংশটি (Poorer of the Poorest) হল ভিক্ষুক। ভারতে হিন্দু 'সন্ন্যাসী' ও 'সাধু', মুসলিম 'ফকির' ও 'দরবেশ' এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু 'সন্ন্যাসী'র মতো ধর্মীয় পরিচয়ের আধারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে উদাহরণ উপস্থাপন করেছে। অন্যদিকে কালক্রমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই উন্নয়ন অসম হওয়ায় গণ দারিদ্র্য, তথা ভিক্ষাবৃত্তির প্রাবল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকাংশে। এমনকি এই সমস্যাটি এমনই এক রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই এটিকে ভারতের একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। একটি জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যা যা করণীয় - যেমন, বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা, জাতীয় কর্ম সংস্থান চালু করা, জাতীয় আবাস প্রকল্প চালু করা, – তা সরকার নিরলসভাবে করে চলেছে। তাই আশা করা যেতে পারে, একবিংশ শতাব্দীতে এই দেশ তথা কলকাতা মহানগর এই করাল ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

সংযোজনী

সংযোজনী – ১: ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলকাতার ভৌগোলিক পরিসীমায় অবস্থানকারী ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান সম্পর্কিত মানচিত্র

মানচিত্র – ১.১: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুক শ্রেণির জনবিন্যাস

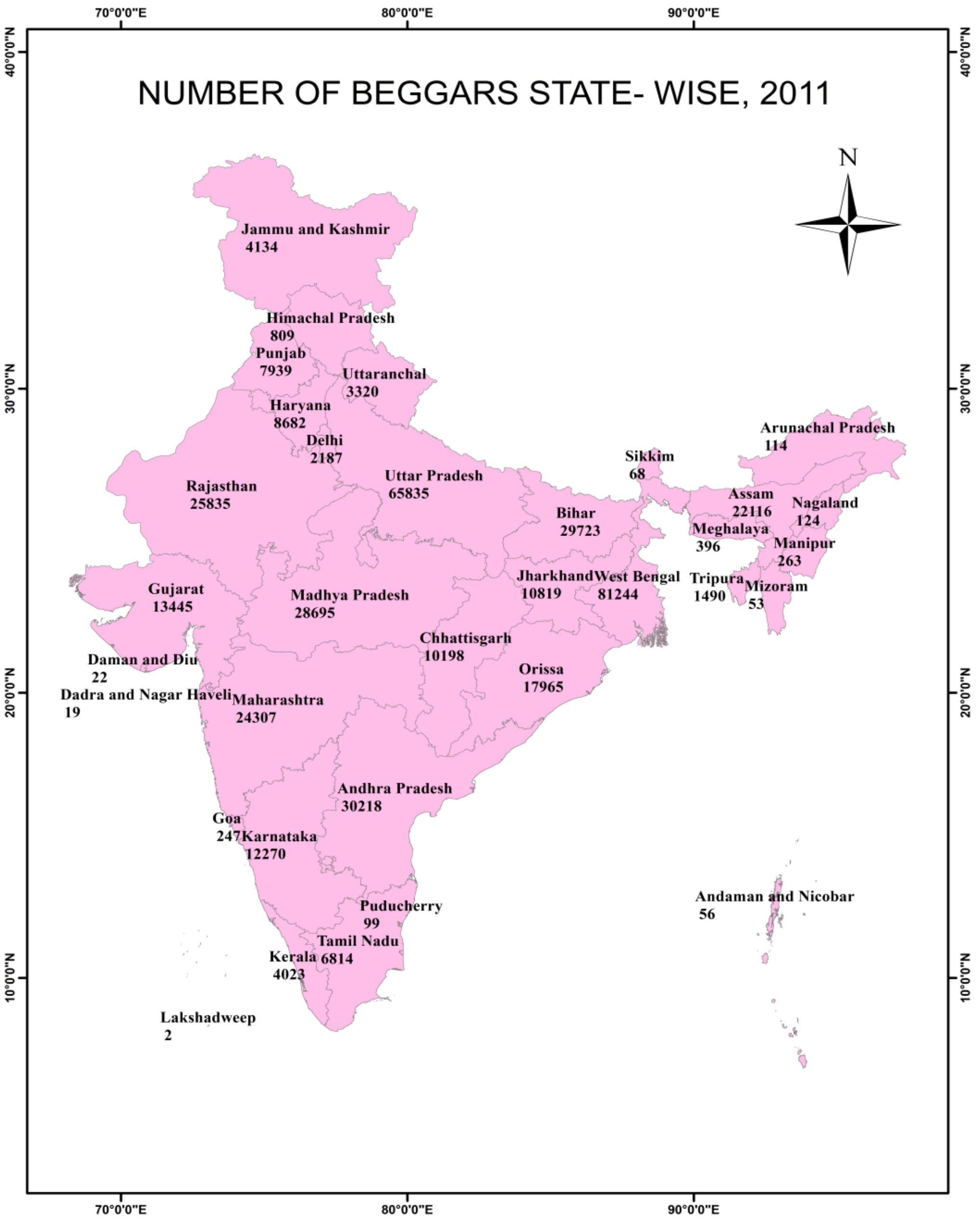

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract*, *Series-1*, *Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

মানচিত্র – ১.২: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস

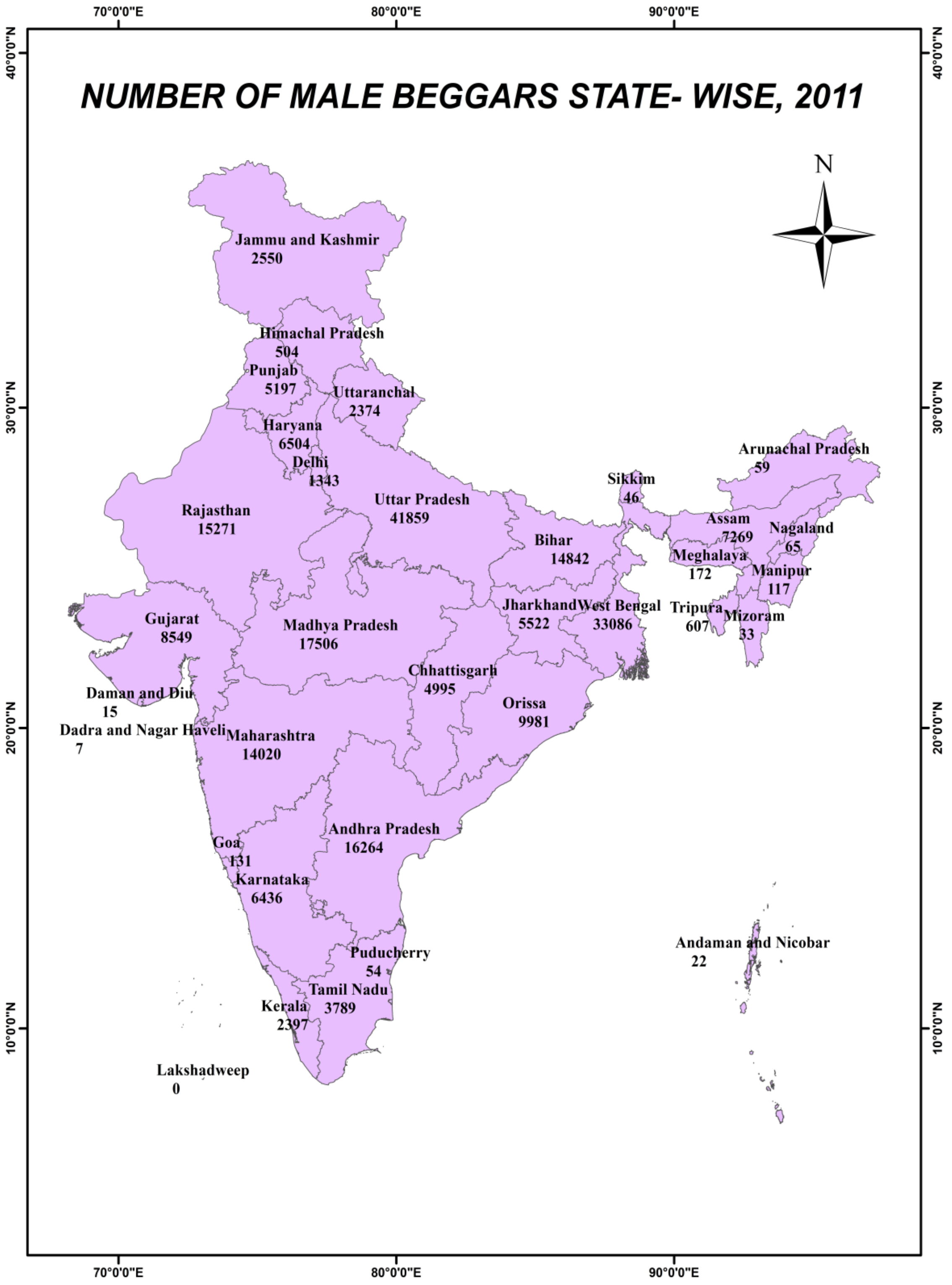

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

মানচিত্র – ১.৩: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস

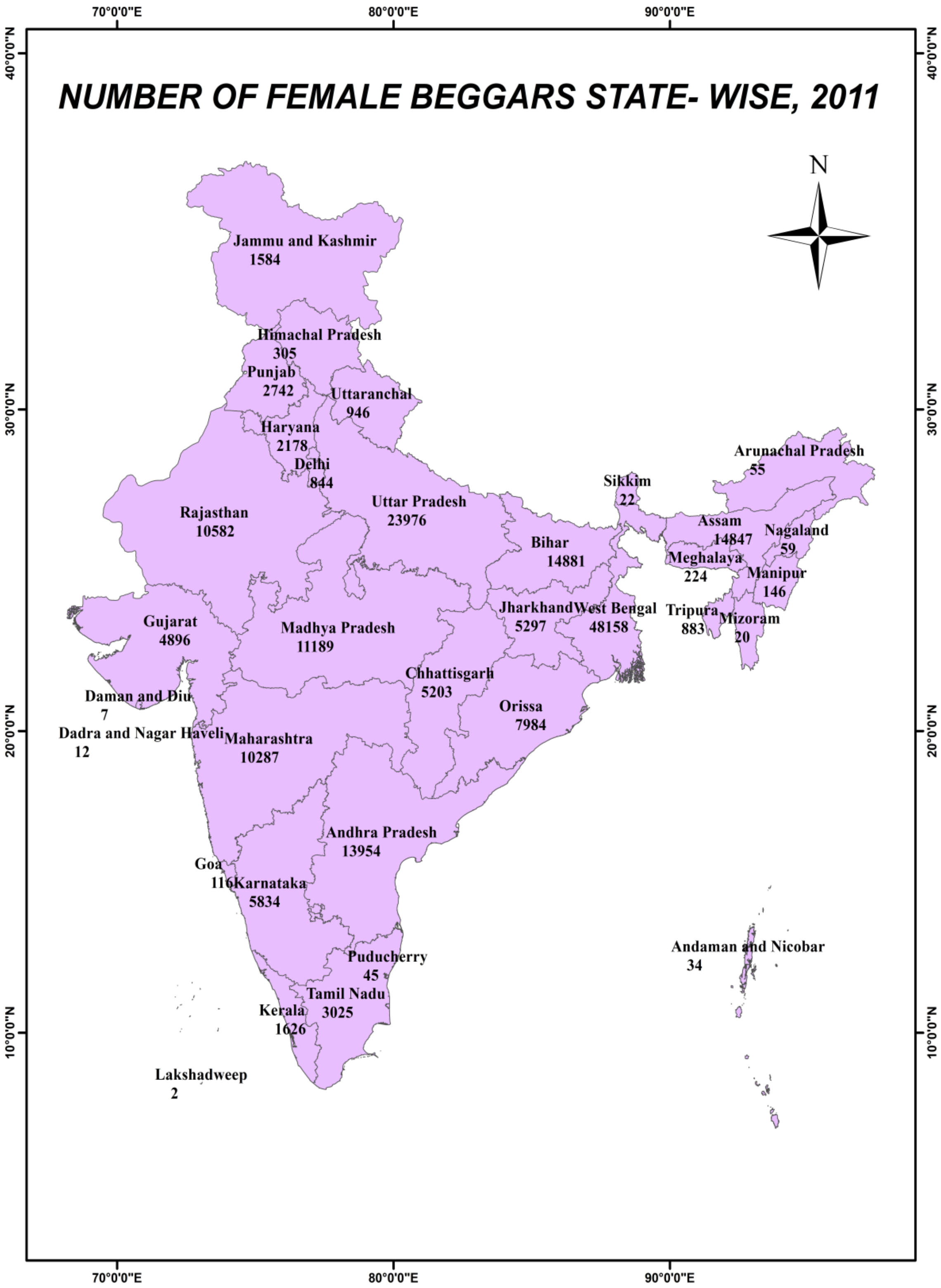

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract*, *Series-1*, *Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

মানচিত্র – ১.৪: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুকের জনবিন্যাসের তুলনামূলক মানচিত্র

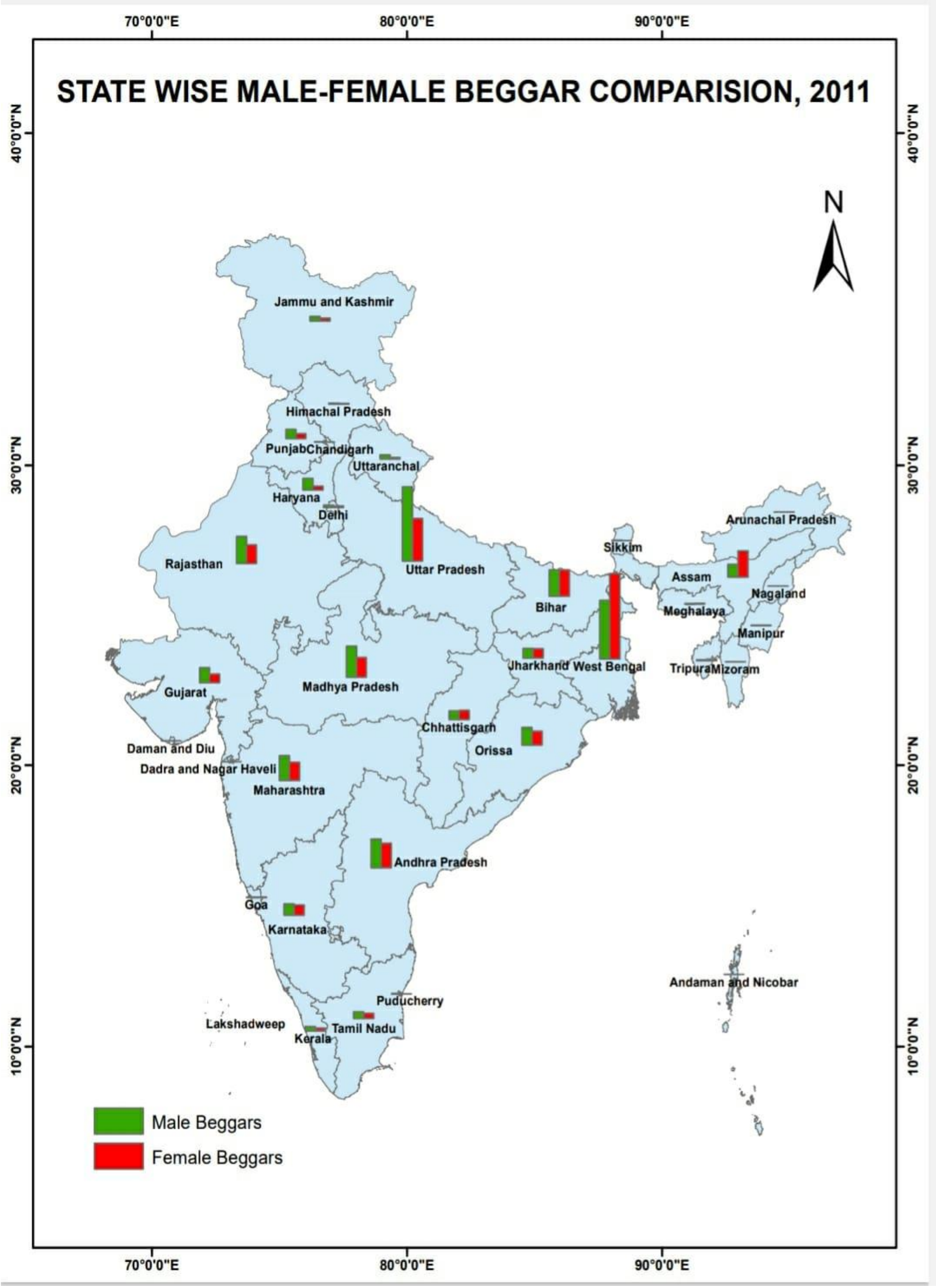

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract*, *Series-1*, *Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

মানচিত্র – ১.৫: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভিক্ষুক শ্রেণির জনবিন্যাস

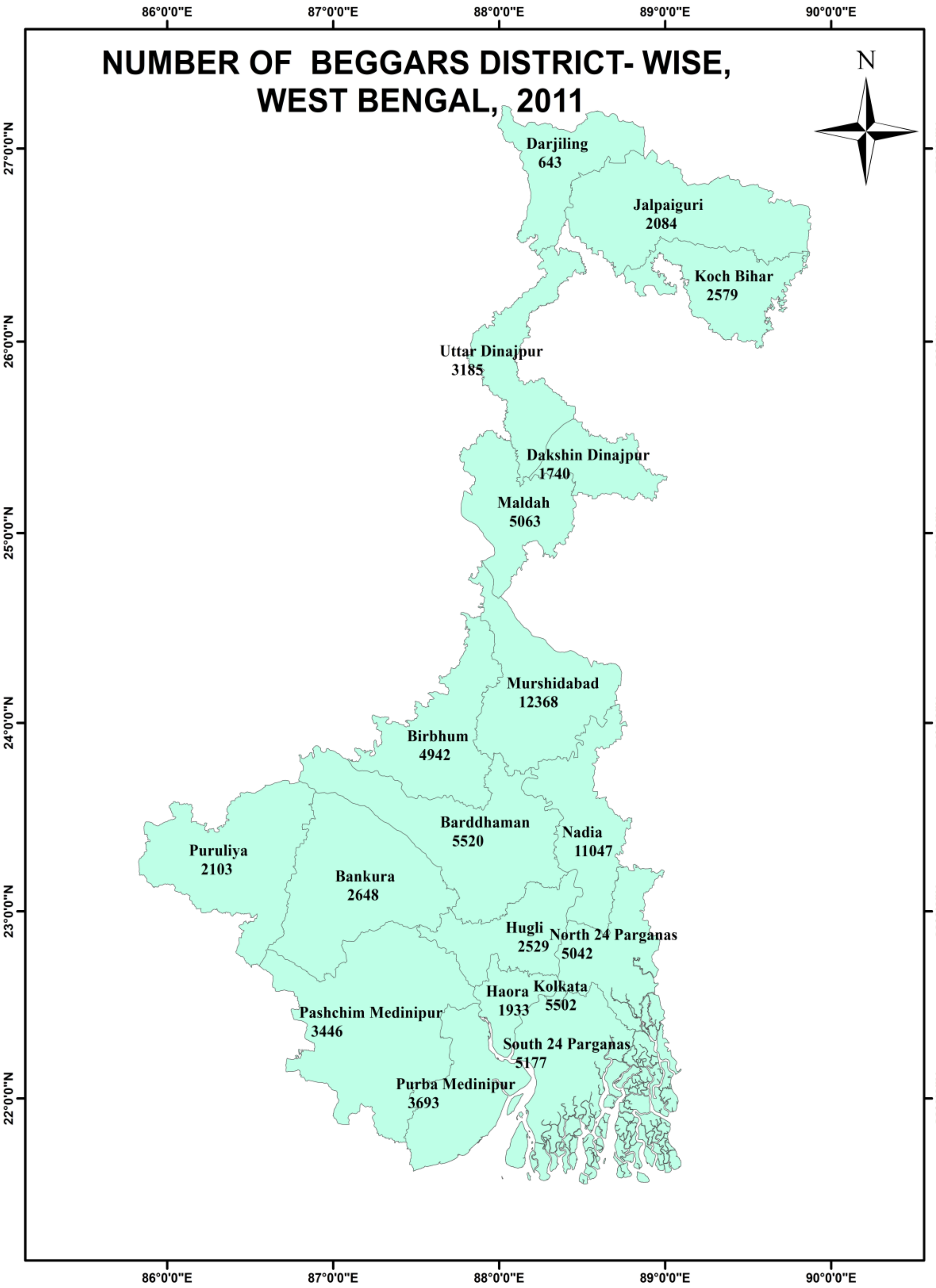

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract*, *Series-1*, *Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

মানচিত্র – ১.৬: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুরুষ ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস

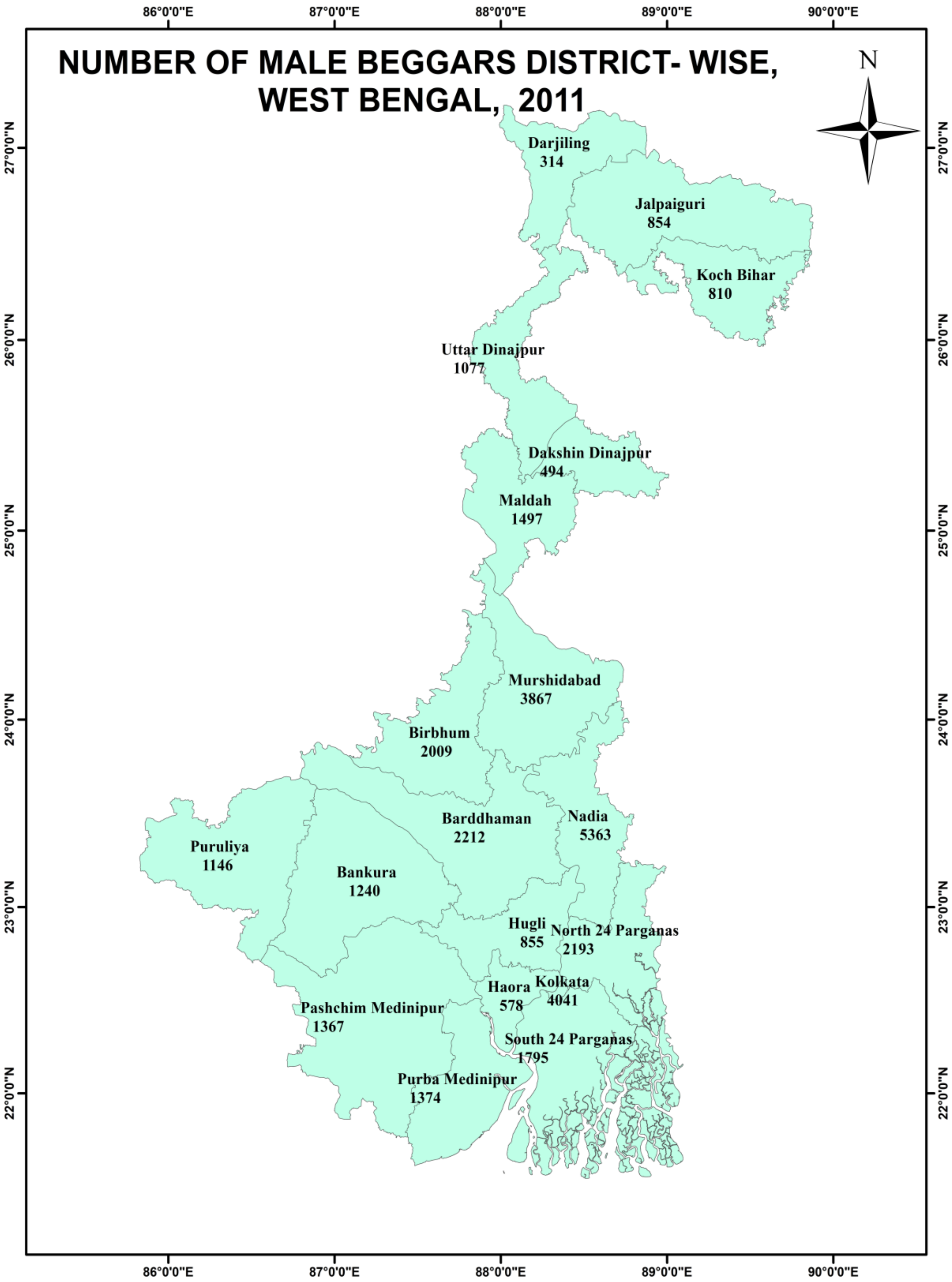

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract*, *Series-1*, *Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

মানচিত্র – ১.৭: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মহিলা ভিক্ষুকদের জনবিন্যাস

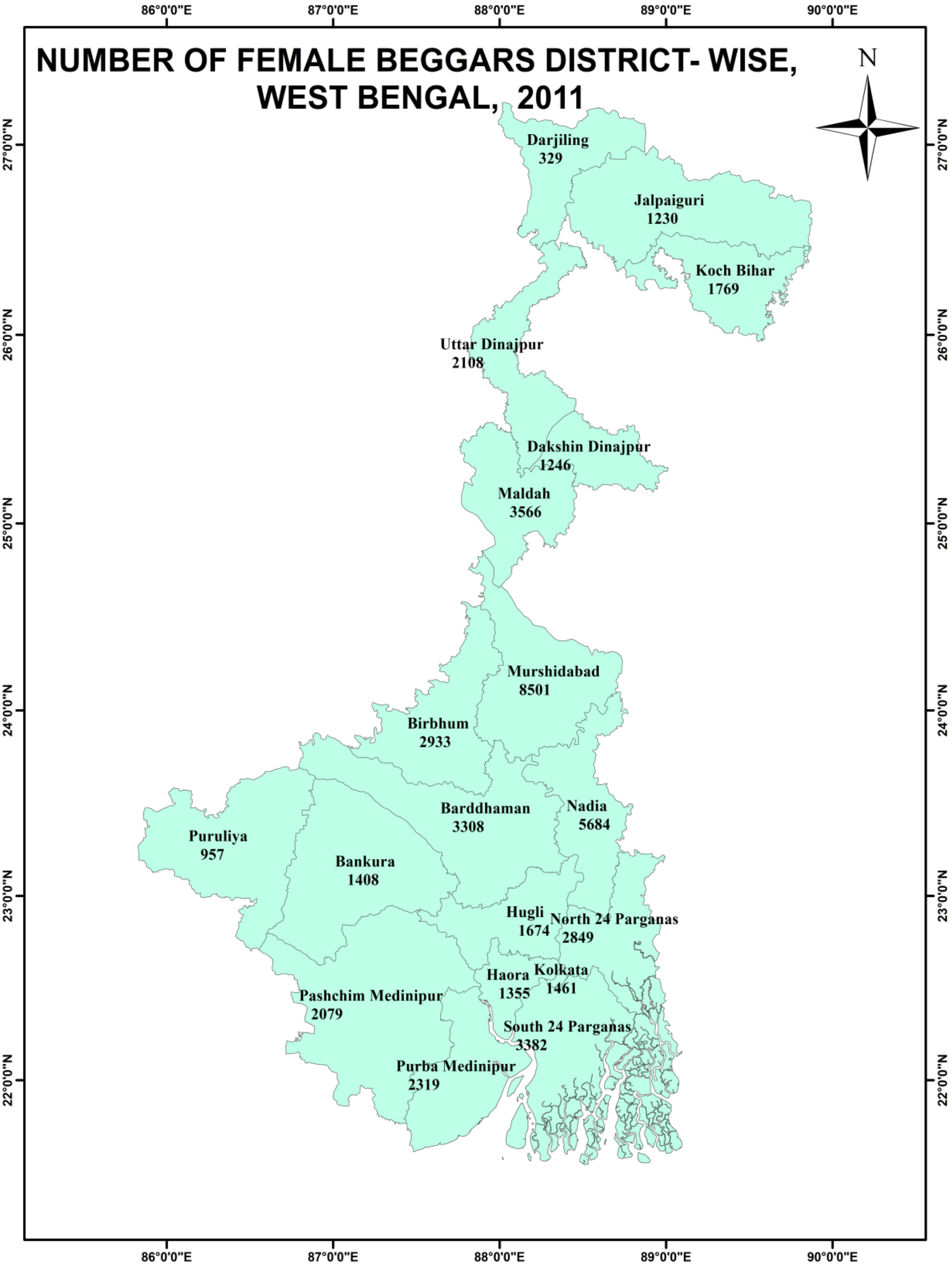

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013. গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা পুনর্নির্মিত মানচিত্র।

সংযোজনী - ২: ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান সম্পর্কিত সারণি

সারণি - ২.১: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুক আবাসের সংখ্যা, ধারণ ক্ষমতা ও দৈনিক গড় আবাসিক সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য	সরকারি আবাস সংখ্যা	বেসরকারি আবাস সংখ্যা	মোট	ধারণ ক্ষমতা	দৈনিকগড় আবাসিক সংখ্যা
১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	১	১	২	৩০০	১০০
২.	অসম	১	-	১	৯০	৪৬৪৬
৩.	বিহার	১	-	১	১০০	২১
৪.	গুজরাট	৫	৬	১১	১১০০	৭০৪
৫.	হরিয়ানা	১	-	১	৫০	১৩
৬.	জম্মু ও কাশ্মীর	২	-	২	১০০	১০০
৭.	কর্ণাটক	২	-	২	৪০০	১০০
৮.	কেরালা	১১	-	১১	৯৭৫	৯৭৫
৯.	মধ্যপ্রদেশ	১	-	১	-	-
১০.	মহারাষ্ট্র	১৩	১৭	৩০	৪৪৫০	৪৩৩৩
১১.	পাঞ্জাব	-	-	-	-	-
১২.	রাজস্থান	৪	৪	৪	২২৫	১৪৫
১৩.	তামিলনাড়ু	১০	-	১০	১৪১০	৭৬৯
১৪.	উত্তরপ্রদেশ	৫	-	৫	৫৭৫	৩৮৯
১৫.	পশ্চিমবঙ্গ	৯	-	৯	২০৭৫	১৮২৯
১৬.	দিল্লী	৮	-	৮	২৪০০	১৭৮৫
১৭.	গোয়া	-	-	-	-	-

সূত্র: Social Defence: A Statistical Hand Book by Govt. of India, Central Bureau of Correctional Services, 1974.

সারণি - ২.২: ভারতের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১-২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	সাল	পুরুষ		মহিলা		মোট সংখ্যা
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	
১.	১৯৮১	৪,৫০,৪১৯	৬০.০৩	২,৯৯,৮৮৮	৩৯.৯৭	৭,৫০,৩০৭
২.	১৯৯১	৩,৩২,৫৫৬	৬১.২৬	২,১০,৩১৯	৩৮.৭৪	৫,৪২,৮৭৫
৩.	২০০১	৩,২১,৬৯৪	৫১.২৫	৩,০৫,৯৯৪	৪৮.৭৫	৬,২৭,৬৮৮
৪.	২০১১	২,২১,৬৭৩	৫৩.৫৮	১,৯১,৯৯৭	৪৬.৪১	৪,১৩,৬৭০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1981, 1991, 2001 ও 2011.

সারণি – ২.৩: ভারতের গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১-২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	সাল	পুরুষ		মহিলা		মোট সংখ্যা
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	
১.	১৯৮১	৩,০৩,৬০৪	৫৮.৮৮	২,১২,০৭১	৪১.১২	৫,১৫,৬৭৫
২.	১৯৯১	২,০০,৩১৯	৫৯.২০	১,৩৮,০৫৩	৪০.৮০	৩,৩৮,৩৭২
৩.	২০০১	২,০১,৪২৯	৪৮.৭৭	২,১১,৬০৪	৫১.২৩	৪,১৩,০৩৩
৪.	২০১১	১,৩৫,২৫৮	৫০.৬২	১,৩১,৮৮৩	৪৯.৩৬	২,৬৭,১৪১

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1981, 1991, 2001 ও 2011.

সারণি - ২.৪: ভারতের শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১-২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	সাল	পুরুষ		মহিলা		মোট সংখ্যা
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	
১.	১৯৮১	১,৪৬,৮১৫	৬২.৫৭	৮৭,৮১৭	৩৭.৪৩	২,৩৪,৬৩২

২.	১৯৯১	১,৩২,২৩৭	৬৪.৬৬	৭২,২২৬	৩৫.৩৪	২,০৪,৫০৩
৩.	২০০১	১,২০,২৬৫	৫৬.০৩	৯৪,৩৯০	৪৩.৯৭	২,১৪,৬৫৫
৪.	২০১১	৮৬,৪১৫	৫৮.৯৭	৬০,১১৪	৪১.০২	১,৪৬,৫২৯

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1981, 1991, 2001 ও 2011.

সারণি - ২.৫: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	৪০,৭০৪	৯.০৪	২৮,৭৯০	৯.৬০	৬৯,৪৯৪	৯.২৬
২.	১৫-৩৪	১,২২,৪৫৪	২৭.১৯	৬৯,২৯৩	২৩.১১	১,৯১,৭৪৭	২৫.৫৬
৩.	৩৫-৫৯	১,৭৫,৪৭৪	৩৮.৯৬	১,০৫,৯৬৪	৩৫.৩৩	২,৮১,৪৩৮	৩৭.৫১
৪.	৬০+	১,১১,৭৮৭	২৪.৮২	৯৫,৮৪১	৩১.৯৬	২,০৭,৬২৮	২৭.৬৭
মোট		৪,৫০,৪১৯	১০০.০০	২,৯৯,৮৮৮	১০০.০০	৭,৫০,৩০৭	১০০.০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1981.

সারণি - ২.৬: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৯১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	৩২,০১২	৯.৬৩	২৪,২১২	১১.৫১	৫৬,২২৪	১০.৩৬
২.	১৫-৩৪	৯১,১৭১	২৭.৪২	৫২,০৪২	২৪.৭৪	১,৪৩,২১৩	২৬.৩৮
৩.	৩৫-৫৯	১,২৭,৪৬৮	৩৮.৩৩	৭৩,৮৬৩	৩৫.১২	২,০১,৩৩১	৩৭.০৯
৪.	৬০+	৮১,৯০৫	২৪.৬৩	৬০,২০২	২৮.৬২	১,৪২,১০৭	২৬৯.১৮
মোট		৩,৩২,৫৫৬	১০০	২,১০,৩১৯	১০০	৫,৪২,৮৭৫	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1991.

সারণি - ২.৭: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০০১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	৫৬,৬৬২	১৭.৬১	৫০,৯২১	১৬.৬৪	১,০৭,৫৮৩	১৭.১৪
২.	১৫-৩৪	৬৭,৭৩৫	২১.০৬	৬২,৪২১	২০.৪০	১,৩০,১৫৬	২০.৭৪
৩.	৩৫-৫৯	১,০৩,৫৪০	৩২.১৯	৮৯,৩৩৪	২৯.১৯	১,৯২,৮৭৪	৩০.৭৩
৪.	৬০+	৯৩,৭৫৭	২৯.১৪	১,০৩,৩১৮	৩৩.৭৬	১,৯৭,০৭৫	৩১.৪০
মোট		৩,২১,৬৯৪	১০০	৩,০৫,৯৯৪	১০০	৬,২৭,৬৮৮	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2001.

সারণি - ২.৮: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	২৪,৩৭৮	১০.৮৬	২০,৯১৮	১১.০৬	৪৫,২৯৬	১১.০০
২.	১৫-৩৪	৪৪,০১১	১৯.৬০	২৯,৭৫৩	১৫.৮৯	৭৩,৭৬৪	১৭.৯১
৩.	৩৫-৫৯	৭৭,২২৭	৩৪.৪০	৫৯,৩০৬	৩১.৬৮	১,৩৬,৫৩৩	৩৩.১৬
৪.	৬০+	৭৪,৮৪০	৩৩.৩৪	৮১,১৯২	৪৩.৩৭	১,৫৬,০৩২	৩৭.৯০
মোট		২,২৪,৪৫৭	১০০	১,৮৭,১৯২	১০০	৪,১১,৬৪৯*	১০০

*২০১১ সালে আদমশুমারিতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যানে ২০৪৫ জন ভিক্ষুকের বয়সের অনুপাতের উল্লেখ করা হয় নি। এক্ষেত্রে দুটি পরিসংখ্যানকে যুক্ত করলে মোট ভিক্ষুকের সংখ্যা থেকে ২৪ জন ভিক্ষুক বেশি উল্লিখিত রয়েছে।

সূত্র: Census of India 2011, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2013.

সারণি - ২.৯: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট সংখ্যা	শতাংশ
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	
১.	০-১৪	২৬,৩০৯	৮.৬৭	১৯,০২৪	৮.৯৭	৪৫,৩৩৩	৮.৭৯
২.	১৫-৩৪	৭৭,৮০৭	২৫.৬৩	৪০,৬৩৮	১৯.১৬	১,১৮,৪৪৫	২২.৯৭
৩.	৩৫-৫৯	১,১৭,৯৬৬	৩৮.৮৬	৭৪,৭৪১	৩৫.২৪	১,৯২,৭০৭	৩৭.৩৭
৪.	৬০+	৮১,৫২২	২৬.৮৫	৭৭,৬৬৮	৩৬.৬২	১,৫৯,১৯০	৩০.৮৭
মোট		৩,০৩,৬০৪	১০০	২,১২,০৭১	১০০	৫,১৫,৬৭৫	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1981.

সারণি - ২.১০: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৯১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	১৯,১১৮	৯.৫৪	১৪,৯৮৪	১০.৮৫	৩৪,১০২	১০.০৮
২.	১৫-৩৪	৫০,৯০৬	২৫.৪১	২৯,৫৩০	২১.৩৯	৮০,৪৩৬	২৩.৭৭
৩.	৩৫-৫৯	৭৪,৫১৯	২৫.৪১	২৯,৫৩০	২১.৩৯	৮০,৪৩৬	২৩.৭৭
৪.	৬০+	৫৫,৭৭৬	২৭.৮৪	৪৬,৫৩৩	৩৩.৭১	১,০২,৩০৯	৩০.২৪
মোট		২,০০,৩১৯	১০০.০০	১,৩৮,০৫৩	১০০.০০	৩,৩৮,৩৭২	১০০.০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1991.

সারণি - ২.১১: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০০১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	৩৯,৬৭৯	১৯.৭০	৩৭,০৪৬	১৭.৫১	৭৬,৭৪২	১৮.৫৮
২.	১৫-৩৪	৩৮,২৫৮	১৮.৯৯	৩৪,০৬৯	১৬.১০	৭২,৩২৭	১৭.৫১
৩.	৩৫-৫৯	৫৯,১৭৬	২৯.৩৮	৫৯,১০২	২৭.৯৩	১,১৮,২৭৮	২৮.৬৪
৪.	৬০+	৬৪,৩১৬	৩১.৯৩	৮১,৩৮৮	৩৮.৪৬	১,৪৫,৭০৪	৩৫.২৮
মোট		২,০১,৪২৯	১০০	২,১১,৬০৪	১০০	৪,১৩,০৩৩	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2001.

সারণি - ২.১২: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গ্রামীণ ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	১৪,০২৪	১১.৯৩	১২,৩১৮	১০.৩৬	২৬,৩৪২	১১.১৬
২.	১৫-৩৪	২২,৪৬৪	১৯.১১	১৬,০৪৪	১৩.৫০	৩৮,৫০৮	১৬.৩১
৩.	৩৫-৫৯	৩৭,৯৯৪	৩২.৩২	৩৪,১৯৬	২৮.৭৮	৭২,১৯০	৩০.৫৯
৪.	৬০+	৪৩,০৫৯	৩৬.৬৩	৫৫,৮৬৫	৪৭.০২	৯৮,৯২৪	৪১.৯২
মোট		১,১৭,৫৪১	১০০	১,১৮,৪২৩	১০০	২,৩৫,৯৬৪	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2011.

সারণি - ২.১৩: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৮১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	১৪,৩৯৫	৯.৮০	৯,৭৬৬	১১.১২	২৪,১৬১	১০.৩০
২.	১৫-৩৪	৪৪,৬৪৭	৩৯.১৭	২৮,৬৫৫	৩২.৬৩	৭৩,৩০২	৩১.২৪
৩.	৩৫-৫৯	৫৭,৫০৮	৩৯.১৭	৩১,২২৩	৩৫.৫৫	৮৮,৭৩১	৩৭.৮২
৪.	৬০+	৩০,২৬৫	২০.৬১	১৮,১৭৩	২০.৬৯	৪৮,৪৩৮	২০.৬৪
মোট		১,৪৬,৮১৫	১০০	৮৭,৮১৭	১০০	২,৩৪,৬৩২	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1981.

সারণি - ২.১৪: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ১৯৯১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	১২,৮৯৪	৯.৭৫	৯,২২৮	১২.৭৭	২২,১২২	১০,৮২
২.	১৫-৩৪	৪০,২৬৫	৩০.৪৫	২২,৫১২	৩১.১৫	৬২,৭৭৭	৩০.৭০
৩.	৩৫-৫৯	৫২,৯৪৯	৪০.০৪	২৬,৮৫৭	৩৭.১৬	৭৯,৮০০	৩৯.০২
৪.	৬০+	২৬,১২৯	১৯.৭৬	১৩,৬৬৯	১৮.৯১	৩৯,৭৯৮	১৯.৪৬
মোট		১,৩২,২৩৭	১০০	৭২,২৬৬	১০০	২,০৪,৫০৩	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1991.

সারণি - ২.১৫: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০০১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	১৬,৯৮৩	১৪.১২	১৩,৮৭৬	১৪.৭০	৩০,৮৫৯	১৪.৩৮
২.	১৫-৩৪	২৯,৪৭৭	২৪.৫১	২৮,৩৫২	৩০.০৪	৫৭,৮২৯	২৬.৯৪
৩.	৩৫-৫৯	৪৪,৩৬৪	৩৬.৮৯	৩০,২৩২	৩২.০৩	৭৪,৫৯৬	৩৪.৭৫
৪.	৬০+	২৯,৪৪১	২৪.৪৮	২১,৯৩০	২৩.২৩	৫১,৩৭১	২৩.৯৩
মোট		১,২০,২৬৫	১০০	৯৪,৩৯০	১০০	২,১৪,৬৫৫	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2001.

সারণি - ২.১৬: ভারতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক শহুরে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে জনসংখ্যা, ২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
১.	০-১৪	৮,০৮৬	১০.২২	৬,৮৫৭	১২.৩৯	১৪,৯৪৩	১১.১৬
২.	১৫-৩৪	১৫,২১৭	১৯.২৩	৯,৮৪৯	১৭.৮০	২৫,০৬৬	১৮.৭৩
৩.	৩৫-৫৯	৩০,৭৩৯	৩৮.৮৫	১৯,০৫৪	৩৪.৪৪	৪৯,৭৯৩	৩৭.২০
৪.	৬০+	২৫,০৬৪	৩১.৬৮	১৯,৫৫৫	৩৫.৩৫	৪৪,৬১৯	৩৩.৩৪
মোট		৭৯,১০৬	১০০	৫৫,৩১৫	১০০	১,৩৩,৪২১	১০০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2011.

সারণি - ২.১৭: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ১৯৯১

ভারত					
ভিক্ষুক ও ভবঘুরে			**শিশু ভিক্ষুক (৫-১৪)**		
মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা
৫,৪৪,০৪৮	৩,৩৩,৩৩৪	২,১০,৭১৪	৫৬,২২৪	৩২,০১২	২৪,২১২

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1991.

সারণি - ২.১৮: পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষুক পরিসংখ্যান, ১৯৯১

পশ্চিমবঙ্গ					
ভিক্ষুক ও ভবঘুরে			**শিশু ভিক্ষুক (৫-১৪)**		
মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা
১,০৬,৬৩০	৫১,৩৬০	৫৫,২৭০	৮,১৭০	৪,৭৬০	৩,৪১০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1991.

সারণি - ২.১৯: কলকাতার ভিক্ষুক পরিসংখ্যান, ১৯৯১

কলকাতা					
ভিক্ষুক ও ভবঘুরে			**শিশু ভিক্ষুক (৫-১৪)**		
মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা
১২,৭৪০	৫,৬৭০	৭,০৭০	১,১৩০	৭১০	৪২০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 1991.

সারণি - ২.২০: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ২০০১

অঞ্চলের নাম	**প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়**			**শিশু ভিক্ষুক (০-১৪)**		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা
ভারত	৬,৩০,৯৪০	৩,২৩,৭১২	৩,০৭,২২৮	১,০৭,৫৮৩	৫৬,৬৬২	৫০,৯২১
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৪,৯২৭	৪১,৯৭২	৬২,৯৫৫	১০,০৩৭	৫,১৪২	৪,৮৯৫
কলকাতা	৯,৯৬৫	৪,৩৭১	৫,৫৯৪	১,২৭৯	৭০০	৫৭৯

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2001.

সারণি - ২.২১: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ২০০১

অঞ্চলের নাম	**প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত**			**শিশু ভিক্ষুক (৫-১৪)**		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা
ভারত	৭২,৩৬৮	৪৪,৮২৮	২৭,৫৪০	৫,২১১	৩,২৩০	১,৯৮১
পশ্চিমবঙ্গ	১০,৪৯১	১২২	৪৮৫৯	৫৬৫	৩৭৮	১৮৭
কলকাতা	৩২৩	২০১	১২২	৪৫	২৫	২০

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2001.

সারণি - ২.২২: ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির পরিসংখ্যান, ২০০১

অঞ্চলের নাম	**মোট ভিক্ষুক**					
	প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের যুক্ত ও প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়			**শিশু ভিক্ষুক (০-১৪)**		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	বালক	বালিকা
ভারত	৭,০৩,৩০৮	৩,৬৮,৫৪০	৩,৩৪,৭৬৮	১,১২,৭৯৪	৫৯,৮৯২	৫২,৯০২
পশ্চিমবঙ্গ	১,১৫,৪১৮	৪২,০৯৪	৬৭,৮১৪	১০,৬০২	৫,৫২০	৫,০৮২
কলকাতা	১০,২৮৮	৪,৫৭২	৫,৭১৬	১,৩২৪	৭২৫	৫৯৯

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2001.

সারণি - ২.২৩: পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১

জেলা	**প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়**			**শিশু ভিক্ষুক (০-১৪)**		
	মোট	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**	**বালক**	**বালিকা**
জেলা - দার্জিলিং (০১)	৫৯৪	২৮৮	৩০৬	৫৫	৩০	২৫
জেলা - জলপাইগুড়ি (০২)	১,৯০৭	৭৭৯	১,১২৮	৫৯	২৭	৩২
জেলা – কোচবিহার (০৩)	২,৩৬১	৭৩৯	১,৬২২	৪৪	২৬	১৮
জেলা – উত্তর দিনাজপুর (০৪)	২,৯৩৪	৯৮৪	১,৯৫০	২৮৫	১৩৭	১৪৮
জেলা – দক্ষিণ দিনাজপুর (০৫)	১,৫৯০	৪৫৮	১,১৩২	৩৭	১০	৩৭
জালে - মালদা (০৬)	৪,৭২৬	১,৩৭৪	৩,৩৫২	১২৫	৭৭	৪৮
জেলা - মুর্শিদাবাদ (০৭)	১১,৫৩৯	৩,৫৬১	৭,৯৭৮	১৩২	৬৯	৬৯
জেলা – বীরভূম (০৮)	৪,৬০৬	১,৮৩৯	২,৭৬৭	৮৭	৪৮	৩৯
জেলা - বর্ধমান (০৯)	৫,০৩৩	২,০০৩	৩,০৩০	৩৪৫	১৮১	১৬৪

জেলা – নদিয়া (১০)	১০,২৭৯	৫,১৪৩	৫,৪৩৬	১৩০	৭৩	৫৭
জেলা – উত্তর ২৪ পরগণা (১১)	৪,৫৭৮	২,০০৯	২,৫৬৯	২০৩	১১৪	৮৯
জেলা – হুগলী (১২)	২,২৯৬	৭৭০	১,৫২৬	১০২	৫২	৫০
জেলা – বাঁকুড়া (১৩)	২,৪৫২	১,১৪৩	১,৩০৯	৮৩	৪৩	৪০
জেলা – পুরুলিয়া (১৪)	১,৯২৯	১,০৩৯	৮৯০	১৫৮	৮১	৭৭
জেলা – হাওড়া (১৫)	১,৭৬৭	৫৩৫	১,২৩২	৯৮	৪১	৫৭
জেলা - কলকাতা (১৬)	৫,১৮৮	৩,৮২১	১,৩৬৭	৫০১	২৯৯	২০২
জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগণা (১৭)	৪,৫৬২	১,৫৫৪	৩,০০৮	১৮৬	৯০	৯৬
জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর (১৮)	৩,১৮৩	১,২৪১	১,৯৪২	১৮৯	৯৭	৯২
জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর (১৯)	৩,২৫৯	১,১৭৫	২,০৮৪	১৮৬	৮৮	৯৮
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ (১৯)	**৭৫,০৮৩**	**৩০,৪৫৫**	**৪৪,৬২৮**	**৩,০০৫**	**১,৫৮৩**	**১,৪২২**

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2011.

সারণি - ২.২৪: পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১

জেলা	**প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের যুক্ত**			**শিশু ভিক্ষুক (৫-১৪)**		
	মোট	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**	**বালক**	**বালিকা**
জেলা - দার্জিলিং (০১)	৪৯	২৬	২৩	০২	০১	০১
জেলা - জলপাইগুড়ি (০২)	১১৭	৭৫	১০২	০১	০০	০১
জেলা – কোচবিহার (০৩)	২১৮	৭১	১৪৭	০৪	০৩	০১
জেলা – উত্তর দিনাজপুর (০৪)	২৫১	৯৩	১৫৮	১৭	০৭	১০
জেলা – দক্ষিণ দিনাজপুর (০৫)	১৫০	৩৬	১১৪	০০	০০	০০
জালে - মালদা (০৬)	৩৩৭	১২৩	২১৪	১০	০৫	০৫
জেলা - মুর্শিদাবাদ (০৭)	৮২৯	৩০৬	৫২৩	১৩	০৬	০৭
জেলা – বীরভূম (০৮)	৩৩৬	১৭০	১৬৬	১১	০৭	০৪
জেলা - বর্ধমান (০৯)	৪৮৭	২০৯	২৭৮	২৫	২০	০৫
জেলা – নদিয়া (১০)	৪৬৮	২২০	২৪৮	০২	০২	০০
জেলা – উত্তর ২৪ পরগণা (১১)	৪৬৪	১৮৪	২৮০	০৫	০৩	০২
জেলা – হুগলী (১২)	২৩৩	৮৫	১৪৮	০৯	০৬	০৩
জেলা – বাঁকুড়া (১৩)	১৯৬	৯৭	৯৯	০২	০১	০১
জেলা – পুরুলিয়া (১৪)	১৭৪	১০৭	৬৭	১১	০৬	০৫
জেলা – হাওড়া (১৫)	১৬৬	৪৩	১২৩	০২	০১	০১
জেলা - কলকাতা (১৬)	৩১৪	২২০	৯৪	৪২	২৫	১৭

জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগণা (১৭)	৬১৫	২৪১	৩৭৪	২১	১২	০৯
জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর (১৮)	২৬৩	১২৬	১৩৭	২১	১০	১১
জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর (১৯)	৪৩৪	১৯৯	২৩৫	১৩	০৭	০৬
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ (১৯)	**৬১৬১**	**২৬৩১**	**৩৫৩০**	**২১১**	**১২২**	**৮৯**

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2011.

সারণি - ২.২৫: পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১

মোট ভিক্ষুক					
প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের যুক্ত ও প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়			**শিশু ভিক্ষুক (০-১৪)**		
মোট	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**	**বালক**	**বালিকা**
৮১,২৪৪	৩৩,০৮৬	৪৮,১৫৮	৩,২১৬	১,৭০৫	১,৫১১
৬৪৩	৩১৪	৩২৯	৫৭	৩১	২৬
২,০৮৪	৮৫৪	১,২৩০	৬০	২৭	৩৩
২,৫৭৯	৮১০	১,৭৬৯	৪৮	২৯	১৯
৩,১৮৫	১,০৭৭	২,১০৮	৩০২	১৪৪	১৫৮
১,৭৪০	৪৯৪	১,২৪৬	৩৭	১০	২৭
৫,০৬৩	১,৪৯৭	৩,৫৬৬	১৩৫	৮২	৫৩
১২,৩৬৮	৩,৮৬৭	৮,৫০১	১৪৫	৭৫	৭০
৪,৯৪২	২,০০৯	২,৯৩৩	৯৮	৫৫	৪৩
৫,৫২০	২,২১২	৩,৩০৮	৩৭০	২০১	১৬৯
১১,০৪৭	৫,৩৬৩	৫,৬৮৪	১৩২	৭৫	৫৭
৫,০৪২	২,১৯৩	২,৮৪৯	২০৮	১১৭	৯১
২,৫২৯	৮৫৫	১,৬৭৪	১১১	৫৮	৫৩
২,৬৪৮	১,২৪০	১,৪০৮	৮৫	৪৪	৪১
২,১০৩	১,১৪৬	৯৫৭	১৬৯	৮৭	৮২
১,৯৩৩	৫৭৮	১,৩৫৫	১০০	৪২	৫৮
৫,৫০২	৪,০৪১	১,৪৬১	৫৪৩	৩২৪	২১৯
৫,১৭৭	১,৭৯৫	৩,৩৮২	২০৭	১০২	১০৫
৩,৪৪৬	১,৩৬৭	২,০৭৯	২১০	১০৭	১০৩
৩,৬৯৩	১,৩৭৪	২,৩১৯	১৯৯	৯৫	১০৪

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2011.

সারণি - ২.২৬: ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহুরে প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের পরিসংখ্যান, ২০১১

অঞ্চলের নাম	**মোট/ গ্রামীণ/ শহর**	**প্রান্তিক শ্রমিক যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়**	**মোট প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক**		
			মোট	পুরুষ	মহিলা
ভারত	গ্রামীণ	ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	৪৩,৩৮০	২৬,২১৫	১৭,১৬৫
ভারত	শহর	ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	২৭,১২৬	১৬,৯২৬	১০,২০০
ভারত	মোট	ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	৭০,৫০৬	৪৩,১৪১	২৭,৩৬৫
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ (১৯)	গ্রামীণ	ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	১০,৭৪৬	৫,৭৭৬	৪,৯৭০
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ (১৯)	শহর	ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	৩,০৫২	১,৯২১	১,১৩১
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ (১৯)	মোট	ভিক্ষুক ও ভবঘুরে	১৩,৭৯৮	৭,৬৯৭	৬,১০১

সূত্র: Census of India, *Primary Census Abstract, Series-1, Total Population*: Table A-5. Registrar General and Census Commissioner, New Delhi: Government of India, 2011.

সংযোজনী - ৩: ভিক্ষুক ও ভবঘুরে আবাসের চিত্র

চিত্র - ৩.১: হুগলীতে অবস্থিত ভবঘুরে আবাসনের চিত্র

সূত্র: উত্তর পাড়া মহিলা ভবঘুরে আবাসন। এখানে ভবঘুরে ভিক্ষারত মহিলাদের সরকারি তৎপরতায় নিয়ে এসে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

সংযোজনী - ৪: কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিক্ষারত ভিক্ষুক শ্রেণির কিছু চিত্র (গবেষকের নিজের সংগৃহীত)

চিত্র - ৪.১: দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির সংলগ্ন পথ ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – দক্ষিণেশ্বর, তাং – ২০/০২/২০১৮।

চিত্র - ৪.২: রবীন্দ্র সদন সংলগ্ন শিশু ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – রবীন্দ্র সদন, তাং – ১৬/০৪/২০২২।

চিত্র - ৪.৩: যোধপুর পার্ক সংলগ্ন পথ ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – যোধপুর পার্ক, তাং – ১২/১০/২০১৮।

চিত্র - ৪.৪: যাদবপুর সুকান্ত সেতুর ওপর ভিক্ষারত ভবঘুরে ভিক্ষুক

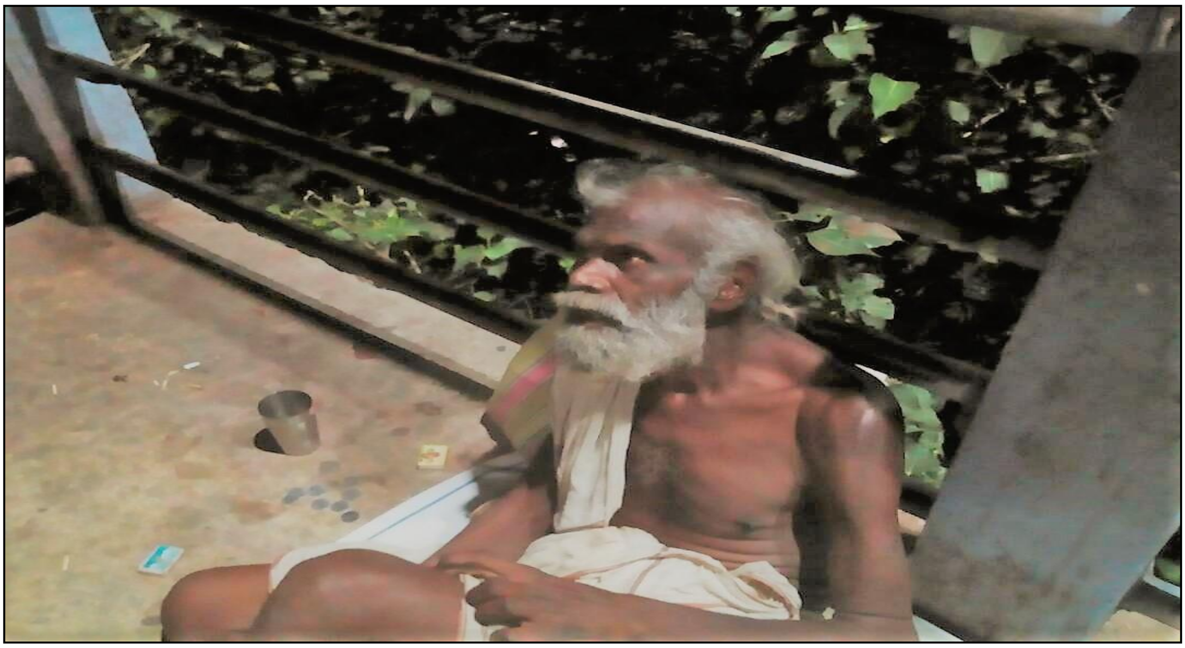

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – যাদবপুর, তাং – ০৪/০৬/২০১৮।

চিত্র - ৪.৫: দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির সংলগ্ন পথ ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – দক্ষিণেশ্বর, তাং – ২০/০২/২০১৮।

চিত্র – ৪.৬: বালিগঞ্জ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিক্ষারত অসুস্থ ভিক্ষুক

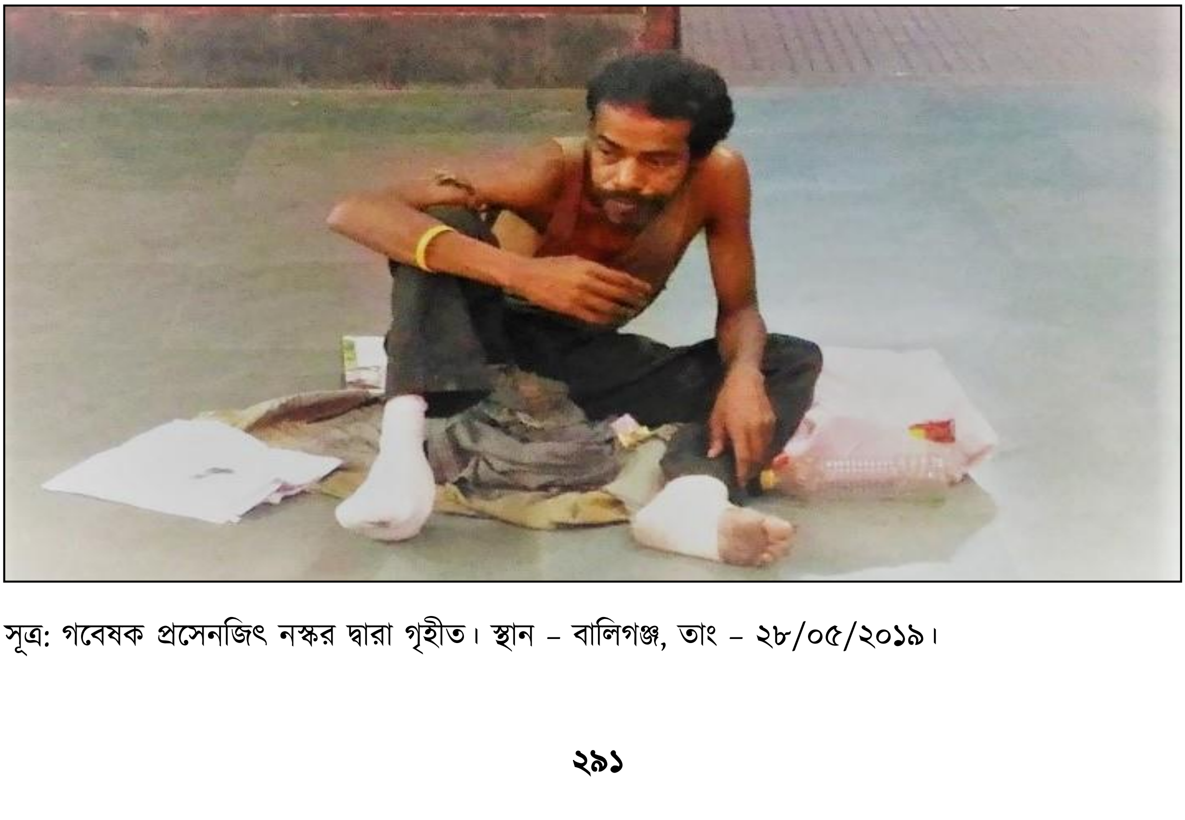

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – বালিগঞ্জ, তাং – ২৮/০৫/২০১৯।

চিত্র – ৪.৭: রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের পাশে ভিক্ষারত শিশু ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – রবীন্দ্র সরোবর, তাং – ০৫/০১/২০১৯।

চিত্র – ৪.৮: বালিগঞ্জ স্টেশনের রেল ওভার ব্রিজের ওপর ভিক্ষারত বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – বালিগঞ্জ, তাং – ২৮/০৫/২০১৯।

চিত্র – ৪.৯: দক্ষিণ বারাসত রেল স্টেশনে বহুরূপী ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – দক্ষিণ বারাসত, তাং – ২৯/১০/২০১৮।

চিত্র – ৪.১০: দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির সংলগ্ন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – দক্ষিণেশ্বর, তাং – ২০/০২/২০১৮।

চিত্র – ৪.১১: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্বস্থ বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – যাদবপুর, তাং – ০৫/০৪/২০২৩।

চিত্র - ৪.১২: বেকবাগান (বাম পাশে) এবং মানিকতলা (ডান পাশে) এলাকায় পথ ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – বেকবাগান ও মানিকতলা, তাং – ০৯/০৬/২০২১

চিত্র – ৪.১৩: গড়িয়া স্টেশন (বাম পাশে) এবং লোকাল ট্রেনে (ডান পাশে) ভিক্ষারত প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুক

সূত্র: গবেষক প্রসেনজিৎ নস্কর দ্বারা গৃহীত। স্থান – গড়িয়া ও শিয়ালদহ, তাং – ১৮/০৩/২০২৩।

চিত্র – ৪.১৪: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-১

সূত্র: Zainul Abedin: *Famine Sketch*, Dhaka, Bangladesh National Museum, 1984.

চিত্র – ৪.১৫: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-২

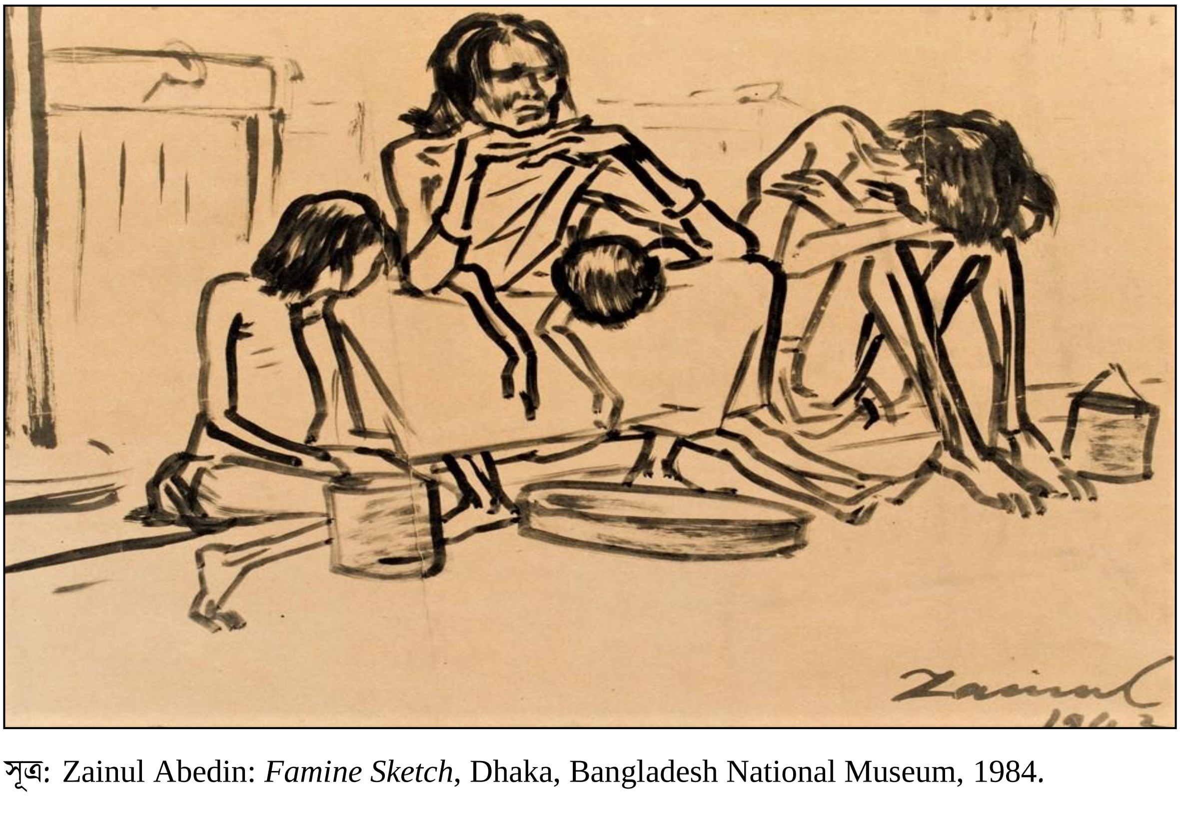

সূত্র: Zainul Abedin: *Famine Sketch*, Dhaka, Bangladesh National Museum, 1984.

চিত্র – ৪.১৬: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-৩

সূত্র: Zainul Abedin: *Famine Sketch*, Dhaka, Bangladesh National Museum, 1984.

চিত্র – ৪.১৭: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-৪

সূত্র: Zainul Abedin: *Famine Sketch*, Dhaka, Bangladesh National Museum, 1984.

চিত্র – ৪.১৮: বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩) চিত্র-৫

সূত্র: Zainul Abedin: *Famine Sketch*, Dhaka, Bangladesh National Museum, 1984.

সংযোজনী - ৫: দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভিক্ষুকদের বিষয়ে বিভিন্ন খবরের কিছু দৃষ্টান্ত

চিত্র – ৫.১: ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-১

P.18 - কলকাতা

ওদের অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা শৈশবেই কি পেট ভরে অন্যের

অন্য শহর
শিশু যখন টোপ

জয়তী রাহা

শরীরের এক ফালি মলিন কাপড়ে লজ্জা ঢাকছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। কাঁধে উলঙ্গ শিশু। পাশে ছোট ছোট পায়ে তাল মিলিয়ে চলেছে আরও দুই নগ্ন বালক। রোদে ঝলসানো হাড়সর্বস্ব শরীরের এক হাতে ধরা ভাঙা পাত্র। দু'মুঠো ভাতের ভিক্ষা চেয়ে সেই মায়ের প্রবল আকুতিতে তত ক্ষণে পাড়ার এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গিয়েছে। এ দৃশ্য এখন দেখা যায় না। বরং ফুটপাতের ধারে অথবা স্টেশন চত্বরের ভিখারিণী মায়েদের অহরহ চোখে পড়ে। কোলে টানটান শুয়ে শিশু। কখনও কখনও বদলেও যায় কোলের শিশুটি। কিন্তু বদলান না মা। সত্যিই এঁরা মা তো?

হাওড়া, শিয়ালদহ, দমদম স্টেশন চত্বরে, নন্দন-রবীন্দ্র সদন, ধর্মতলা এলাকায় ওঁদের কারও কারও দেখা মিলবে। এ ছাড়াও ওঁদের আরও ঠিকানা রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে জিপিও-র সামনে সন্তান কোলে ভিক্ষা করেন এক মহিলা। যাঁরা নিয়মিত ওই পথে যাতায়াত করেন, তাঁরা কোনও দিন সেই মাকে ঘোমটা ছাড়া দেখেননি। তাঁর কোলের শিশুটিকেও জেগে থাকতে দেখেননি কেউ। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোয় সে।

শৈশব চুরি হয়ে যাওয়া এই শিশু প্রায় সব সময়েই ঘুমিয়ে থাকে। কখনও মা, কখনও বা ভাই-বোনের কোলে। হাজারো টানা-হ্যাঁচড়াতেও চোখ খোলে না ওরা। ওরাই বিজ্ঞাপন, ভিক্ষার বিজ্ঞাপন। এই ভূমিকাই ওদের জন্য বরাদ্দ।

কথা হচ্ছিল দমদম স্টেশন চত্বরের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাঁর মতে, ভিক্ষা নয়, এ তো ব্যবসা। মা বা ভাই-বোন নয়, ওঁরা আসলে ভাড়া করা কলাকুশলী। এই পেশায় সব থেকে বেশি চাহিদা শিশুদের। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শহরে ছাড়লে ন্যূনতম দৈনিক ২০০ টাকা ভাড়া জোটে পরিবারের। ওদের রাখলে সারা দিনের উপার্জন প্রায় ৪০০ টাকা। পার্ক স্ট্রিটের মতো জায়গায় হিসেবটা ৬০০ ছাড়িয়ে যায়। এর পরেই কিন্তু সব থেকে বেশি চাহিদা রয়েছে বৃদ্ধ মুখের।

সবটাই ঠিক করে দেওয়ার জন্য রয়েছে সংস্থা। তবে তা এক না অভিযোগ থাকলে অবশ্যই তুলে নিয়ে আসা হয়। এ জন্য জন সচেতনতাও প্রয়োজন।

সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এ রাজ্যের ছবিটা বেশ আতঙ্কের। মন্ত্রী থেবরচন্দ গহলৌত জানিয়েছেন, আশ্রয়হীন ও ভিখারির তালিকায় এ দেশে সবার উপরে পশ্চিমবঙ্গ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ।

জন সচেতনতার কথা যতই বলা হোক, প্রশাসন কিন্তু ঘুমিয়েই। এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে বছর কয়েক আগের উত্তর শহরতলির একটা ঘটনা। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে স্টেশনে ঘুমন্ত বাচ্চা কোলে এক ভিখারিণীকে দেখতে পেতেন এক দিদিমণি। এক দিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তাঁর। সরাসরি প্রশ্ন করেন, রোজ বাচ্চাটা ঘুমোয় কেন। যথারীতি অসুস্থতার গল্প শোনান সেই ভিখারিণী। নাছোড়বান্দা শিক্ষিকা চিকিৎসার কাগজ চেয়ে জেরা শুরু করতেই পালানোর চেষ্টা করেন সেই মহিলা। অবশেষে পুলিশের জালে একাই ধরা পড়েন তিনি। কিন্তু কান টানলেও বেরিয়ে আসে না মাথা। কারণ কান আর মাথার যোগ ছিল সুতো দিয়ে। জালে কান আটকাতেই নির্দেশ আসে সুতো কেটে দেওয়ার।

তবে বেরিয়ে আসে সেই ভয়াবহ তথ্য, শিশুটি তাঁর কেউ নয়। প্রতিদিন তাঁকে ইঞ্জেকশন দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হত। খিদে আর শৈশবের ইচ্ছেগুলো এ ভাবেই ঘুম পাড়িয়ে রেখে অন্যের পেট ভরায় ওরা।

■ ভিক্ষা: কাচ তোলা গাড়ির জানলায় ভিখারিণী 'মা'। ঘুমিয়ে আছে শিশুটি। ছবি: রণজিৎ নন্দী

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬/০৩/২০১৮।

চিত্র – ৫.২: শিশু শ্রমিক সম্পর্কিত সংবাদ

■ নিরুপায়: রবিবার, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস। তবে জীবনযুদ্ধ থেকে রেহাই মেলেনি এই শিশুদের। গিরিশ পার্ক এলাকায়। ছবি: বিশ্বনাথ বণিক

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২/০৬/২০১৮।

চিত্র – ৫.৩: ২০ দফা কর্মসূচি সংক্রান্ত সংবাদ

INDIAN EXPRESS

PM presents a recast 20-point programme of the emergency

More offers of foreign tie-up to Maruti

81 killed in air crash near

PM-Antulay confrontation likely

SAREES

সূত্র: Indian Express, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৮২।

চিত্র – ৫.৪: শিশু ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-১

কোন ডাকে যেতে নেই, জানে বালিকাও

গ্রীষ্মের দুপুর হোক বা শীতের রাত, পথের ধারেই কেটে যায় জীবনচক্র। শিশু থেকে নারী, সকলেরই সঙ্গী নিরাপত্তাহীনতা।

পথযাপন/২

দেবাশিস ঘড়াই

■ রাতজাগা: ঘুমোচ্ছে ছোটরা, তাই পাশে পাহারায় পরিবারের অন্যেরা। শ্যামবাজারে। ছবি: সুদীপ ঘোষ

একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। 'ট্যাক্সি-কাকু' হাত নেড়ে ইশারায় ডেকে বলেছিল, 'চল, তোকে খাওয়াব।' মাথা নেড়ে না বলার পরেও 'কাকু'টা যেতে চায়নি। 'ট্যাক্সিতে আয়। ঘুরতে নিয়ে যাব!' কথাগুলো শোনামাত্রই উল্টো দিকে দৌড় দিয়েছিল বছর আটের রাণু দাস (নাম পরিবর্তিত)। রাণুর কথায়, "পালিয়ে মায়ের কাছে চলে এসেছিলাম।" দু'মাস আগের ঘটনা। কিন্তু এখনও কোনও ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়ালে, ভয়ে থাকে রাণু। গড়িয়াহাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ফুটপাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে সে।

রাণুর মা সুশীলা (নাম পরিবর্তিত) বলেন, "মেয়ে বড় হচ্ছে। ভয় করে খুব।" পুলিশে খবর দিয়েছেন? সুশীলার উত্তর, "কী বলব! এ সব তো প্রায়ই হয়। কত বার বলব?" তবে সেই ঘটনার পর থেকে রাণু আর রাতে মায়ের কাছে শোয় না। কারণ, তারা যেখানে থাকে, সেই জায়গাটা তুলনামূলক ভাবে ফাঁকা। তাই গড়িয়াহাট উড়ালপুলের যে প্রান্তে ফুটপাতবাসীরা একসঙ্গে বাস করেন, সেখানে শুতে যায়। এক ফুটপাতবাসী জানালেন, দু'আড়াই বছরের শিশুকন্যাদের নিয়েই দুশ্চিন্তা কমে না, সেখানে সাত-আট বছরের মেয়েরা তো বড়!

রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন জানাচ্ছে, দু'বছর আগের ব্রেবোর্ন রোডের ঘটনার পরেই ফুটপাতের শিশুদের নিয়ে, বিশেষ করে শিশুকন্যা-কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করা হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, যে সব ঘটনা নিয়ে শোরগোল হয়, সেগুলো বাদ দিয়ে প্রতি দিন, প্রতি রাতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা পুলিশ-প্রশাসন পর্যন্ত পৌঁছয় না। কমিশনের চেয়ারম্যান অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, "কোনও ঘটনার খবর জানতে পারলেই আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পদক্ষেপ করি।"

আসলে শৈশব-কৈশোর বলে কোনও একটা পর্যায় ফুটপাতের জীবনে থাকে কি না, তা নিয়েই তো সংশয়! ফুটপাতের শিশুদের নিয়ে বহু বছর ধরে কাজ করছে, এমন এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য বললেন, "শৈশব থাকবে কী ভাবে! আপনি হয়তো কোনও বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য শিবিরে আনলেন, কিন্তু কিছু পরেই তার মা এসে ছেড়ে দিতে বলবেন। কারণ, ওরা তখন ভিক্ষা করবে!" মূলত রেল স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকার ফুটপাথের শিশুদের নিয়ে কাজ করা আর এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য তিস্তা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শুধু মেয়েরাই নয়, আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, ছোট ছেলেরাও শারীরিক নিগ্রহের শিকার। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের লোকেরাই এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেন না!"

ফলে প্রতি দিনই যেখানে টিকে থাকার লড়াই, সেখানে পড়াশোনা করা বা সেই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করাটা যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! শোভাবাজারের ফুটপাতে মা-বোনের সঙ্গে থাকে ষোলো বছরের রাজু দাস। পড়াশোনা করে কি না, প্রশ্নের উত্তরে তার সাফ জবাব, "ধুর বোর হয়ে যাই!" এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যের কথায়, "আমরাও যদি ছোটবেলায় কিছু কাজ করে হাতে পঞ্চাশ টাকা পেতাম, তা হলে কি আর পড়াশোনা করতাম!" তবে তার মধ্যেও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা থাকে না, তা নয়! কিন্তু সে-সব ব্যতিক্রমই!

এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে স্বাতী চক্রবর্তী বলেন, "পথশিশুরা আসলে 'ইনভিজিবল পপুলেশন'। তবে, এরা যেন অস্তিত্বহীন। সরকারি প্রক্রিয়ায় সঙ্গে ওদের যুক্ত করার সব কাজই আমরা করছি। ওদের আধার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়াকরণের কাজও শুরু করতে চলেছি।" ফুটপাতের শিশুদের জন্য, বিশেষত মেয়েদের জন্য বিশেষ বোর্ডিং স্কুল চালুর পরিকল্পনা করেছে কলকাতা পুরসভাও। পুরসভার মেয়র পারিষদ (শিক্ষা) অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রস্তাবিত ওই বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়া-সহ সব কিছুই বিনামূল্যে দেওয়া হবে।"

তবে যাবতীয় অনিশ্চয়তা বাদ দিয়ে ফুটপাতের জীবনে পাল্টা প্রতিরোধ তৈরি হয় রোজ, প্রতি রাতে। যার প্রমাণ পাওয়া গেল হেদুয়ার ফুটপাতে। "ভয় করবে কেন? ঝাঁটা থাকে তো। মেরে তাড়িয়ে দিই।" বয়স বড়জোর পনেরো বছর। শ্যামলা গায়ের রং। ডান হাতে উল্কি করা। পরনে পুরনো, নোংরা একটা চুড়িদার। তবে চোখেমুখে সামান্য দ্বিধাও নেই। রাতে ফুটপাথে থাকতে ভয় করে কি না, প্রশ্ন শোনামাত্রই রিয়া মাঝি নামে ওই কিশোরীর স্পর্ধিত উত্তর। যার সঙ্গে অনায়াসে মিশে গেল যাদবপুরের ফুটপাতের সতেরো বছরের কিশোরী রোশনি খাতুনের কথা। রোশনির কথায়, "মদ খেয়ে নেশা করে গায়ের উপরে পড়ে যায় লোকজন। মেরে তাড়াই তখন।"

কিন্তু এ লড়াই তো নেশাগ্রস্তদের সঙ্গে লড়া যায়। কারণ, তাদের সমগোত্রীয় বলেই মনে করেন ফুটপাতবাসীরা। কিন্তু গাড়ি করে আসা 'বাবু'গোত্রীয় অজ্ঞাতপরিচয় লোকজন, যাদের আনাগোনা বেড়ে যায় রাতের ফুটপাতে, তাদের সঙ্গে কি লড়া যায়? ভাল পোশাক পরা কাউকে চট করে কিছু বলা যায় না, জানাচ্ছেন ফুটপাতবাসীরা। তাই তখন দৌড়ে পালাতে হয়। যেমন 'ট্যাক্সি-কাকু'র হাতছানিতে সাড়া না দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল রাণু।

ফুটপাতের জীবন ওই বালিকাকেও বুঝিয়ে দিয়েছে কোন ডাকে সাড়া না দিয়ে পালাতে হয়।

(শেষ)

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩/০৯/২০১৮।

চিত্র – ৫.৫: শিশু ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-২

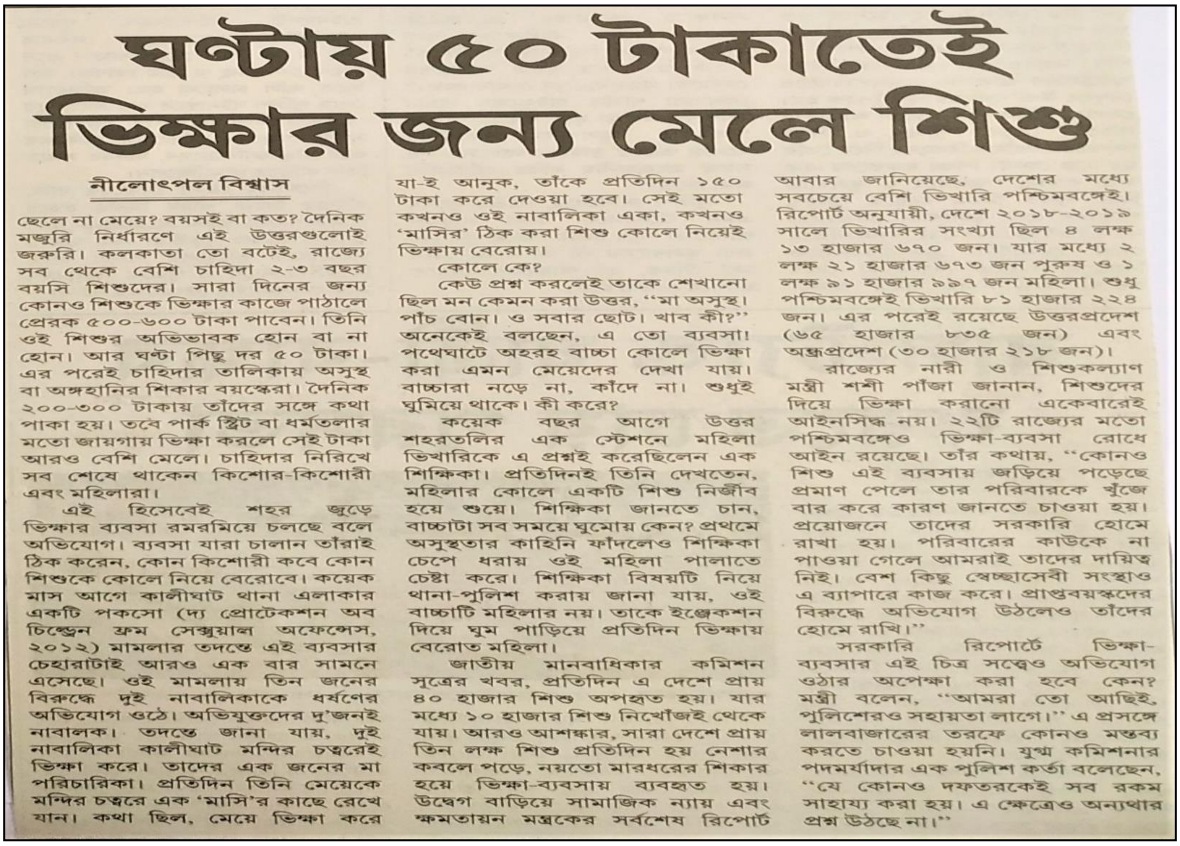

ঘণ্টায় ৫০ টাকাতেই ভিক্ষার জন্য মেলে শিশু

নীলোৎপল বিশ্বাস

ছেলে না মেয়ে? বয়সই বা কত? দৈনিক মজুরি নির্ধারণে এই উত্তরগুলোই জরুরি। কলকাতা তো বটেই, রাজ্যে সব থেকে বেশি চাহিদা ২-৩ বছর বয়সি শিশুদের। সারা দিনের জন্য কোনও শিশুকে ভিক্ষার কাজে পাঠালে প্রেরক ৫০০-৬০০ টাকা পাবেন। তিনি ওই শিশুর অভিভাবক হোন বা না হোন। আর ঘণ্টা পিছু দর ৫০ টাকা। এর পরেই চাহিদার তালিকায় অসুস্থ বা অঙ্গহানির শিকার বয়স্কেরা। দৈনিক ২০০-৩০০ টাকায় তাঁদের সঙ্গে কথা পাকা হয়। তবে পার্ক স্ট্রিট বা ধর্মতলার মতো জায়গায় ভিক্ষা করলে সেই টাকা আরও বেশি মেলে। চাহিদার নিরিখে সব শেষে থাকেন কিশোর-কিশোরী এবং মহিলারা।

এই হিসেবেই শহর জুড়ে ভিক্ষার ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে বলে অভিযোগ। ব্যবসা যারা চালান তাঁরাই ঠিক করেন, কোন কিশোরী কবে কোন শিশুকে কোলে নিয়ে বেরোবে। কয়েক মাস আগে কালীঘাট থানা এলাকার একটি পকসো (দ্য প্রোটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস, ২০১২) মামলার তদন্তে এই ব্যবসার চেহারাটাই আরও এক বার সামনে এসেছে। ওই মামলায় তিন জনের বিরুদ্ধে দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তদের দু'জনই নাবালক। তদন্তে জানা যায়, দুই নাবালিকা কালীঘাট মন্দির চত্বরেই ভিক্ষা করে। তাদের এক জনের মা পরিচারিকা। প্রতিদিন তিনি মেয়েকে মন্দির চত্বরে এক 'মাসি'র কাছে রেখে যান। কথা ছিল, মেয়ে ভিক্ষা করে যা-ই আনুক, তাঁকে প্রতিদিন ১৫০ টাকা করে দেওয়া হবে। সেই মতো কখনও ওই নাবালিকা একা, কখনও 'মাসির' ঠিক করা শিশু কোলে নিয়েই ভিক্ষায় বেরোয়।

কোলে কে?

কেউ প্রশ্ন করলেই তাকে শেখানো ছিল মন কেমন করা উত্তর, "মা অসুস্থ। পাঁচ বোন। ও সবার ছোট। খাব কী?" অনেকেই বলছেন, এ তো ব্যবসা! পথেঘাটে অহরহ বাচ্চা কোলে ভিক্ষা করা এমন মেয়েদের দেখা যায়। বাচ্চারা নড়ে না, কাঁদে না। শুধুই ঘুমিয়ে থাকে। কী করে?

কয়েক বছর আগে উত্তর শহরতলির এক স্টেশনে মহিলা ভিখারিকে এ প্রশ্নই করেছিলেন এক শিক্ষিকা। প্রতিদিনই তিনি দেখতেন, মহিলার কোলে একটি শিশু নির্জীব হয়ে শুয়ে। শিক্ষিকা জানতে চান, বাচ্চাটা সব সময়ে ঘুমোয় কেন? প্রথমে অসুস্থতার কাহিনি ফাঁদলেও শিক্ষিকা চেপে ধরায় ওই মহিলা পালাতে চেষ্টা করে। শিক্ষিকা বিষয়টি নিয়ে থানা-পুলিশ করায় জানা যায়, ওই বাচ্চাটি মহিলার নয়। তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে প্রতিদিন ভিক্ষায় বেরোত মহিলা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সূত্রের খবর, প্রতিদিন এ দেশে প্রায় ৪০ হাজার শিশু অপহৃত হয়। যার মধ্যে ১০ হাজার শিশু নিখোঁজই থেকে যায়। আরও আশঙ্কার, সারা দেশে প্রায় তিন লক্ষ শিশু প্রতিদিন হয় নেশার কবলে পড়ে, নয়তো মারধরের শিকার হয়ে ভিক্ষা-ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়। উদ্বেগ বাড়িয়ে সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সর্বশেষ রিপোর্ট আবার জানিয়েছে, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিখারি পশ্চিমবঙ্গেই। রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে ২০১৮-২০১৯ সালে ভিখারির সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৭০ জন। যার মধ্যে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৬৭৩ জন পুরুষ ও ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৯৭ জন মহিলা। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ভিখারি ৮১ হাজার ২২৪ জন। এর পরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৬৫ হাজার ৮৩৫ জন) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ (৩০ হাজার ২১৮ জন)।

রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, শিশুদের দিয়ে ভিক্ষা করানো একেবারেই আইনসিদ্ধ নয়। ২২টি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ভিক্ষা-ব্যবসা রোধে আইন রয়েছে। তাঁর কথায়, "কোনও শিশু এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে প্রমাণ পেলে তার পরিবারকে খুঁজে বার করে কারণ জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনে তাদের সরকারি হোমে রাখা হয়। পরিবারের কাউকে না পাওয়া গেলে আমরাই তাদের দায়িত্ব নিই। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এ ব্যাপারে কাজ করে। প্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও তাঁদের হোমে রাখি।"

সরকারি রিপোর্টে ভিক্ষা-ব্যবসার এই চিত্র সত্ত্বেও অভিযোগ ওঠার অপেক্ষা করা হবে কেন? মন্ত্রী বলেন, "আমরা তো আছিই, পুলিশেরও সহায়তা লাগে।" এ প্রসঙ্গে লালবাজারের তরফে কোনও মন্তব্য করতে চাওয়া হয়নি। যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার এক পুলিশ কর্তা বলেছেন, "যে কোনও দফতরকেই সব রকম সাহায্য করা হয়। এ ক্ষেত্রেও অন্যথার প্রশ্ন উঠছে না।"

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৩/০৩/২০২০।

চিত্র – ৫.৬: ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-২

শিশুর আকাল, ভিক্ষা করতে চাহিদা বাড়ছে কমবয়সিদের

■ বিবর্ণ: এ ভাবেই ওদের ভিক্ষার ব্যবসায় ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার, পার্ক স্ট্রিটে। নিজস্ব চিত্র

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪/০৪/২০২০।

চিত্র – ৫.৭: ভিক্ষুক সম্পর্কিত সংবাদ-২

কলিকাতা—বৃহস্পতিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

এই শিয়ালদহ !

॥ যেখানে জন্ম, সেখানেই ভিক্ষাবৃত্তি, সেখানেই মৃত্যু ॥

বৃদ্ধ জলধর দাসের বিস্ফারিত, বেদনাহত চোখে যে অসহায় জিজ্ঞাসা, দিল্লীর দরবারে তাহা পৌঁছিবে না। পাশেই তাঁহার স্ত্রী মরণোন্মুখ। ফটো : যুগান্তর

শিয়ালদহ স্টেশনে এই যে শিশুর জন্ম হইল, ইহার জন্য কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে? ফটো—'যুগান্তর'

একটি নিরপরাধ শিশু আজ ভিখারী বালকে পরিণত। শিয়ালদহ স্টেশনে এই জাতীয় কলঙ্কের জন্য দায়ী কে? ফটো—'যুগান্তর'

সূত্র: যুগান্তর, ১৫/০৯/১৯৬০।

সংযোজনী - ৬: বাংলার ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩

©

Bengal Act VII of 1943

THE BENGAL VAGRANCY ACT, 1943.

CONTENTS

CHAPTER I

Preliminary.

Section.
1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Vagrancy Advisory Board.
4. Appointment of Controller of Vagrancy and his assistants.
5. Special Magistrates.

CHAPTER II

Procedure.

6. Power to requiry apparent vagrant to appear before Special Magistrate.
7. Summary inquiry in respect of apparent vagrant and declaration of person to be a vagrant by Special Magistrate.
8. Detention in receiving centre and medical examination of vagrant.
9. Procedure for sending vagrant to vagrants' home.
10. Externment of vagrant from area in which Act is in force.
11. Validity of custody and detention of vagrant.

CHAPTER III

Receiving Centres and Vagrants' Home.

12. Provision of receiving centres.
13. Provision of vagrants' homes.
13A. Board of Visitors.
14. Search of vagrants.
15. Management and discipline.
16. Transfer of vagrants from one vagrants' home to another.
17. Outside employment to be obtained for vagrants when possible.
18. Discharge of vagrants from vagrants' home.

CHAPTER IV

Penalties and Miscellaneous.

19. Punishment for employing or causing person to ask for alms.
20. Punishment for refusing to go before a Special Magistrate.
21. Punishment for refusing to submit to medical examination at receiving centre.
22. Punishment for escape from receiving centre or vagrants' home.
23. Procedure at end of imprisonment.
24. Prosecution and jurisdiction to try offenders.
25. Persons to be deemed public servants.
26. Indemnity.
27. Repeal.
28. Power to make rules.
29. Continuance of action taken under Bengal Ordinance II of 1943.

©

Bengal Act VII of 1943[1]

THE BENGAL VAGRANCY ACT, 1943.[2]

REPEALED IN PART	..	West Ben. Act VII of 1948.
AMENDED	..	West Ben. Act V of 1970.
ADAPTED	..	The Indian Independence (Adaptation of Bengal and Punjab Acts) Order, 1948. The Adaptation of Laws Order, 1950.

[25th October, 1943.]

An Act to provide for dealing with vagrancy in Bengal.

WHEREAS it is expedient to make provision for dealing with vagrancy in Bengal:

It is hereby enacted as follows:—

CHAPTER I

Preliminary.

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Bengal Vagrancy Act, 1943.

(2) It extends to the whole of [3][West Bengal].

(3) It shall come into force in Calcutta at once and in such other areas on such other dates as the [4][State] Government may, by notification[5] in the *Official Gazette*, direct.

---

[1]This Act should be read with section 51 of the West Bengal Children Act, 1959 (West Ben. Act XXX of 1959) and notification (1) No. 1955 S.W./H-15/60, dated the 22nd June, 1961, (2) No. 284-S.W./L.H.- 43/61, dated 8.2.63 and (3) No. 479-S.W./4A-4/63, dated 15.3.63, which bring certain sections of the latter Act into force in Calcutta, Howrah, other places in the districts of Howrah and 24-Parganas and other areas.

[2]For Statement of Objects and Reasons *see* the *Calcutta Gazette*, dated the 18th February, 1943, part IVA, page 10; for the Proceedings of the Assembly, *see* the proceedings of the meetings of the Bengal Legislative Assembly held on the 2nd March and 15th September, 1943; for the Proceedings of the Bengal Legislative Council, *see* the proceedings of the meetings of the Bengal Legislative Council held on the 20th, 22nd, 27th and the 28th September, 1943.

[3]These words were substituted for the word "Bengal" by para. (2) of Art. 3 of the Indian Independence (Adaptation of Bengal and Punjab Acts) Order, 1948.

[4]The words within square brackets were substituted for the word "Provincial" by para. 4(1) of the Adaptation of Laws Order, 1950.

[5]This Act came into force on the 25th October, 1943, in the Howrah and Bally police-stations in the district of Howrah, and in the Tollygunge, Behala, Matiabruz, Baranagar and Dum Dum police-stations in the district of 24-Parganas, *vide* notification No. 5666 A.R.P., dated the 23rd October, 1943, published in the *Calcutta Gazette, Extraordinary*, dated the 25th October, 1943, part I, page 182; and on the 7th December, 1944, in the Golabari police-station in the district of Howrah, *vide* notification No. 3304 A.R.P., dated the 24th/29th November, 1944, published in the *Calcutta Gazette*, dated the 7th December, 1944, part I, page 1409.

(Chapter I.—Preliminary.—Sections 2, 3.)

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(1) "Board" means the Vagrancy Advisory Board established under sub-section (1) of section 3;

[1](1a) "Board of Visitors" means a Board of Visitors established under sub-section (1) of section 13A;

(2) "Calcutta" means the town of Calcutta as defined in section 3 of the Calcutta Police Act, 1866, together with the suburbs of Calcutta as defined by notification under section 1 of the Calcutta Suburban Police Act, 1866;

Ben. Act IV of 1866. Ben. Act II of 1866.

(3) "child" means a person under the age of fourteen years;

(4) "Controller" means the Controller of Vagrancy appointed under sub-section (1) of section 4;

[2]* * * * * *

(6) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(7) "receiving centre" means a house or institution for the reception and temporary detention of vagrants, provided by the [3][State] Government or certified as such under sub-section (1) of section 12;

(8) "Special Magistrate" means a Magistrate empowered to act as such under section 5;

(9) "vagrant" means a person [4]* * * found asking for alms in any public place, or wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that such person exists by asking for alms but does not include a person collecting money or asking for food or gifts for a prescribed purpose;

(10) "vagrants' home" means an institution provided by the [3][State] Government under sub-section (1) of section 13 for the permanent detention of vagrants.

Vagrancy Advisory Board.

3. (1) The [3][State] Government as soon as possible after the commencement of this Act shall establish a Board to be called the Vagrancy Advisory Board.

(2) The Board shall be constituted in the manner prescribed, subject to the condition that the number of members of the Board shall not be less than ten.

---

[1]This clause was inserted by s. 2 of the Bengal Vagrancy (Amendment) Act, 1970 (West Ben. Act V of 1970).

[2]Clause (5) was omitted by para. 3 of, and the Eleventh Schedule to, the Adaptation of Laws Order, 1950.

[3]*See* foot-note 4 on page 559, *ante*.

[4]The words "not being of European extraction" were omitted by para. 3 of, and the Eleventh

(Chapter I.—Preliminary.—Sections 4, 5.—Chapter II.—
Procedure.—Sections 6, 7.)

(3) The function of the Board shall be to advise the [1][State] Government on all matters relating to the control of vargancy and in particular on the administration of this Act and for the aforementioned purposes any member of the Board may enter and inspect at any time any receiving centre or vagrants' home.

(4) The Board may, with the previous approval of the [1][State] Government, make regulations to provide for,—

(a) the times and places at which its meetings shall be held;

(b) the issue of notices concerning such meetings and;

(c) the conduct of business thereat.

4. (1) For carrying out the purposes of this Act the [1][State] Government may appoint a person to be Controller of Vagrancy together with such other persons to assist him as it thinks fit. Appointment of Controller of Vagrancy and his assistants.

(2) Persons appointed under sub-section (1) shall exercise such powers as may be conferred and perform such functions as may be required by or under this Act.

5. For the purpose of Chapter II of this Act the [1][State] Government may empower [2]any Presidency Magistrate in Calcutta and any Magistrate of the first class elsewhere to act as a Special Magistrate. Special Magistrates.

CHAPTER II

Procedure.

6. Any police officer authorised in this behalf by the Commissioner of Police in Calcutta and by the District Magistrate elsewhere may require any person who is apparently a vagrant to accompany him or any other police officer to, and to appear before, a Special Magistrate. Power to require apparent vagrant to appear before Special Magistrate.

7. (1) When a person is brought before a Special Magistrate under section 6, such Special Magistrate shall make a summary inquiry in the prescribed manner into the circumstances and character of such person, and if, after hearing anything which such person may wish to say he is satisfied that such person is a vagrant, he shall record a declaration to this effect and the provisions of this Act relating to vagrants shall thereupon apply to such person. Summary inquiry in respect of apparent vagrant and declaration of person to be vagrant by Special Magistrate.

---

[1]*See* foot-note 4 on page 559, *ante*.

[2]For notification empowering the Police Magistrates of Howrah, 24-Parganas and Sealdah to act as Special Magistrates, *ex-officio*, *see* notification No. 435 G.A., dated 13.2.48, published in the *Calcutta Gazette* of 1948, part I, page 234.

(2) If on making the summary inquiry referred to in sub-section (1) the Special Magistrate is not satisfied that the person brought before him under section 6 is a vagrant such person shall forthwith be released.

(3) A Special Magistrate recording a declaration under sub-section (1) that a person is a vagrant shall forthwith send a certified copy of such declaration to the Controller, and to the officer-in-charge of the receiving centre to which such vagrant is sent under sub-section (1) of section 8.

Detention in receiving centre and medical examination of vagrant.

8. (1) When a person has been declared to be a vagrant under sub-section (1) of section 7 he shall forthwith be sent in the manner prescribed to the nearest receiving centre and there handed over to the custody of the officer-in-charge of such receiving centre, and such vagrant shall be detained in such receiving centre until he is sent therefrom to a vagrants' home under sub-section (1) of section 9.

(2) As soon as possible after the commencement of the detention of a vagrant in a receiving centre the medical officer of such receiving centre shall with such medical help as may be necessary medically examine the vagrant in the manner prescribed as quickly as is consistent with the circumstances of the case and shall thereupon furnish the officer-in-charge of the receiving centre with a medical report regarding the health and bodily condition of the vagrant.

(3) The medical report referred to in sub-section (2) shall state *inter alia*,—

(a) the sex and age of the vagrant;
(b) whether the vagrant is a leper;
(c) from what, if any, communicable diseases other than leprosy the vagrant is suffering;
(d) whether the vagrant is insane or mentally deficient;
(e) what is the general state of health and bodily condition of the vagrant and for which, if any, of the prescribed types of work he is fit.

Procedure for sending vagrant to vagrants' home.

9. (1) On receipt of the medical report referred to in sub-section (2) of section 8 the officer-in-charge of a receiving centre shall, as soon as the necessary arrangements can be made, send the vagrant in the prescribed manner to such vagrants' home as the Controller may by general or special order in this behalf direct, and the said officer-in-charge shall along with such vagrant send to the Manager of the said vagrants' home,—

(a) the certified copy of the declaration made under sub-section (1) of section 7 relating to such vagrant which is to be sent to such officer-in-charge under sub-section (3) of the said section, and
(b) the said medical report.

(Chapter II.—Procedure.—Section 10)

(2) When a vagrant is sent to a vagrants' home under the provisions of sub-section (1) he shall be handed over to the custody of the Manager of such vagrants' home and shall be detained therein, or in a vagrants' home to which he may be transferred under section 16, until duly discharged therefrom under section 18.

(3) In issuing any order under sub-section (1) the Controller shall ensure that the following classes of vagrants, namely:

(a) lepers,

(b) the insane or mentally deficient,

(c) those suffering from communicable diseases other than leprosy,

(d) children,

are segregated from each other and from vagrants who do not belong to any of the aforementioned classes and shall also ensure that the male vagrants are segregated from the female vagrants:

Provided that the provisions of this sub-section in respect of children may be relaxed as prescribed.

Externment of vagrant from area in which the Act is in force.

10. (1) If after an inquiry made under sub-section (1) of section 7 the Special Magistrate is satisfied that the person brought before him under section 6 is a vagrant but, in the course of such inquiry, it has appeared that the vagrant was not born in the area in which this Act is in force or has not been continuously resident therein for more than one year, the Special Magistrate, after making such further inquiry, if any, as he may deem necessary, may by order in writing direct the said vagrant to leave the said area within such time and by such route or routes as may be stated in the order and not to return thereto without the permission in writing of the Controller, and in such case, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 7, the provisions of sections 8 and 9 shall not apply to such vagrant:

Provided that if the Special Magistrate deems it necessary to make any further inquiry as aforesaid in respect of such vagrant, the vagrant shall be detained pending conclusion of the said inquiry in such receiving centre as the Controller may by general or special order in this behalf direct and for this purpose shall be sent thereto in the manner prescribed and there handed over to the custody of the officer-in-charge of such receiving centre, and shall, while he is so detained, be subject to the rules of management and discipline referred to in sub-section (1) of section 15.

(2) The Controller shall not give the permission referred to in sub-section (1) unless, if the vagrant had been detained in a vagrants' home, such vagrant would have been eligible to have been discharged therefrom under the provisions of sub-section (1) of section 18.

(Chapter II.—Procedure.—Section 11.—Chapter III.—Receiving Centres and Vagrants' Home.—Sections 12, 13.)

(3) When a vagrnat against whom an order has been made under sub-section (1) fails to comply with such order within the time specified therein, or after complying with the said order returns without the permission in writing of the Controller to any place within the area referred to in the said order, such vagrant may be arrested without a warrant by any police officer, and shall be liable, on conviction before a Magistrate, to be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months.

Validity of custody and detention of vagrant.

11. A declaration that a person is a vagrant recorded by a Special Magistrate under sub-section (1) of section 7 shall be sufficient authority to any person to retain such vagrant in his custody when such person is under the provisions of this Act or of any rule made thereunder conveying a vagrant from the Court of a Special Magistrate to a receiving centre or, from a receiving centre to a vagrants' home or from one vagrants' home to another and to the officer-in-charge of a receiving centre and to the Manager of a vagrants' home for detaining such vagrant in accordance with the provisions of this Act in a receiving centre or vagrants' home, as the case may be.

CHAPTER III

Receiving Centres and Vagrants' Home

Provisions of receiving centres.

12. (1) The [1][State] Government may provide and maintain together with the necessary furniture and establishment one or more receiving centres at such place or places as it thinks fit or may certify by notification in the *Official Gazette* any existing charitable or other institution, subject to the prior consent of the controlling authority of such institution and on such conditions as may be mutually agreed upon between the [1][State] Government and the said authority, to be a receiving centre for the purposes of this Act.

(2) For the purposes of this Act every receiving centre shall be under the immediate control of an officer-in-charge who shall be appointed by the [1][State] Government and who shall perform his functions subject to the orders of the Controller.

(3) The [1][State] Government shall also appoint for every receiving centre one or more suitably qualified persons as medical officers.

Provisions of vagrants' homes.

13. (1) The [1][State] Government may provide and maintain together with the necessary furniture, equipment and establishment, one or more vagrants' homes at such place or places as it thinks fit and such vagrants' homes may include provision for the teaching of agricultural, industrial or other pursuits and for the general education and medical care of the inmates.

---

[1][illegible] 559 ante.

(Chapter III.—Receiving Centres and Vagrants' Home.— Sections 13A, 14 & 15.)

(2) Every such vagrants' home shall be under the immediate charge of a Manager who shall be appointed by the [1][State] Government and who shall perform his functions subject to the orders of the Controller.

(3) The [1][State] Government may appoint in respect of a vagrants' home a suitably qualified person as medical officer and one or more suitably qualified persons as teachers.

Board of Visitors.

[2]13A. (1) For every receiving centre and every vagrants' home, the State Government shall establish a Board of Visitors, constituted in such manner and consisting of such number of members as may be prescribed.

(2) A Board of Visitors may visit the receiving centre or the vagrants' home for which it is established and record its comments on any matter it may think fit pertaining to the working of the receiving centre or the vagrants' home for the consideration of the officer-in-charge of the receiving centre or the Manager of the vagrants' home and for this purpose, any member of the Board of Visitors shall have the right to visit such receiving centre or vagrants' home at any time between the hours of sunrise and sunset.

(3) Copies of comments recorded by a Board of Visitors under sub-section (2) shall, as soon as may be after they are recorded, be forwarded by the officer-in-charge of the receiving centre or the Manager of the vagrants' home, as the case may be, to the Board.

Search of vagrants.

14. Every officer-in-charge of a receiving centre or Manager of a vagrants' home may order that any vagrant detained in such receiving centre of vagrants' home shall be searched and that the personal effects of such vagrant shall be inspected and any money then found with or on the vagrant shall be applied in the manner prescribed towards the welfare of vagrants and any of such effects other than money may be sold in auction and the proceeds of the sale shall be applied as aforesaid:

Provided that a female vagrant shall be searched by a female only and with due regard to decency.

Management and discipline

15. (1) Vagrants detained in receiving centres or vagrants' homes under this Act shall be subject to such rules of management and discipline as may from time to time be prescribed.

Explanation.—Discipline includes the enforcement of the doing of manual or other work by a vagrant.

---

[1]*See* foot-note 4 on page 559, *ante*.

[2]Section 13A was inserted by s. 3 of the Bengal Vagrancy (Amendment) Act, 1970 (West Ben. Act V of 1970).

(Chapter III.—Receiving Centres and Vagrants' Home.— Sections 16-18.)

(2) If any vagrant wilfully disobeys or neglects to comply with any rule referred to in sub-section (1) he shall on conviction before a Magistrate be liable to be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three months.

(3) The [1][State] Government may authorise the Manager of a vagrants' home to punish any vagrant detained in such vagrants' home who wilfully disobeys or neglects to comply with any rule referred to in sub-section (1) with hard labour of the type prescribed for any period not exceeding seven days; and such punishment may be in lieu of or in addition to any punishment to which the vagrant may be liable under sub-section (2).

Transfer of vagrants from one vagrants' home to another.

16. The Controller may by order in writing direct the transfer of a vagrant from one vagrants' home to another and a vagrant in respect of whom such an order is passed shall thereupon be sent in the manner prescribed to, and handed over to the custody of, the Manager of the vagrants' home to which he has by such order been transferred.

Outside employment to be obtained for vagrants when possible.

17. The Manager of a vagrants' home shall use his best endeavours to obtain outside the vagrants' home suitable employment for vagrants detained therein.

Dischrge of vagrants from vagrants' home.

18. (1) A vagrant may be discharged from a vagrants' home under orders of the Controller.—

(a) on the Manager of such vagrants' home certifying in the prescribed manner that satisfactory employment has been obtained for such vagrant;

(b) on its being shown to the satisfaction of the Controller that such vagrant has become possessed of an income sufficient to enable him to support himself without resorting to vagrancy;

(c) on a relative of such vagrant, or a person who the Controller is satisfied is interested in the welfare of such vagrant, entering into a bond with or without sureties for a sum prescribed, to look after and maintain such vagrant and to prevent him from resorting to vagrancy;

(d) for other good and sufficient reasons to be recorded by the Controller in writing.

[illegible]

(2) When the employment referred to in clause (a) of sub-section (1) has been obtained for a vagrant, any such vagrant refusing or neglecting to avail himself thereof shall be liable to be punished on conviction before a Magistrate, with rigorous imprisonment for a term which may extend to one month.

CHAPTER IV

Penalties and Miscellaneous.

Punishment for employing or causing persons to ask for alms.

19. Whoever employs or causes any person to ask for alms, or abets the employment or the causing of a person to ask for alms, or whoever, having the custody, charge, or care of a child, connives at or encourages the employment or the causing of a child to ask for alms shall be liable to be punished on conviction before a Magistrate with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.

Punishment for refusing to go before a Special Magistrate.

20. Any person refusing or failing to accompany a police officer to, or to appear before a Special Magistrate, when required by such officer under section 6 to do so, may be arrested without warrant, and shall be liable to be punished on conviction before a Magistrate with rigorous imprisonment for a term which may extend to one month or with fine, or with both.

Punishment for refusing to submit to medical examination at receiving centre.

21. Any vagrant who refuses to submit to a medical examination by the medical officer of a receiving centre or by any person assisting such medical officer under the provisions of sub-section (2) of section 8 shall be liable to be punished on conviction before a Magistrate with rigorous imprisonment for a term which may extend to one month.

Punishment for escape from receiving centre or vagrants' home.

22. Any vagrant who escapes from any custody to which he has been committed under this Act or any rule made thereunder or who leaves a receiving centre without the permission of the officer-in-charge thereof, or who leaves a vagrants' home without the permission of the Manager thereof, or who, having with the permission of such officer-in-charge, or Manager, as the case may be, left a receiving centre or a vagrants' home for a time specified under any rule referred to in sub-section (1) of section 15, wilfully fails to return on the expiration of such time, may be arrested without warrant and shall for every such offence, be liable to be punished, on conviction before a Magistrate, with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(ক) মৌলিক উপাদান:

আইন (Legislation)

Bombay Beggary Prevention Act, 1959.

The Bengal Vagrancy Act, 1943.

Children and Young Persons Act, 1933.

Criminal Procedure Code, 1973.

C. P. Municipalities Act, 1922.

European Vagrancy Act, 1824.

Indian Penal Code, 1906.

Juvenile Justice Act, 2000.

Leper Act, 1898.

The Haryana Prevention of Beggary Act, 1971.

The Kerala Prevention of Begging Bill, 2006.

Uttar Pradesh Prohibition of Begging Act, 1972.

War Charities Act, 1940.

সরকারি তথ্য (Government Reports)

Calcutta Beggar's Menace, 1936.

Census of India, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011.

Constitution of India, *Article 38 (2).*

Law Reports of the Commonwealth, 2000.

Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2010.

The Famine Commission, 1943.

The Labour Investigation Committee Report, Government of India, 1994.

The Mendicancy Committee Report, 1920.

The Report of the Enquiry Committee on Professional Begging in the Bombay Presidency, 1919.

সরকারি প্রকাশনা (Government Publications)

Andrew, W.: *At the Margins: Street Children in Asia and the Pacific, Asian Development Bank*, Poverty and Social Development Papers, No-8, 2003.

'Beggar Lepers in Calcutta, Growing Peril', *Calcutta Municipal Gazette, X, No. 6,* Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 June 1929.

Bengal Short of Food for One Third of Her Population: *Calcutta Municipal Gazette, XXVIII*, Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 May 1943.

Calcutta Municipal Gazette III, No. 3, Calcutta, Corporation of Calcutta, 28 November, 1925.

DWCWAP.: *Profile of Beggars in Hyderabad City: A Socio-Economic Study*, Andhra Pradesh, Indian Council of Social Welfare, 1980.

Gore, M.S.: *The Beggar Problem in Metropolitan Delhi*, Delhi, School of Social work, 1959.

Forrester, J. C.: 'The Beggar Problem in Calcutta', *Calcutta Municipal Gazette, XIII,* Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 November, 1930.

HUDCO: *Footpath Dwellers: Rehabilitation Scheme,* New Delhi, Ministry of Urban Development, 1990.

Memorandum of the Bangiya Pradeshik Kishan Sabha: *Report of the Land Revenue Commission* VI (1944)

Moorthy, V.M.: *Beggar Problem in Greater Bombay, a Research Study*, Bombay, Under the Auspices of the Indian Conference of Social Work, 1959.

Muir, E.: 'Beggar in Calcutta: A Survey', *The Calcutta Municipal Gazetteer, XIX, No. 17, (4 March, 1934)*

O'Malley, L. S. S.: *Census of India, 1911: City of Calcutta. Part I, Volume VI,* Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1913.

Porter, A. E.: Census of India, 1931: *City of Calcutta. Part I & II, Volume VI,* Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1933.

Ray, S. K.: *Census of India, 1901 Vol. VII: Calcutta, Town and Suburbs, Part I* Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1902.

Report of the Mendicancy Committee, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1920.

Report of the Municipal Administration of Calcutta for the Year 1942-43, Part III', Health Officer's Report. Calcutta, Corporation of Calcutta, 1943.

The Calcutta Gazette, 18th February, 1943.

The Calcutta Municipal Gazette, 6th December, 1941.

Uril, A. C.: 'The Beggar Problem', *Calcutta Municipal Gazette, XXVIII, No. 21*, Calcutta, Corporation of Calcutta, 29 October, 1938.

World Bank: *World Development Report 2004*, Washington DC, World Bank, 2004.

(খ) সহায়ক উপাদান:

বাংলা

গ্রীনো, পল: *আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪,* কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৭।

গুহ-বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না: *নগরোন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়: সাম্প্রতিক ভারতের চিত্র,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৯।

গোস্বামী, পরিমল: *মহামন্বন্তর,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৪।

ঘোষ, বিনয়: *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ২০১৩।

চক্রবর্তী, ত্রিদিপ ও রায় মন্ডল, নিরুপমা (সম্পা): *ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ,* কলকাতা, এবং মুসাই এরা, ২০০৭।

দাশগুপ্ত, কৃষ্ণপ্রিয়: *চেনা কলকাতা অচেনা ফুটপাথ,* কলকাতা, প্রতিক্ষন পাবলিকেশন, ১৯৯৫।

দাস, পূর্নেন্দু, মুখার্জী, অনিতা ও মুখার্জী, আশিস: *ভিখারি: একটি অনুসন্ধান,* কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১।

পাত্র, সম্পদরঞ্জন: *সুস্থায়ী কৃষি ও স্ব-ক্ষমতা,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপশ্রী ও বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা: *বাংলার মন্বন্তর,* কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৮৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল: *ভূমি ও ভূমিসংস্কার: সেকাল একাল,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু: *মনুসংহিতা,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব: *অন্য কলকাতা,* কলকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম: *যাদের কথা কেউ বলে না,* কলকাতা, পূর্ণ প্রকাশন, ১৯৯৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ: *দেশভাগ দেশত্যাগ,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪।

বেতেই, আঁদ্রে: *গণতন্ত্র ও তার প্রতিষ্ঠাসমূহ,* নয়া দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.): *বিশ্বায়ন: ভারনা-দুর্ভাবনা দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬।

বাগচী, অমিয়কুমার: *সংস্কৃতি সমাজ অর্থনীতি,* কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১০।

বর্ধন, প্রণব: *দারিদ্র্য: দারিদ্র্য নিয়ে কনফারেন্স ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা, আনন্দ, ২০২০।

বর্মণ, রূপ কুমার: "সংকট জনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা," *অন্তর্মুখ,* ২০১৩।

বসু, কৌশিক: *অর্থনীতি যুক্তি তর্ক ও গল্প, অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৮,* কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬।

বিশ্বাস অচিন্ত্য: *অদ্বৈতমল্ল বর্মন রচনা সমগ্র,* কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, ২০০০।

মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্যকুমার: *বাংলার ভূমিব্যবস্থার, জরিপ ও রাজস্বের আইনগত বিবর্তন,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০২১।

মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ: *রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর,* কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫১।

রায়চৌধুরী, বিনতা: *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭।

শ্রীমানী, সৌমিত্র (সম্পা.): *কলিকাতা কলকাতা,* কলকাতা, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা, ২০১৫।

সিকদার, সুকুমার, *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০০৫।

সেন, অমর্ত্য: *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭,* কলকাতা, আনন্দ, ১৪২২।

সংকৃত্যায়ন, রাহুল: *ভবঘুরে শাস্ত্র,* কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৫।

হালদার, গোপাল, *মন্বন্তরের তিন পর্ব,* কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৪৪।

ইংরেজী

Adebajo, Adekunle: *Bandits and Beggars: An Historical Play*, University of California, Noss Books, 1980.

Adiga, Aravind: *The White Tiger*, London, Atlantic Books, 2008.

Agarwala, S.N.: *India's Population Problems*, New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company, 1971.

Alam, S. Manzoor, and Pokshishevsky, V. V. (eds.): *Urbanization in Developing Countries*, Hyderabad, Osmania University, 1975.

Arnade, Peter, *Beggars, Iconoclasts and Civic Patriots: The Political Culture of the Dutch Revolt*, New York, Cornell University Press, 2008.

Aurelio, John, and Stan Skardinski: *The Beggars' Christmas*, Paulist Press, 1979.

Ballintyne, Scott, *Unsafe Street: Street Homelessness and Crime*, Institute for Public Policy Research, 1999.

Banerjee, Sumanta: *Crime and Urbanization: Calcutta in the Nineteenth Century*: New Delhi, Tulika Books, 2005.

Beier, A. L.: *Masterless Men: The Vagrancy Problem in England 1560-1640*, London, Methuen Press, 1984.

Beier, A.L., and Paul Ocobock, (eds.): *Cast Out: Vagrancy and Homelessness in Global and Historical Perspective*, Athens, Ohio University Press, 2008.

Beigh, Murad. *Nation of Beggars*. Allahabad: Central Law Agency, 2008.

Bhattacharya, Sabyasachi: *The Contested Terrain: Perspectives on Education in India*, New Delhi, Orient BlackSwan, 1998.

Blackwood, G.: *Street Drinking and Begging in Vauxhall: Action Research, Outreach and 'Diversionary Giving*, Lambeth Crime Prevention Trust, 1996.

Brumley, Linda: *My Beggar's Purse and Other Spiritual Thoughts, Wisdom for Life*, DPI, 2010.

Bruwer, E.: *Beggars Can Be Choosers: In Search of a Better Way Out of Poverty and Dependence*, University of Pretoria, 1994.

Burke, Roger Hopkins: *An Introduction to Criminological Theory*, Oregon, Willan Publishing, 2002.

Chatterjee, M. M.: *Mendicancy in Calcutta*, Calcutta, Central Press, 1918.

Chaudhuri, Sumita, *Beggars of Kalighat, Calcutta,* Calcutta, Anthropological Survey of India, Ministry of Human Resource Development, 1987.

Cherneva, Iveta: *Trafficking for Begging: Old Game, New Game*, Amazon Standard Identification Number, 2011.

Clinard, M. B. and Abbott, D. J.: *Crime in Developing Countries: A Comparative Perspective,* New York, John Wiley and Sons, 1973.

Connor, Philip. O.: *Britain in the Sixties: Vagrancy*, London, Penguin Book Pvt. Ltd., 1963.

Cote, S.: *Criminological Theories: Bridging the Past to the Future*, London, Sage Publication, 2002.

Danczuk, S.: *Walk on by…Begging, Street Drinking and the Giving Age*, London, Crisis, 2000.

Dean, H (ed.): *Begging Questions: Street-Level Economic Activity and Social Policy Failure*, Bristol, The Policy Press, 1999.

Denfeld, D.: *Streetwise Criminology*, Cambridge, Schenkman Publishing Company, 1974.

Dhar, P.N.: *Indira Gandhi, the "Emergency" and Indian Democracy*, Oxford, Oxford University Press, 2000.

Dirks, Nicholas B.: *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India,* UK, Princeton University Press, 2001.

Flood, G.: *An Introduction to Hinduism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

------------ *The Ascetic Self: Subjectivity, Memory and Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

Ghosh, Shaks: *Compassion not Coercion: Addressing the Question of Begging*, CRISIS, 2004.

Gibb, H. A. R. and Kramers, J. H.: *Fakir, Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, Brill Publication, 1995.

Goyal, Om Prakash: *Anti-Social Patterns of Begging and Beggars*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2005.

Gupta, K. N.: *Corruption in India*, New Delhi, Anmol Publications, 2001.

Haikerwal, B. S.: *Economic and Social Aspects of Crime in India*, London, G. Allen & Unwin, 1934.

Hartsuiker, Dolf: *Sadhus: India's Mystic Holy Men, Vermont*, USA, Inner Traditions International, 1993.

Henderson, Charles Richmond: *Modern Methods of Charity*, London, Macmillan, 1904.

Henderson, Ian (ed.): *The Poor New: Anatomy of Under Privilege*, London, Peter Owen, 1973.

Jha, M.: *The Beggars of a Pilgrim's City: Anthropological Sociological, Historical & Religious Aspects of Beggars and Lepers of Puri*, Varanasi, Kishor Vidya Niketan, Bhadaini, 1979.

Jhutti-Johal, Jagbir: *Sikhism Today*, London: Continuum Press, 2011.

Jordan, Bill: *A Theory of Poverty and Social Exclusion*, Cambridge, Polity Press, 1996.

Jotischky, Andrew: *The Carmelites and Antiquity: Mendicants and Their Pasts in the Middle Ages*, London, Oxford University Press, 2002.

Jowell, J., Curtice R., Park, A. and Thomson, K.: eds. *British Social Attitudes: The 17th Report 2000/2001*, London, Sage Publication, 2000.

Judge, D., Stoker, G. and Wolman, H.: *Theories of Urban Politics*. London: Sage Publication, 1997.

Jopp, V., Davies, P and Francis, P. (ed): *Doing Criminological Research*. London: Sage Publication, 2000.

Khan, Jabir Hasan: *Socio-Economic and Structure Analysis of Internal Migration – A Micro Level Study*, New Delhi, Serials Publications, 2010.

Klein, T. E.: *On Bus Stops, Bakers and Beggars*, Pakistan, Feldheim Publishers, 2006.

Kummarappa, J. M. (ed.): *Our Beggar Problem*, Bombay, Tata Institute of Social Science, 1945.

Lawrence, C. H.: *The Friars: The Impact of the Early Mendicant Movement on Western Society*, New York, Longman Publication, 1994.

Mahto, Kailash: *Population Mobility and Economic Development in Eastern India*, New Delhi, Inter-India Publication, 1985.

Majumdar, Prasanta S. and Majumdar Iia: *Rural Migrants in and Urban Setting*, Delhi, Hindustan Publishing Corporation, 1978.

McStay Adams, Thomas: Bureaucrats and Beggars: French Social Policy in the Age of the Enlightenment. Oxford University Press, 1990.

Mitchell, D.: *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Social Space*, New York, Guildford Press, 2009.

Misra, B. and Mohanty, A. K.: *A Study of Beggar Problem at Cuttack*, Bhubaneswar, Utkal University, Department of Rural Economics, 1963.

Moore, J.: *Cityward Migration*, Chicago, University of Chicago Press, 1938.

Murdoch, A.: *We are Human Too: A Study of People who Beg*, London, Crisis, 1994.

Nichols, B.: *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington, Indiana University Press, 1991.

Nicholson, R.A.: *The Mystics of Islam*, London, Penguin Books Limited, 1989.

O'Flaherty, Brendan: *Making Room: The Economics of Homelessness*, Cambridge, Harvard University Press, 1995.

Okediji, F.O.: *The Rehabilitation of Beggars in Nigeria*, Nigeria, National Council of Social Work, 1972.

Paul, Theroux: *A Dead Hand: A Crime in Calcutta*, Lucknow, Eastern Book Company, 2010.

Pound, John: *Poverty and Vagrancy in Tudor England*, London, Longman Group Limited, Second Edition, 1986.

Radzinowicz, Leon: *A History of England Criminal Law*, UK, Pegasaurus Book Ltd., 1968.

Randall, G. and Brown S.: *Ending Exclusion: Employment and Training Schemes for Homeless Young People*, York Publishing Services (YPS), 1999.

Rao, S.V.: *Crime in Our Society: A Political Perspective*, New Delhi, Vikas Publishing House, 1983.

Reiman, J. H.: *The Rich Get Richer and the Poor Get Poorer: Ideology, Class and Criminal Justice,* New York, John Wiley and Sons, 1984.

Ribtonurner, C.J.: *A History of Vagrancy and Beggars and Begging*, London, Chapman and Hall, 1887.

Sen, A.: *The Argumentative India: Writings on Indian History, Culture and Identity*, London, Penguin Books, 2006.

Sharel, Cook.: What do You Know About Begging in India and Common Begging Scams, New Delhi, Wadhwa and Company, 2007.

Solinger, R.: *Beggars and Choosers: How the Politics of Choice Shapes Adoption, Abortion and Welfare in the United States*, Farrar, Straus and Giroux, 2008.

Souza, A. (ed.): *The Indian City: Poverty, Ecology and Urban Development*, New Delhi, Ramesh Jain Manohar Publication, 1978.

Srivastava, S. S.: *Juvenile Vagrancy: A Socio-Economic Study of Juvenile Vagrants in the Cities of Kanpur and Lucknow*, London, Asia Publishing House, 1963.

Staples, J.: *Peculiar People, Amazing Lives: A Study of Social Exclusion and Community-Making in South India*, New Delhi, Orient Longman, 2007.

Sumner, C.: *Crime, Justice and Underdevelopment*, London, Heinemann Educational Books, 1982.

Tipple, G. and Speak, S.: *The Hidden Millions: Homelessness in Developing Countries*, London, Routledge, 2009.

Tully, J.: *Beggars of Life: A Hobo Autobiography*, UK, AK Press, 2004.

Turner, R. C. J.: *A History of Vagrants and Vagrancy and Beggars and Begging*, London, Chapman and Hall, 1887.

Vivekanandan, B. and Kurian, N. (eds.): *Welfare States and the Future*, London, Palgrave Macmillan, 2005.

Venkateswaran, Chittor.: *The Social Menace of Begging*, Lucknow, Eastern Book Company, 2009.

Watts, Rob, Judith Bessant, and Richard Hill. *International Criminology: A Critical Introduction*, New York, Routledge, 2008.

জার্নাল (Journals)

Acharya, K. S.: 'Evolution of the Institution of Beggary in Ancient Indian Perspectives', *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. 69, No. 1/4 (1988)*, pp. 269-277.

Adedibu, A. A. and Jelili M.O.: 'Package for Controlling Street Begging and Rehabilitating Beggars and the Physically Challenged in Nigeria', *Global Journal of Human Social Science* (USA), 11, No. 1 (2011).

Adelman, Robert, M and Jaret, C.: 'Poverty, Race and US Metropolitan Social and Economic Structure', *Journal of Urban Affairs* 21, No. 1, (1999), pp. 35-56.

Adriaenssens, Stef and Hendrickx, Jef: 'Street-Level Informal Economic Activities: Estimating the Yield of Begging in Brussels', *Urban Studies* 48, No. 1, (January 2011), pp. 23–40. https://www.jstor.org/stable/43081595.

Ahamdi, H.: 'A Study of Beggars Characteristics and Attitude of People Towards the Phenomenon of Begging in the City of Shiraz', *Journal of Allied Studies* 39, (2010), p.13.

Amato, Paul, R. and Jiping, Z.: Rural Poverty, Urban Poverty and Psychological Well-Bing', *The Sociological Quarterly* 33, (1992), pp. 229-40.

Bailey, M.: 'Religious Poverty, Mendicancy and Reform in the late Middle Ages', *Church History* 72, (2003): pp. 457-484.

Bajaj, J. K, and Srinivas, M. D.: 'Annam Bahu Kurvita: The Indian Tradition of Growing and Sharing Food', *Manushi* 92-93, (1996), pp. 9-20.

Baker, D. J.: 'A Critical Evaluation of the Historical and Contemporary Justification for Criminalising Begging', *Journal of Criminal Law* 73, No. 3, (2009), pp. 212-220.

Bromley, R. "Begging in Cali: Images, Reality and Policy." *International Social Work* 24, No. 2, (1981), 22-40.

Chattopadhyay, Manabendu.: Some Aspects of Employment and Unemployment in Agriculture', *Economic and Political Weekly* 12, No. 39, (1977), pp. 66–76. http://www.jstor.org/stable/4365951.

Demewozu, W.: 'Begging as a Means of Livelihood: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa', *African Study Monographs* 29, (2005), pp. 185-191.

Eleftheriadis, P.: 'Begging the Constitutional Question', *Common Market Studies* 36, No. 2, (1998): pp. 255-272.

Fitzpatrick, S. and Kennedy, C.: 'The Links Between Begging and Rough Sleeping: A Question of Legitimacy', *Housing Studies* 16, No. 5, (2001).

Gilling, J. L. ‘Vagrancy ang Begging’, *American Journal of Sociology* 35, No. 3, (November, 1929), pp. 424-432.

Goel, A.: ‘Indian Anti-Begging Law and their Constitutionality Through the Prism of Fundamental Right, with Special Reference to Ram Lakhan v State.’ *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 1, (2010), pp. 23-38.

Gore, M. S.: Society and Begging, Sociology Bulletin, 7, No. 1, (1958), pp. 23-48.

Hanchao, L.: “Becoming Urban: Mendicancy and Vagrants in Modern Shanghai.” *Journal of Social History* 33, no. 1 (1999).

Hindle, S.: Dependency, shame and belonging: Badging the Deserving Poor, c. 1550-1750, Culture and Social History’, *Journal of the Social History Society* 1, (2004), pp. 6-35.

Horn, M.: Understanding Begging in Our Public Places’, *Parity* 15, No. 1, (2002), p.10.

Hufton, O. H.: Begging, Vagrancy, Vagabondage and the Low: An Aspect of Poverty in Eighteenth-Century France’, *European Studies Review* 2, (1972), pp. 97-123.

Johnsen, S., Cloke, B. and May, J.: ‘Transitory spaces of care: serving homeless people on the street’, *Health and Place* 11, (2004), pp. 323-336.

Ketkar, Kusum W., and Ketkar, Suhas L.: ‘Bank Nationalization, Financial Savings, and Economic Development: A Case Study of India’. *The Journal of Developing Areas* 27, No. 1, (1992), pp. 69–84. http://www.jstor.org/stable/4192167.

Khan, H, J, Menka and Ahmed, N.: Regional Analysis of Various Place of Begging, International Journal of Development Research, Vol-3, (2013), p.6.

Kudriavtseva, M.: The Dramaturgy of Begging: A Description of an Everyday Practice.’, *The Journal of Sociology and Social Anthropology* IV, No. 3, (2001).

Malik, S. and S. Roy. 'A study on begging: A social stigma- An Indian perspective', *Journal of Human values* 18, (October, 2012), pp. 187-199.

Massey, D., Rafique, A. and Seeley, J.: 'Begging in Rural India and Bangladesh', *Economic and Political Weekly* 14, (2010), p.18.

Mcintosh, I. and Erskine A.: 'Money for Nothing: Understanding Giving to Beggars', *Sociological Research Online* 5, (2000).

Menka and Hassan, T.: 'Begging is a Curse on Society: An Empirical Study', *International Journal of Advance Research in Management and Social Science* 2, (2013), p.15.

Mukta, P.: 'On Beggars: The Homeless and Poor, *Economic and Political Weekly* 32, No. 24 (June, 1997), pp. 1387-88.

Mukherjee, D.: 'Laws for Begging, Justice for whom: A critical review of the Bombay prevention of Begging Act 1959', *The International Journal of Human Right* 12, No. 2, (April, 2008), p.279-288.

Mustafa, D.: 'Beggary as a Means of Emotional Exploitation: A Qualitative Inquiry into the Beggary in Sivas', *Dinbilimleri Akademik Araptyrma Dergisi* IX, No. 1, (2009), pp. 40-49.

Namwata, B. M. L, Mgabo, M. R. and Dimoso.: Categories of Street Beggars and Factors Influencing Street Begging in Central Tanzania, African Study Monographs, Vol- 33(2), June 2012, pp. 133-143.

Pande, B. B.: 'Rights of Beggars and Vagrants: The Right to be Human', *Indian International Centre Quarterly* 13, (1986), p.17.

Pintu, Ambrose. 'Beggars as Non-Citizens', *Mainstream* XLIX, (2011), p.5.

Radford, C.: 'Begging Principles: The Big Issue', *Applied Philosophy* 18, No. 3, (2001), pp. 287-296.

Raj, P.: 'Criminalising Poverty: Houseless and anti-beggary law in Delhi', *PUCL Bulletin* (2004).

Ramanathan, U. "Ostensible Poverty, Beggary and Law, Economic and Political Weekly, (2008), pp. 33-44.

Rao, A.: Poverty and Power: The Anti-Begging Act', *Economic and Political Weekly* XIV No. 8, (February, 1981), pp. 269-270.

Rolnick, P. J.: 'Charity, Trusteeship and Social Change in India: A Political Ideology', *Jstor World Politics* 14, No. 3, (1962), pp. 441-442.

Siddiqui, M. K. A.: 'Life in the Slums of Calcutta: Same Aspects', *Economic and Political Weekly* 4, (1969): p.50.

Singh, J. A. and Giri.Y. P., "The Problem of Beggary and Measures Undertaken by the State: A Case Study of Lucknow." *Institute of Development Studies, Lucknow,* (2001), p.45.

Stef, A and Jef, H.: 'Street-Level Informal Economic Activities: Estimating the Yield of Begging in Brussels', *Urban Studies* 48, (2001), pp. 23-40.

Tosi, A.: 'Homelessness and the control of public space – Criminalising the Poor', *European Journal of Homelessness 1, (2007)*: p.226.

Verma, A.: and Kumar, M.: 'The Etiology of Crime in India', *International Journal of Criminal Justice Sciences 3, No. 2 (July-December, 2008),* pp. 138-157.

Vorspan, R.: 'Vagrancy and the New Poor Law in Late – Victorian and Edwardian England', *The English Historical Review 92, No. 362 (1977),* pp. 59-81.

Walsh, T.: 'Defending Begging Offenders', *Queensland University of Technology Law and Justice Journal 4, No. 1, (2004),* pp. 58-76.

Wardhaugh, J.: 'The Unaccommodated Woman: Home, Homelessness and Identity', *The Sociological Review 47, No.1, 1999.*

Wardhaugh, J.: 'Regulating Social Space: Begging in two South Asian Cities', *Crime, Media, Culture 5, No. 3 (2009),* pp. 333-341. https://doi.org/10.1177/1741659009346020.

Wardhaugh, J.: 'Beyond the Workhouse: Regulating Vagrancy in Goa, India', *Asian Journal of Criminology, (2011),* pp. 1-19.

Williams, B. F.: 'Conducting Fieldwork to do Homework on Homelessness and Begging in Two U. S. Cities', *Current Anthropology* 36, No. *1 (1995),* pp. 25-51.

পত্রিকা (Magazines)

Anon: 'Voluntary Action Against Beggary', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July 1983,* p.3.

Bahadur, S.: 'Kidnapping of Children for the Purpose of Beggary', *Social Defence, 1965,* pp. 55-55.

Beggars in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', *Social Action, Vol.57, No.1, 2007,* pp. 44-53.

Bhatia, V. B.: 'Inmates and Vocational Programmes in the Beggar Home', *Social Defence, 1988,* pp. 19-26.

Bhattacharya, S. K.: 'Prevention of Begging', *Social Defence, Vol. X, No. 39, January, 1975,* pp. 9-13.

Bidarakoppa, G. S.: 'The Missing Homes Touch: Human Should Be Homes', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July, 1983,* pp. 17-19.

Billimoria, H. M.: 'A School for Beggars', *Social Welfare, Vol. 25, No. 8, November, 1978,* pp. 16-18.

Bogaert, M. V. D. and Rao T. S.: "The Beggar Problem in Ranchi." *Social Welfare, 1970,* pp. 285-302.

Chattoraj, B. N.: 'Beggary Prevention in Rajasthan', *Social Welfare, Vol. 38, November 1991,* pp., 27-29.

Das, D. K. L.: 'Evaluation of Beggar Problem in Tirupati', *Social Defence, Vol. 19, 1984,* pp. 29-31.

Diaz, S. M.: Eradicating Beggary in Cities: A Blueprint for Action', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July 1983,* pp. 8-11, 28.

Ghosh, D.: Rehabilitation of Beggars', *Social Welfare, Vol. 41, 1995,* pp. 32-33.

Jain, B. C.: 'Beggar Prevention in Farrukhabad City, Uttar Pradesh', *Social Welfare, Vol. 14, No. 55, January 1979,* pp. 33-41 and pp. 59-74.

Jeyasingh, J. V.: 'Child Beggars in Tiruchirappalli', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July, 1983,* p.16.

Kartika, A.: 'Beggars Problem in the City of Bombay', *Social Defence, Vol. 18, 1982,* p.10.

------------- 'Statically Survey', *Social Defence, Vol. 35, 1994,* p.7.

Leprosy Worker: 'Drive to Seeking Alms Because of Leprosy', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July 1983,* pp. 14-15.

Ministry of Social Welfare: 'The Beggar Problem in the City of Bombay', *Social Defence, Vol. 18, 1982,* pp. 60-73.

Nag, M.: 'Beggar Problem in Calcutta and its Solution', *The Indian Journal of Social Work, Vol. 16, No. 3, 1965,* pp. 243-252.

Pande, B. B.: 'Legal Aid to Beggars', *Social Defence, Vol. 15, No. 16, April, 1980,* 29-32 & pp. 43-47.

Pandey, B. P.: 'Beggary: A Challenge to Social Conscience', *Social Welfare, Vol. 16, No. 6, September, 1969,* pp. 27-28.

Pooley, E.: 'Beggars Army', *New York Magazine, Vol. 21, No. 34, August, 1988,* p.1.

Raj, G. R.: 'The Ones Out of the Race', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July, 1983,* pp. 4-7.

Raja, D. V. P.: 'Holistic Approach Needed to Tackle Begging', *Social Welfare, Vol. 36, 1989,* pp. 11-13.

Raju, D. C. J.: 'Beggary Prevention: Need for a Fresh Approach', *Social Defence, Vol. 53, 2002,* pp. 75-79.

Ramana, K. V and Rao, P. K.: 'No Option but Beggary', *Social Welfare, Vol. 19, No. 10,* January, *1973,* pp. 13-14.

Randhawa, S. S.: 'Yesterday's Beggars Are Today's Entrepreneurs in Ambala', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4,* July, *1983,* p.23.

Sarkar, S.: 'Beggary in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', *Social Action, Vol. 57, 2007.*

Shah, H. P.: 'Beggars Turn Useful Citizens', *Social Welfare, Vol. 21,* February, *1975,* pp. 7-8.

Singh, H.: 'Eradicating Child Beggary', Social Defence, Vol. 18, April, *1983,* pp. 1-4.

Vaisakhas, C.: 'Problem of Beggary in India', Social Defence, Vol. 34, 1994, p.9.

Varma, P.: 'Beggars and Vagrants', *Social Welfare, Vol. 17, No. 7, 1970,* p. 9-10.

Verma, S. and Patel, N.: 'Many Would Like to Break with the Past', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4,* July, *1983,* 12-13.

সংবাদপত্র (Newspapers)

আজকাল পত্রিকা, ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৯০, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, ১৪ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৪৩, ৭ ই জুলাই, ১৯৯৩, ১৬ ই জুলাই ১৯৯৭।

পুরশ্রী পত্রিকা, জুন সংখ্যা, ১৯৮৯।

বসুমতী পত্রিকা, ১০ জানুয়ারী, ১৯৫৫।

যুগান্তর পত্রিকা, ২৬ শে জুলাই, ১৯৫৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, ১৩ই অক্টোবর ১৯৫৭।

স্বাধীনতা পত্রিকা, ১৬ ই এপ্রিল, ১৯৪৭, ১৬ ই আগস্ট, ১৯৪৬।

The Hindu, 22nd February, 2014.

The Outlook, 16th July, 1997.

The Statesman, 16th October, 1943.

Ashar, S. 'Mumbai is India's city with the greatest inequalities', *Daily News and Analysis. (DNA),* 2010.

Antalava, N.: 'India's Dalits still fighting untouchability', *BBC News India,* June 27, 2012.

Badgeri, M. and Dolare S.: 'There only religion is money', *The Times of India*, 2003.

Bhatnagar, R.: 'Government Sleeping on Anti-begging Act', *The Times of India*, 2005.

'Civil Society: Rehab Plan for Beggars', *The Times of India,* 3 July, 2010, p.11.

'Delhi Home to Over 50,000 Street Children', *The Hindu,* 4 July, 2011, p.11.

Dev, A.: 'Authorities turn a blind eye to beggar', *The Times of India: Gurgaon,* February 3, 2013.

Ganguly, R.: '2000 kids involved in begging in Bhopal', *The Times of India: Bhopal*, 2012.

Gaur, K.: 'Beggars Rake in Moolah During Urs', *Times of India,* July 12, 2008, p.5.

Gaurav and Bhatnagar, V.: 'Beggars Making a Silent Exit', *The Hindu,* September 1, 2010, p.4.

Gupta, S.: 'Street Vendor's Forum to form Asia Level Alliance', *The Hindu,* July 22, 2012, p.12.

Hazra, I.: 'Beggars Can Be Retailers', *Hindustan Times,* December 9, 2007, p.10.

'Housewives, Beggars Clubbed in Census', *Times of India,* 25 July 2010, p.1.

Hudson, F.: '$ 50,000 Blown on Hounding Vagrant', *Herald Sun*, August 7, 2003, p.9.

Iyer, V. R. K.: 'Religious Places and Alms Seeking', *The Hindu,* April 26, 2010, p.9.

Khair, Tabish.: 'All the Reasons that Begging has', *Times of India*, Oct, 1990.

Lynch, P. and Tsorbaris, D.: 'Zero Tolerance Begs the Question', *Herald Sun,* December 7, 2004, p.19.

Mander, H.: 'The war against begging', *The Hindu*, 2009.

Middendorp, C.: 'Begging: A Problem We Cannot Hide', *The Age*, February 19, 2005, p.9.

Nelson, D.: 'India has one third of world's poorest, says World Bank', *The Telegraph*, 2013.

'Open Homes for Beggars Soon', *The Hindu*, 5 October 2007, p. 4.

Pandey, P.: 'Sadhvis rise among male-dominated ranks', *The Indian Express*, 2013.

'Plans Afoot to Send Inmates of Beggars Centre to Home State', *The Hindu*, 22 August 2010, p.6.

Qadir, A.: 'Child beggars beg for dollars at Bodh Gaya', *The Times of India, Patna,* 2012.

Rajagopal, K.: 'Eliminate poverty, don't hide beggars: HC', *Express India*, 2009.

Ramachandran, S. K.: 'Who Said Beggars Can't be Choosers', *The Hindu*, p.1.

Sardar, Z.: 'Ziauddin Sardar marvels at the brown sahibs', *New Stateman*, 2006.

Staff Reporter.: 'Court tells police to enforce prevention of Begging Act', *The Hindu*, 2007.

Staff Reporter.: 'Mumbai's beggars earn Rs 180 cr a year', *The Times of India*, 2006.

Staff Reporter.: '16 children rescued from begging in Calungate', *The Times of India. Goa*, 2012.

Staff Reporter.: '11 children sent to rehabilitation home on 2^{nd} day of anti-begging drive', *The Times of India. Jaipur*, 2012.

Venkatesan, J.: 'Take Back Your Beggars, Delhi Writes to State', *The Hindu*, April 16, 2010.

Wilkinson, G.: 'Outrage at Plan to Allow Begging', *Herald Sun*, February 16, 2005, p.3.

সাক্ষাৎকার

ক্ষেত্র সমীক্ষা, (আগস্ট, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২)

বৈদ্যুতিক তথ্য (Webliography)

Aesop, (N.D): Aesop, a Greek Slave (620 BC-560 BC). The quotations page. http://www.quotationspage.com/quotes/Aesop. [Last accessed: 12.06.2018].

Bajpai, G.S. (N.D.): Criminology: An Appraisal of Present Status and Future Directions. http://www.forensic.to/webhome/drgsbajpai/criminology%20appraisal.pdf. [Last accessed: 12.06.2018].

Barson, T.: Changing Dialogue: Exhibition Review. Socialist Review, (2006),

http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=9675. [List accessed: 22.02.2018].

Bros, N. (N.D.): Portrait of A Sumuyasi (sanyasi holding beads). British Library Online Gallery.

http://www.bl.uk/onlineex/apac/photocoll/other/019pho000000034u000p1. [Last accessed: 02.03.2018].

Census of India. (2011): 6. Status of Literacy. Census India.

http://www.censusindia.gov.in/2011_prov_results/data_files/mp/07Literarypdf. [Last accessed: 02.03.2018].

Census of India (2011): Census of India 2011: Release of population totals of West Bengal state. Census of India 2011. http:/www.censusindia.gov.in/2011_prov_results/data_files/westBengal/wb_at_aglance.pdf. [Last accessed: 02.03.2018].

Chan, C.L.: Indian's begging question. Global Envision: the confluence of Global Markets and poverty Alleviation. (2008)

http://www.globalenvision.org/2008/07/11/indias_begging_question. [Last accessed: 02.04.2018].

Chockalingam, K. (N.D.): Measures for crime victims in the Indian Criminal Justice System. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No8111VE_chockalingam.pdf. Last accessed: 06.05.2018.

Chatterjee, M.: Indian Beggars, 2012, p. 1. http://www.indian/beggars.html.

[Last accessed: 08.05.2018].

Cook, S. (N.D.): What you need to know about begging in India and common begging scams. About.com Tndia Travel. http://www.goindia.about.com/od/annoyancesinconveniences/p/indiabegging.htm. [Last accessed: 10.04.2018].

CRISIS: Begging & Anti-Social Behaviour: Crisis Response to the White Paper Respect and Responsibility- Taking a Stand Against Anti-Social Behaviour, (2003), http://www.crisis.org.uk/data/files/publication/AntiSco_response%5B1%5D.pdf. [Last accessed: 12.06.2018].

Daijiworld.com.: Mangalore: Police nabs Lambani woman accused of abducting 7 year old girl. Daiji.world.com (2010), http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=81966. [Last accessed: 12.06.2018].

Haji, M.: Beggars, no choosers. Greater Kashmir, (2010), http://www.greaterkashmir.com/newa/2010/jul/27/beggar-not-choosers-16.asp. [Last accessed: 12.06.2018].

Hoff, K. and Pandey, P.: Belief systems and durable inequities. World Bank, (2003), http://www.siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/BeliefSystemsandDurableInequalities.pdf. [Last accessed: 12.05.2018].

Hunter, M.: Obituaries: Judge J. Skelly, Segregation Foe, Dies at 77. New York Time, (1988), http://www.nytime.com/1988/08/08/obituaries/judge-j-skelley-wright-segregation-Foe-dies-at-77.html. [Last accessed: 14.06.2018].

Jafri, A. S.: Begging is an Rs 150 Crore Industry, 2005, p. 3. http://www.rededd.com. [Last accessed: 14.06.2018].

Jhally, S.: Stuart Hall: Representation and the Media. (ed.): Talreja, S. Jhally, S. and Patierno, M. Northampton M. A: Media Education Foundation, (1997) http://www.mediaed.org/assets/products/409/transcript_409.pdf. [Last accessed: 14.06.2018].

Kamat, K. L.: The Begging Profession, (2007) Http://www.kamat.com/kalranga/bhiksha/begging.htm. [Last accessed: 18.07.2021].

Lal, N.: Criminalising beggars instead of rehabilitating them. Infochange India, (2007), http://www.infochangeindia.ogr/200706205546/Human-Rights/Features/Criminalising-beggars-instead-of-rehabilitating-them.html. [Last accessed: 20.08.2019].

Lal, N.: India’s ageless caste shadow. The Diplomat.com. (2011), http://www.the-diplomat.com/indian-decade/2011/06/7/indias-ageless-caste-shadow. [Last accessed: 25.09.2019]

Legislation.gov.uk. (N.D.): Vagrancy Act. 1824.Legislation.gov.uk. http://www.legislattion.gov.uk/ukpga/Geo4/5/83/contents. [Last accessed: 14.11.2021].

Mahajan, S.: Child Begging the Bane of Modern India, 2007, p. 5. http://www.wikipedia.com. [Last accessed: 14.11.2021].

MDG Monitor. (N.D.): India: MDG profile. MDG Monitor: Tracking the Millenium Development Goals. http://www.mdgmonitor.org/factsheet_00.cfm?=IND. Last accessed: 12.10.2022]

Nanda, P.: It's official: 37pc live below poverty line. IBN Live, (2001), http://www.ibnlive.in.com/news/its-offcial-37-live-below-poverty-line/113522-3.html. [Last accessed: 16.12.2021].

Ramanathan, U. (N.D.): A constitution amongst dire straits. India seminar.com. http://www.india-seminar.com/2010/615/615_usha_ramanathan.htm. [Last accessed: 19.12.2021].

Raza, D.: Games that play with the commons. Governance now. (2010)http://www.governancenow.news/regular-story/games-we-play-commons. [Last accessed: 20.12.2021].

Siddique, m.: Rs 180 Crore that is the Annual Earning of Beggars in India, 2008, p. 3. http://www.Rs180/crore/that/is/the/annual/learning/of/beggars/in/india/html.com. [Last accessed: 20.12.2021].

Smith, K. P.: The Economics of Anti-Begging Regulation, 2000, p. 3. http://www.findthearticlesnew.html.com. [Last accessed: 06.01.2022].

Street Net International: too busy clearing the streets of vendors to finalise the commonwealth games infrastructure. Street Net International, (2010), http://www.streetnet.org.za/show.php?in=220. [Last accessed: 08.08.2022].

Tarique, M. and Raghavan, V.: India's war on it's poor. 50 50 inclusive Democracy, (2011), http://www.opendemocracy.net/5050/mohammed-tarique-vijay-raghavan/indias-war-on-its-poor. [Last accessed: 12.08.2022].

UCA news.com. (2000): Church workers help beggar caste find alternative. UCAnews.com. http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2000/10/26/church-workers-help-beggar-caste-find-alternatives&post_id=17112. [Last accessed: 12.08.2022].

Uma, S.: Repressive Laws in India. Bepress.com, (2009), http://www.works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&content=saumyauma. [Last accessed: 18.08.22].

Indian Penal Code (IPC) section 363A Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging. Vakil No1.com. http://www.vakilno1.com/bareacts/indianpenalcode/s363A.htm. [Last accessed: 07.09.3022].

Urban poverty in India. A flourishing slum. The Economist. http://www.economist.com/node/10311293. [Last accessed: 08.9.2022].

A Pluralistic Hinduism. Hindu Vivek Kendra. http://www.hvk.org/index.php,about/special-articales/26-internal-articales/241. [Last accessed: 12.09.2022].

SC declines plea on anti-begging law. IBNLive. http://www.ibnlive.in.com/news/sc-declines-plea-on-anti-begging-law/9215-3.html. [Last accessed: 13.10.2201].